প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

খাতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

সপ্তম বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● এপ্রিল-জুন ২০১৭

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০১৭

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
April-June Issue, 2017; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৬

সমাজ

বাংলাদেশে মাদ্রাসাশিক্ষা : প্রতিযোগিতা, সমঝোতা ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব ১১
আলী রীয়াজ

অর্থনীতি

ব্যাংকিং নৈতিকতা ৪৫
অমিয় কুমার বাগচি

আন্তর্জাতিক

সংকটের দুষ্টচক্রে ছিটমহলের মানুষ ৬৩
একটি বিনিময়-উত্তর পর্যালোচনা
মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী

সমাজ

বিশ্বায়ন : বিতর্কিত এক ভুবন ৭৭
বদরুল আলম খান

বই আলোচনা

বিশ্বায়ন কীভাবে কার্যকর হবে? ১২১
প্রতীক বর্ধন

বিশ্বায়নকে ত্রুটিমুক্ত করা কি সম্ভব? ১৩৩
খলিলউল্লাহ্

প্রকাশিত প্রবন্ধ

প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই আলোচনার তালিকা ১৫১

লেখক পরিচিতি ১৫৭



দুনিয়াজোড়া একধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা চলছে পশ্চিমা বিশ্বের গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধের ওপর ভর করে। সেসব মূল্যবোধের অন্যতম একটি হলো বিশ্বায়ন। কিন্তু ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর থেকে বিশ্বব্যাপী একধরনের অস্থিরতা প্রকট হয়ে উঠছে। জাতীয়তাবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রক্ষণশীলতা, ধর্মীয় উগ্রবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে জেঁকে বসছে ধীরে ধীরে। পশ্চিমা বিশ্ব অনেকাংশেই এই ধরনের সমস্যা থেকে নিজেদের মুক্ত মনে করত। কিন্তু সেখানেই এখন এসব সামাজিক অসুস্থতা প্রকটভাবে দৃশ্যমান। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো বিশ্বায়নের জোরালো সমর্থকেরাও এখন বিশ্বায়নবিরোধী অবস্থান নিয়েছে। নিজেদের অর্থনীতিকে রক্ষা করার নামে তারা বিশ্বায়ন ও অভিবাসনবিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে। সেসব পদক্ষেপ নেওয়ার সামাজিক সমর্থনও তাদের সমাজে সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় চলে আসছে রক্ষণশীল ধারার রাজনীতিকেরা। বিশ্বব্যাপীই এই পপুলিজম বা জনতুষ্টিবাদী ধারা ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

আমরা দেখেছি যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে বিশ্বায়নবিরোধী সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেগুলো বাস্তবায়ন বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার অবসানের শামিল। ট্রাম্প স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি বর্তমান বাণিজ্য চুক্তি সব বাতিল করবেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোম্পানি বিদেশে বিনিয়োগ করলে শাস্তি হিসেবে অতিরিক্ত করারোপ করবেন এবং অভিবাসী ঠেকাতে সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ করবেন।

বিশ্বায়ন একটি বহুল বিতর্কিত ধারণা। এর পক্ষে-বিপক্ষে অসংখ্য যুক্তি রয়েছে। সব ধারণারই যেমন এপিঠ-ওপিঠ থাকে, বিশ্বায়নেরও তা রয়েছে। বিশ্বায়ন নিয়ে বিভিন্ন সমাজে একাংশের মধ্যে সন্দেহ শুরু থেকেই ছিল। পুঁজিবাদবিরোধীরাই সাধারণত বিশ্বায়নের বিরোধিতা করে থাকে। আবার ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলোও বিশ্বায়নকে ইসলাম ধ্বংস করার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের এক 'কূটচাল' হিসেবে দেখে থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীও নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছে বলে বিশ্বায়নবিরোধী অবস্থান নেয়। কিন্তু সাম্প্রতিক ধারাটি এসবের বিপরীত। বিশ্বায়নবিরোধিতা আসছে এখন স্বয়ং সেসব পুঁজিবাদী

সমাজগুলো থেকেই, যারা সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমেরও বিরোধী। ফলে একটি নতুন ধারা তৈরি হচ্ছে, যা পুঁজিবাদের ভেতর থেকেই আসছে। পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যই যে এমনটি ঘটছে, তা নিয়ে সন্দেহ খুব কমই আছে। কারণ, বিশ্বায়নের ধারণা এখন চীন বা ভারতের মতো নতুন অর্থনৈতিক শক্তিগুলো এগিয়ে নেওয়ার জোরালো চেষ্টা করছে। পুঁজির ধর্মই স্থানান্তরিত হওয়া এবং ছড়িয়ে পড়া। পুঁজি তার নিজের বিকাশের স্বার্থেই এক জায়গায় থাকে না। ফলে যেখানে পুঁজি সৃষ্টি হবে, সেখান থেকে নতুন নতুন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। বর্তমানে চীন বা ভারতের মতো দেশে পুঁজি পুঞ্জীভূত হচ্ছে। তাই তারাই এখন বিশ্বায়নের সমর্থক হয়ে উঠছে। কিন্তু বেশি দিন আগের কথা নয়, যখন ঠিক একই ভূমিকা পালন করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব।

বিশ্বায়নের ব্যাপারে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের এক প্রদর্শনী আমরা দেখতে পাই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়া বা ব্রেক্সিট এবং যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীল ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এসব ভোটে আমরা দেখতে পাই জনতুষ্টিবাদের ক্ষমতা, যাদের বেশির ভাগই বিশ্বায়নবিরোধী। তবে ঢালাওভাবে এটাও বলা যাবে না যে পশ্চিমা বিশ্বের জনগণ বিশ্বায়নবিরোধী। উভয় ক্ষেত্রে ভোটারদের বয়স ও আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য দেখলে দেখা যায় ভিন্ন রূপ। ব্রেক্সিটের ক্ষেত্রে বয়স্ক ও শহুরে নয় এমন জনগোষ্ঠীই বেশি ভোটকেন্দ্রে গেছে এবং কম বয়সী তরুণদের সংখ্যা ছিল কম। তরুণেরাও সমানভাবে ভোট দিলে ফলাফল ভিন্ন হতে পারত। আবার যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দেখি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে প্রায় ৩০ লাখ ভোট কম পেয়েছেন। তা ছাড়া ট্রাম্পের সব ভোটারই যে বিশ্বায়নবিরোধী, সেটাও যেমন বলা যায় না, তেমনি হিলারির সব ভোটারই যে বিশ্বায়নের সমর্থক, সেটাও বলা যায় না। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের ধারা যে স্পষ্ট হচ্ছে, সেটা এসব নির্বাচনের মাধ্যমে বোঝা যায়।

চীন, রাশিয়া ও ভারতের মতো দেশগুলোয় আমরা আবার ভিন্ন চিত্র দেখতে পাচ্ছি। এসব দেশের নেতারা সবাই যদিও জাতীয়তাবাদী দুয়ো তুলেই ক্ষমতায় এসেছেন, কিন্তু তাঁরা আবার নিজেদের দেশকে এমনভাবে বহির্মুখী করছেন এবং বৈশ্বিক কৌশল তৈরি করছেন, যা বিশ্বায়নের ধারণার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উভয়ই বাণিজ্য, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক জোট গঠন এবং তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারে মনোযোগ দিয়েছেন। এ জন্য তাঁরা বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করছেন। মোদি ৪৫টি দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং তাঁদের অনেকেই পাল্টা ভ্রমণে ভারতে এসেছেন। এর ফলে অনেক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। চীনের প্রচেষ্টাগুলো সাম্প্রতিক সময়ে এসে সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। এশীয় অবকাঠামো ও বিনিয়োগ ব্যাংক তৈরি, এক অঞ্চল বা সিল্ক রোড উদ্যোগ, আঞ্চলিক সামগ্রিক অর্থনৈতিক অংশীদারি ইত্যাদি সবই বিশ্বায়নের প্রতি চীনের আরও ঝুঁকে পড়ার নিদর্শন। ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক চিন্তাভাবনা থেকেই চীন তার নেতৃত্বে বিশ্বায়নের গতিপথকে নতুন করে এগিয়ে নিতে চাইছে। তবে চীনের এই তৎপরতাকে কোনো কোনো বিশ্লেষক নব্য-উপনিবেশবাদের সঙ্গে তুলনা করতেও দ্বিধা করছেন না। বৈশ্বিক এসব পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলাদেশ তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। নতুন নতুন সুযোগ গ্রহণে বাংলাদেশের সক্ষমতা বিষয়ে আরও আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

বিভিন্ন জরিপে আমরা দেখছি যে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোয় অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রতি সমর্থন বাড়ছে, যার বেশির ভাগ সমর্থকই তরুণ প্রজন্মের। আবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র ধরা পড়ছে। এসবই বিশ্বায়নের ধারণা নিয়ে অস্পষ্টতা ও বহুমুখিনতার উদাহরণ। যে কারণে বিশ্বায়ন বিষয়ে একমত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে অনেক বিশ্লেষক বলতে চান যে বিশ্বায়ন নতুন মোড়কে আবির্ভূত হবে। গত তিন দশকের বিশ্বায়ন ছিল ভারসাম্যহীন। সেখানে অর্থায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আদান-প্রদান ছিল খুব বেশি, কিন্তু পণ্য ও সেবার চলাচল ছিল মধ্যম মানের, আবার মানুষের চলাচল এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য নীতির উন্নয়ন ছিল কম। কিন্তু যদি সংবেদনশীলভাবে বৈশ্বিক পুঁজি চলাচল ব্যবস্থাপনা করা হয়, সবুজ প্রযুক্তি নির্মাণ ও বিস্তারে সহায়ক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়, উন্নত দেশগুলোয় অভ্যন্তরীণ সামাজিক নীতি তৈরি করা হয় এবং আরও ব্যাপকভাবে বললে বিশ্বে একটি দেশের অবস্থান কী, সে বিষয়ে জাতীয় মতৈক্য তৈরি করা যায়, তাহলে হয়তো বিশ্বায়নের সংকট অনেকাংশেই হ্রাস করা সম্ভব।

তবে এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বায়নের এমন একটি তাস সচল হয়েছে, যার সঠিক নিয়ন্ত্রণ কারও হাতে নেই। এই প্রাযুক্তিক পরিবর্তনকে বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। আমরা কেউই ভালো করে জানি না এই বিপ্লবের ঝুঁকি ও সম্ভাবনাগুলো কেমন। আরও স্পষ্ট করে বললে এর সুফল গ্রহণ করে এমন সব গোষ্ঠী তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে, যা প্রকারান্তরে সামাজিক কুফলে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনে প্রযুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অস্ত্র। এই নতুন ধারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে যে নীতিই নেওয়া হোক না কেন, সেটা ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে।

বিশ্বায়নের প্রভাব সমাজের সর্বক্ষেত্রেই আমরা দেখি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের রয়েছে অভূতপূর্ব প্রভাব। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাবের সঙ্গে বিশ্বায়নের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। আমাদের মতো উন্নয়নশীল সমাজে মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চলা মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। এর ফলে তৈরি হচ্ছে বিরোধপূর্ণ মানসিকতার নাগরিক শ্রেণি, যারা মননের দিক থেকে একে অপরের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিটি ধারাই বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত এবং ক্রমে সক্রিয় হচ্ছে। তাই সামাজিক দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার কোনো নতুন বিষয় নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে রাজনীতিতে মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠনগুলোর তৎপরতা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসাগুলোর আবদ্ধ পরিবেশে ইসলামভিত্তিক জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটে থাকে বলেও মত চালু রয়েছে। এসব মাদ্রাসা সংস্কার ও আধুনিকায়নে সময়ে সময়ে চেষ্টা করা হলেও জোরালো কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ে না। সাম্প্রতিক কালেও কওমি মাদ্রাসাগুলোকে সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে বর্তমান সরকার এসব প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে একধরনের সমঝোতা করেছে। এই প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসাশিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি এবং এসব মাদ্রাসাভিত্তিক ওলামাদের

সংস্কারবিমুখতা নিয়ে লিখেছেন আলী রীয়াজ। এসব প্রতিষ্ঠানের ওলামারা কেন মাদ্রাসাশিক্ষার সংস্কার ও আধুনিকায়নে বরাবরই বাধা দিয়ে এসেছেন, তার কারণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এই লেখায়। এ ছাড়া মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক তৎপরতার কারণ যে ধর্মীয় ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, তা-ও জানা যাবে এই লেখায়।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিশ্বায়নের ধারণার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। বৈশ্বিক পুঁজি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভূমিকাই মুখ্য। তাই বিশ্বায়নের সংকটের সঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। সে জন্য বিশ্বায়নের সমালোচনার পাশাপাশি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নৈতিকতার প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে। নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে *প্রতিচিন্তা*র এবারের সংখ্যায় ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচির একটি নিবন্ধ ছাপছি। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের একজন অন্যতম পথিকৃৎ নুরুল মতিনের স্মরণে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত স্মারক বক্তৃতায় অমিয় বাগচি এই বক্তব্য দেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ইংরেজিতে বক্তৃতাটি প্রকাশ করেছে।

আঞ্চলিক জোটকে অনেক সময় বিশ্বায়নের বিরুদ্ধব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বায়নের প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক জোট গঠনের ঘটনা আমরা দেখেছি। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতাবাদ অন্যান্য অঞ্চলের মতো জোরালো শিকড় গাড়তে পারেনি। এই অঞ্চলের দেশগুলোর ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমমর্যাদাভিত্তিক সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হয়েছে বারবার। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হিসেবে ভারতের ভূমিকাই মুখ্য বলে মনে করে থাকেন বিশ্লেষকেরা। কিন্তু ভারত সেই ভূমিকা পালন করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। ভারতের সঙ্গে এই অঞ্চলের বাকি দেশগুলোর সম্পর্কের জটিলতা আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নয়। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কগুলোই বহুপক্ষীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্ল্যাটফর্মগুলোকে সবল বা দুর্বল করার জন্য দায়ী। সে জন্য দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক শুরু থেকেই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অসামান্য অবদানের সুবাদে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের মিত্র হিসেবেই তার যাত্রা শুরু করে। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে সেই সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ী বুনিয়াদ গড়ে ওঠেনি। ভূবাস্তবতা বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। দুই দেশের একই ঐতিহাসিক স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য সেই সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষেই কথা বলে। তবু, আমরা দেখেছি বাস্তবতা আশানুরূপ ছিল না কখনোই। সময়ে সময়ে সম্পর্কের উন্নতি হলেও তা বেশি দিন স্থায়ী করা সম্ভব হয়নি।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুদেশের সম্পর্ক ধীরে ধীরে ইতিবাচক দিকে মোড় নেয়। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে অনেক অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে। নদীর পানিবণ্টন, বাণিজ্য ঘাটতি এবং সমুদ্র ও স্থলসীমান্তকেন্দ্রিক সমস্যা ছিল দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। তবে সমুদ্রসীমার মীমাংসা, স্থলসীমান্ত সমস্যার সমাধান ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনের ফলে সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবু আন্তর্জাতিক নদীগুলোর সুরাহা ও বাণিজ্যবৈষম্য এখনো দুদেশের

সম্পর্কের গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। ভাটির দেশ হওয়ায় উজানের পানির ন্যায্য হিস্যা না পাওয়া বাংলাদেশের কৃষি তথা অর্থনীতির অভাবনীয় ক্ষতি ঘটে চলেছে। এসব সমস্যার আশু মীমাংসা দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। সারা বিশ্ব যখন সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন এই দুই দেশের প্রায় দেড় শ কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারাটা হবে রাজনীতিকদের চরম ব্যর্থতা।

২০১৫ সালে স্থলসীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে ছিটমহলের মানুষের দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রহীনতার অবসান ঘটে। কিন্তু তারপরও কিছু সমস্যা যেমন রয়েই গেছে, তেমনি যোগ হয়েছে নতুন করে আরও কিছু সমস্যা। অনেকে আবার নাগরিকত্বও পাননি। এসব সমাধানকল্পে ছিটমহলের সমস্যা ও সংকট নিয়ে এই সংখ্যায় আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী।

সারা বিশ্বে পারস্পরিক আস্থা ও সম্পর্ক তথা বিশ্বায়নের ধারণা যখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, তখন বাংলাদেশ ও ভারতের সামনে সেসব কাটিয়ে ওঠার সুযোগ রয়েছে। সে পথে এই দুই দেশ কতটুকু সফল হবে, তার ওপরই নির্ভর করছে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার ভবিষ্যৎ।

বর্তমানে বিশ্বায়ন-সম্পর্কিত নানা আলোচনা-সমালোচনা বিবেচনা করে আমরা এবারের সংখ্যায় বিশ্বায়নের গতিপথ বোঝার চেষ্টা করেছি। বদরুল আলম খানের লেখায় বিশ্বায়নের ধারণা যে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়, তা ধরা পড়েছে। বিশ্বায়নের ইতিহাস টেনে এনে তিনি বর্তমানকালের বিশ্বায়নের গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট আত্মপরিচয়ের সংকট, সংস্কৃতির উচ্ছেদ, ক্ষমতাকাঠামোর মতো ক্ষমতার রাজনীতি ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠা নানামুখী ধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ উঠে এসেছে এই প্রবন্ধে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎস বিশ্বায়নের অনেক বিষয়ে খোলামেলা সমালোচনা করেছেন। বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ স্টিগলিৎস তাঁর বই *মেকিং গ্লোবালাইজেশন ওয়ার্ক* গ্রন্থে বিশ্বায়নকে আরও কার্যকর করার ওপর জোর দিয়েছেন। বিশ্বায়ন বিষয়ে ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের একটি বড় কারণ বাণিজ্য ও মেধাসম্পদ। এ দুই বিষয়ে কীভাবে উন্নত নীতি ও প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে বিশ্বায়নকে আরও বেশি কার্যকর করা যায়, এই বইয়ের আলোকে সেই আলোচনাই করেছেন প্রতীক বর্ধন।

বিশ্বায়নের উল্টোরথ বিবেচনায় রেখে এই সংখ্যায় আমরা চেষ্টা করেছি বিশ্বায়নের পক্ষের মৌলিক যুক্তিগুলোয় পুনরায় দৃষ্টিপাত করতে। এর ফলে বর্তমান বিশ্বে বিশ্বায়নবিরোধী যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে তা পাঠকের জন্য বোঝা সহজতর হবে। বিশ্বায়নের অন্যতম প্রবক্তা জগদীশ ভাগবতী তাঁর *ইন ডিফেন্স অব গ্লোবালাইজেশন* গ্রন্থে বিশ্বায়নবিরোধিতার জবাবগুলো বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেসব যুক্তির আলোকে বইটি আলোচনা করেছেন খলিলউল্লাহ্। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়, তার অনেকগুলোই যথাযথ। সেগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, সেটাই বিশ্বায়নের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। খলিলউল্লাহ্ এই আলোচনায় এই বিষয়টির ওপরই বেশি আলোকপাত করেছেন।



বাংলাদেশে মাদ্রাসাশিক্ষা : প্রতিযোগিতা, সমঝোতা ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব*

আলী রীয়াজ

সারসংক্ষেপ

গণমাধ্যমের আলাপচারিতা, প্রচলিত কথাবার্তা, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের পদক্ষেপ, এমনকি প্রচলিত গবেষণাতেও ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষত মাদ্রাসার উদ্দেশ্য এবং সমাজে তাদের ভূমিকা নিয়ে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈচিত্র্য সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এমন ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে সেক্যুলার ও ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক বৈরী এবং এদের মধ্যে সমঝোতার সুযোগ খুব অল্প। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে একদিকে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মাদ্রাসাগুলোর যেমন চলমান বিরোধ আছে, তেমনি মাদ্রাসাগুলোর সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশ্নে, বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও সক্রিয় প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই প্রবন্ধে আরও দেখানো হয়েছে যে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করার মতো সুযোগ রয়েছে। শিক্ষাকে আদর্শিক দ্বন্দ্বের একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, মুসলিম সমাজগুলোতে জ্ঞান, কর্তৃত্ব এবং ইসলামের অর্থ নির্ধারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সেই দ্বন্দ্বের একটি উপাদান।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

শিক্ষা, মাদ্রাসা, দেওবন্দ, ইসলাম, মুসলিম, বাংলাদেশ, রাষ্ট্র, সেক্যুলার

ভূমিকা

গণমাধ্যমের আলাপচারিতা, প্রচলিত কথাবার্তা, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের পদক্ষেপ, এমনকি প্রচলিত গবেষণাতেও ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে, বিশেষ করে

---

* অনুবাদ : **গোলাম মুস্তাফা ও খলিলউল্লাহ্**

মাদ্রাসাশিক্ষাকে একটি একক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এসব আলোচনায় এটা ধরে নেওয়া হয়, সব মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম অভিন্ন না হলেও তা একই ধরনের। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে আঞ্চলিক ভিন্নতা (যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশীয় মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে ভিন্নতা) এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছে, তবু মাদ্রাসাগুলোর মধ্যকার বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা খুব কম। বিশেষত মাদ্রাসাগুলোর উদ্দেশ্য এবং সমাজে তাদের ভূমিকা নিয়ে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। এসব প্রতিষ্ঠানকে ভালোভাবে বুঝতে এবং এগুলোর ব্যাপারে নীতিনির্ধারণে মাদ্রাসাগুলোতে বিদ্যমান বৈচিত্র্যগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এমন ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে সেক্যুলার এবং ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক বৈরী এবং এদের মধ্যে সমঝোতার সুযোগ খুব অল্প।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে আমি এই প্রবন্ধে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক এসব ভুল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করব। আমার মতে, ইসলামি শিক্ষা খাত, বিশেষত মাদ্রাসাগুলোর মধ্যেই কেবল পার্থক্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে তা নয়, একদিকে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মাদ্রাসাগুলোর যেমন চলমান বিরোধ আছে, তেমনি মাদ্রাসাগুলোর সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশ্নে, বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও সক্রিয় প্রতিযোগিতা রয়েছে। আমি আরও দেখাব যে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করার মতো ক্ষেত্র রয়েছে এবং তা বাংলাদেশে ঘটেছে। এসব সমঝোতা উভয়মুখী অর্থাৎ উভয়কেই একমত হতে হয়; কারণ সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উভয়কেই পরিবর্তন মেনে নিতে হয়, নতুন পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। আমাদের আলোচনায় আরও প্রতীয়মান হবে যে বর্তমানের সমাজ বাস্তবতা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দাবি করলেও সব ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এসব পরিবর্তন মেনে নিতে ইচ্ছুক বা তৈরি থাকে না। তবে এটাও উল্লেখ্য যে শত শত বছর ধরে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ইসলামি শিক্ষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

আমি দুই ধাপে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করব : প্রথমত, আমি দেখাব শিক্ষা শুধু জ্ঞানের বিষয়ই নয়, এর সঙ্গে ক্ষমতারও সম্পর্ক রয়েছে। পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির (পেডাগজি) মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাকে স্বাভাবিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং এর প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং একটি উদার সেক্যুলার রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি একটি নির্দিষ্ট ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করে। অন্যদিকে, ওলামা এবং ইসলামপন্থীরা (ইসলামিস্টরা) একটি ভিন্ন দর্শন প্রদান করেন। দ্বিতীয়ত, আমি দেখাব যে বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসার মাধ্যমে এসব মান নির্ণায়ক (নর্মেটিভ) পার্থক্যগুলোর বাস্তব রূপ ধারণ করছে। এই পার্থক্যগুলো শুধু

তাদের পাঠ্যক্রমের ভিন্নতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের বিশ্ববীক্ষাও অভিন্ন নয়। একই সঙ্গে কীভাবে 'সত্যিকার মুসলিম' হওয়া যায়, তা নিয়েও তাদের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। 'সত্যিকার মুসলিম' একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এটি শুধু ইসলাম ধর্মের মৌলিক ধর্মানুশাসন দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ধারণাটির ব্যাখ্যা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সময় দ্বারাও প্রভাবিত হয়। ফলে সত্যিকার মুসলিম হওয়ার এই আপাতচ্যালেঞ্জটি নির্ধারণ করে কী হবে তাঁর পরিচয় এবং কী হবে তাঁর দায়িত্ব।

এই প্রবন্ধ ছয়টি অংশে বিভক্ত। আলোচনার শুরু হয়েছে শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্ক দিয়ে। দ্বিতীয় অংশে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটা আমাদের নানা ধরনের মাদ্রাসাসহ শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ধারার মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশে মাদ্রাসাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে তৃতীয় অংশে। এরপরের অংশে মতাদর্শগত অবস্থানসহ বাংলাদেশের মাদ্রাসাব্যবস্থার পার্থক্যগুলোর বিভিন্ন গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেক্যুলার/সাধারণ শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যকার সম্পর্কও আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অংশে আমি এসব প্রতিযোগিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি। এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত তিনটি মূল বিষয়ের সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে শেষ অংশে।

শিক্ষা : মতাদর্শগত প্রতিযোগিতা

মিশেল ফুকোর ভাষায় বললে বলতে হয়, জ্ঞান হচ্ছে ক্ষমতার উপস্থিতির একটি প্রকাশ (manifestation) (ফুকো, ১৯৭৯, পৃ. ২৭)। একইভাবে মাইকেল অ্যাপলের মতে, 'সমাজে যে পন্থায় অসম ক্ষমতা পুনরুৎপাদিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়, সে ব্যাখ্যায় শিক্ষাকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে। ক্ষমতা যেভাবে রক্ষিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার' (অ্যাপল, ২০০৪, পৃ. vii)। তাই কোনো সমাজে ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো কী, সেটা প্রকাশিত হয় শিক্ষাগত জ্ঞানের নির্ধারণ-পদ্ধতি, শ্রেণিবিভাগ, বণ্টন, সম্প্রচার এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে। জ্ঞানের ওপর নিয়ন্ত্রণ একদিকে সত্যের নির্দিষ্ট আধিপত্যবাদী (হেজেমনিক) ধারণাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈধতা দান করে। অন্যদিকে, এটা নির্দিষ্ট ধরনের সচেতনতা, বিশ্বাস, মনোভাব, মূল্যবোধ এবং আচরণকে স্বাভাবিক, সর্বজনীন এমনকি চিরায়ত হিসেবে উপস্থাপন করাকে অনুমোদন করে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদারনৈতিক রাষ্ট্র ও মতবাদ হিসেবে আলোকায়নের (এনলাইটেনমেন্ট) আবির্ভাবের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, মতাদর্শগত প্রভাবশালী রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো চার্চকে (অন্য কথায় ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠানগুলোকে) প্রতিস্থাপিত করেছে (আলথুসার, ২০০১, পৃ. ১০৩-১০৪)। মতাদর্শগত আধিপত্যবাদের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উত্থান ঘটেছে। যার ফলে শিক্ষা খাত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি/গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার নতুন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, আর সেই প্রতিযোগিতার প্রকাশ ঘটছে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি-সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্যে। অ্যাপলের ভাষায়, 'কোন ধরনের জ্ঞান শেখানো হয় বা হওয়া উচিত, কার জ্ঞান "প্রাতিষ্ঠানিক" এবং কী শিক্ষা দেওয়া হবে, কীভাবে শেখানো হবে, শিক্ষা গ্রহণকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং এ বিষয়ে কার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে—এসব বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বের একটি ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা' (অ্যাপল, ২০০৪, পৃ. vii)।

এসব দ্বন্দ্ব এই অর্থে সর্বজনীন যে যেকোনো উদার বুর্জোয়া সমাজেই এগুলো বিদ্যমান থাকে। অন্যদিকে, ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থা এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এবং দ্বন্দ্বগুলোর বহিঃপ্রকাশের ধরন নির্ধারণ করে দেয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজগুলোতে এই দ্বন্দ্বগুলোর মাত্রা দুটি : একদিকে এই দ্বন্দ্ব শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মতামতগুলোকে কেন্দ্র করে; অন্যদিকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞান বিশেষত শিক্ষা ইসলামের কেন্দ্রীয় বিষয়। উল্লেখ্য যে ইলম (জ্ঞান)[১] হচ্ছে কোরআনে সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে তৃতীয়, যা জ্ঞানকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে তা নির্দেশ করে। ইসলামি ধর্মীয় রচনাবলিতে মৌলিক ধার্মিকতার[২] অংশ হিসেবে সারা জীবন ধরে শেখার ওপর বারবার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে শিক্ষা কমপক্ষে চারটি ভূমিকা পালন করে। এগুলো হলো : জ্ঞানের বিস্তার, ধর্মবিশ্বাসের প্রচার, চরিত্র গঠন এবং অনুসারীদের সংঘবদ্ধ করা (রিৎজ, ২০১০, পৃ. ১০৬-১৩৯)। সুতরাং, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা 'ধর্মপ্রচারের সমার্থক। পৃথিবীতে "সত্য" ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে অন্যদের ইসলামের পথে শিক্ষিত করা' (রিৎজ, ২০১০, পৃ. ১০৭)। এই কাঠামোতে, জ্ঞান প্রদানই শিক্ষার একক উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষা গ্রহণকারীদের নিজেদের জীবনে দিকনির্দেশনা দেওয়া এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আরও অনুসারী তৈরি করতে পারে, এটা নিশ্চিত করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। যেমনটি আমি পরবর্তী সময়ে দেখাব, ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে এই লক্ষ্যসমূহ কীভাবে অর্জন করা হবে, সে সম্পর্কে সব সমর্থক একমত নন। ফলে বিষয়টি তাদের মধ্যে নতুন বিতর্কের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় মাত্রাটি হচ্ছে এটার সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক। মুসলিম সমাজগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্র শুধু 'ইসলামি' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা তৈরি নয়, যদিও এগুলোর একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে এবং এগুলো সমাজের সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজগুলোতে আধুনিক রাষ্ট্র/জাতিগঠন প্রয়াসের অংশ হিসেবে সৃষ্ট 'সেক্যুলার' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও রয়েছে।[৩] সুতরাং মুসলিম সমাজগুলোতে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পাঠ্যক্রমের বিষয়াবলি নিয়ে বিতর্কের তিনটি স্বতন্ত্র মাত্রা রয়েছে: ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাধীন সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতর্ক এবং দুটি ভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্র—'সেক্যুলার' এবং 'ইসলামি' শিক্ষাব্যবস্থার—নিজেদের অভ্যন্তরে বিতর্ক।[৪]

উনিশ শতকে উপনিবেশবাদের মাধ্যমে পশ্চিমের সংস্পর্শে আসার কারণে বা উপনিবেশ অবসানের পর, বিশেষত ১৯৫০-এর ও ১৯৬০-এর দশকে আধুনিকায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম সমাজে উল্লেখযোগ্যভাবে দৃঢ় হয়েছে। সেই সময়ে সেক্যুলার বিদ্যালয়গুলোকে উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হতো। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একটি সেক্যুলার জাতিসত্তা পুনরুৎপাদনের ওপর জোর দিয়ে সরকারসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেক্যুলার এবং একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করে। শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ছিল: সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির মানসিক রূপান্তর সাধন এবং ইতিহাস ও মতাদর্শের একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রচার করা। এই নীতি হচ্ছে সমাজকে সেক্যুলারকরণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেক্যুলারকরণ বলতে শুধু ধর্মীয় কাঠামোর রাজনৈতিক গুরুত্ব কমানোকে বোঝায় না, বরং ধর্মভিত্তিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকাঠামোর প্রান্তিকীকরণও এর লক্ষ্য (ময়জার, ১৯৯১, পৃ. ১৪)। ড্যান দিনারের ভাষায়:

> সেক্যুলারকরণের বিষয়টি শুধু ধর্মকেন্দ্রিক নয়, এটা অনেকাংশে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে ছাড়িয়ে যায়। সেক্যুলারকরণ পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া, যা জীবনের সব ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করে...এই দৃষ্টিতে সেক্যুলারকরণ জীবনের একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য ক্ষেত্রগুলোর এবং একই সঙ্গে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার পৃথক্করণ। সেক্যুলারকরণ নির্দেশ করে সংজ্ঞায়ন, ব্যাখ্যা, সমঝোতা, রূপান্তর এবং অন্দরের জীবনাচার ও বাইরের বিশ্বের মধ্যে রূপান্তরের একটি বিরামহীন প্রক্রিয়াকে। এটা মানবিক যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের রহস্যোদ্ধার ও তা নিজস্বভাবে ব্যবহার করাকেও নির্দেশ করে। বিশ্বাসকাঠামো হিসেবে সমাজকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ধর্ম এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে (দিনার, ২০০৯, পৃ. ১৭)।

আধুনিকতা উত্তর-আলোকায়নপর্বের পশ্চিমা একটি ধারণা। ধর্মের এই প্রান্তিকায়ন আধুনিকতার একটি ফল। কারণ এই ধারণাই প্রচলিত যে আধুনিকতার শুধু একটি প্রধানতম আখ্যানই থাকতে পারে। এই প্রধানতম আখ্যানে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় বা অন্যান্য দৃষ্টিকোণের গণ্ডি বেশ সীমাবদ্ধ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন উদ্দেশ্যগুলোও অন্য একটি

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পটপরিবর্তনের ফল, তা হলো হেজিমনিক মতাদর্শ হিসেবে স্বল্প সময়ে (সেক্যুলার) জাতীয়তাবাদের নাটকীয় উত্থান। সম্প্রদায়ের টিকে থাকা এবং সাফল্যের জন্য উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন এবং উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রসমূহ, 'জাতিসত্তা'র ধারণাটিকে অপরিহার্য হিসেবে ধারণ এবং আত্মস্থ করে। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের (১৯৯১) কল্যাণে এখন আমরা যেমনটি জানি, জাতি একটি 'কল্পিত সম্প্রদায়'। এই কল্পনা কোনো প্রাকৃতিক সত্তা নয়, বরং একটি নির্মিত প্রকল্প। এই প্রকল্প 'নতুন জাতি' ছাড়া অন্য কোনো পরিচিতি এবং সামাজিক মূল্যবোধের (উদাহরণস্বরূপ, জাতিসত্তা, ধর্ম, উপজাতি ও গোত্র) প্রতি আনুগত্যকে নাকচ করে দেয়। এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে জাতীয়তাবাদ শুধু সেক্যুলারপন্থীদের একার কাঙ্ক্ষিত বিষয় ছিল, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোও এটাকে আপন করে নিয়েছিল। কারণ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এটা সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে একধরনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে (য়ূরোর্গেসমায়ার, ২০০৮)। অন্যদিকে, আরব ও মুসলিম বিশ্বের সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এটি ছিল আন্তর্জাতিক বিশ্বে অংশগ্রহণের একটি উপায় (করি, ২০০৪, পৃ. ১২৮-১৭১)। ফলে, গোটা উনিশ শতকে আমরা 'সেক্যুলারকরণ, আলোকায়ন এবং আধুনিকতা—এই ত্রয়ীর' উত্থান এবং 'সর্বজনীনায়ন' (universalization) প্রত্যক্ষ করেছি (দিনার, ২০০৯, পৃ. ১৭)।

সমাজের সেক্যুলারকরণ বা অন্ততপক্ষে তা করার প্রচেষ্টা, দুটি দ্বান্দ্বিক পরিসরের উপস্থিতি নির্দেশ করে : ব্যক্তিগত (private) এবং জন বা সর্বজনীন পরিসর (public)। এই কাঠামোতে ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে স্থান দেওয়া হয়। মুসলিম সংখ্যাগুরু সমাজে ধর্মকে ব্যক্তিগতকরণ ইসলামি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঐতিহ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। ইসলামি ইতিহাসের সকল পর্যায়ে, আলেমরা (ইসলামি বিদ্বান ব্যক্তি, বহুবচনে ওলামা) জনপরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে পণ্ডিত সম্প্রদায় রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করেছে।[৫] যদিও ইসলামের প্রাথমিক যুগে নানা ধরনের ব্যক্তিদের—আইনজ্ঞ থেকে শুরু করে ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন ব্যক্তিকে আলেম হিসেবে বর্ণনা করা হতো (মোত্তাহিদি, ১৯৮৫, পৃ. ২৩১)[৬], সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলেমদের সম্পর্কে ধারণাগুলো আরও সূক্ষ্ম হয়েছে। যাঁরা নির্দিষ্টভাবে ইসলামি পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের ওলামা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁদের সাধারণত 'কোরআনের ব্যাখ্যাকারী, ধর্মীয় উৎসের ভিত্তিতে ফিকাহর (আইনশাস্ত্র) বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সমাজের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যাকারী স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ' হিসেবে দেখা হয় (নাফি এবং তাজি ফারুকি, ২০০৪, পৃ. ৫-৬)।

ফলে আলেমদের প্রাথমিক কাজ হয়ে ওঠে ঐতিহ্যের মূল উদ্দেশ্য থেকে কোনো ধরনের বিচ্যুতি ছাড়াই সবচেয়ে আদিরূপে একটি সম্মানজনক ঐতিহ্যকে রক্ষা ও প্রচার করা। তাঁরা কীভাবে এই জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এটা কীভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে তাঁদের কর্তৃত্বের উৎস গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল। 'ধর্মীয় মতবাদের সুরক্ষা, সামাজিক বন্ধন ধরে রাখা এবং রাষ্ট্রকে বৈধতা দান করার' কাজে আলেমরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতেন (নাফি এবং তাজি ফারুকি, ২০০৪, পৃ. ৬)। সাধারণভাবে বলতে গেলে, স্থান ও কালের ভিন্নতা সত্ত্বেও আলেমরা নানা ধরনের সামাজিক ভূমিকা পালন করতেন; যেমন 'কাজি, শিক্ষক, মুফতি, ওয়াকফের রক্ষাকর্তা, বাজার পরিদর্শক এবং লিপিকার' (নাফি এবং তাজি ফারুকি, ২০০৪, পৃ. ৬)। ফ্রান্সিস রবিনসনের মতে, 'তাঁরা নানা ধরনের ভূমিকা পালন করতেন। তাঁরা হয়তো মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং এতিমখানা পরিচালনা করতেন। তাঁদের কেউ কেউ রাজসভাসদ্, কূটনীতিক বা নেতৃস্থানীয় আমলা ছিলেন' (রবিনসন, ১৯৯৬, পৃ. ২১৯)।

নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রমিত পাঠ্যক্রম চালু করা, ব্যক্তিগত পরিসর ও জনপরিসরের অত্যন্ত কঠোর বিভাজন এবং বিভক্তিকরণ, যার উৎস হচ্ছে আধুনিকায়ন এবং সেক্যুলারকরণ, তার ফলে মুসলিম সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সমাজে আলেমদের কর্তৃত্ব খর্বিত হয় এবং তাদের গুরুত্ব হ্রাস পায়।[৭] এটা অস্বীকার করা যাবে না যে এসব পরিবর্তনের ফলে 'ওলেমার কর্তৃত্বপূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞানের কার্যকর ব্যবহার' (জামান, ২০০৭, পৃ. ১) চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।[৮] এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আলেমদের এই বিতর্কে টেনে আনা হয়েছিল। কারণ শিক্ষাই ছিল সেই ক্ষেত্র, যেখানে দুটি দ্বান্দ্বিক পরিসর—জনপরিসর এবং ব্যক্তিগত পরিসর—পরস্পর মিলিত হয়েছিল।

শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রচার। ওলামার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ইসলামি ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, প্রসার, পুনরুৎপাদন, ধর্মীয় পাঠ্য বিষয়গুলো (যেমন কোরআন এবং শ্রদ্ধেয় ইসলামি পণ্ডিতদের ভাষ্যগুলো) শিক্ষা দেওয়ার বিষয়গুলো আছে। কিন্তু যেমনটা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইসলামি শিক্ষার অন্যান্য মৌলিক উদ্দেশ্যও রয়ে গেছে: যেমন ধর্মবিশ্বাসের বিস্তার এবং অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করা। এটা মনে রাখা ভালো যে 'জনপরিসরে' অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী এবং আন্দোলনগুলো শুধু একে অন্যের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্তই হয় না, বরং সর্বজনীন মঙ্গলের অর্থ নিয়ে সমঝোতা, দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতায়ও লিপ্ত হয়। এসব সমঝোতা, দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা সর্বজনীন মঙ্গলের কাজের চেয়ে, সর্বজনীন মঙ্গল বলতে কী বোঝা যায়, তার অর্থ কী সেই বিষয়ের ওপর আমি বেশি জোর দিচ্ছি। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই অর্থ নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্র ও সেক্যুলারপন্থীদের মতো আলেমরা এই অর্থ নির্ধারণ করতে পছন্দ করেন। এটাই শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পরিণত করছে। এখানে দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি মুখোমুখি হয়: প্রথমটি গোষ্ঠী বা জাতির পরিচয়কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব এবং দ্বিতীয়টি জাতির ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব। এগুলোই নির্ধারণ করে দেয় নাগরিক বলতে কী বোঝানো হবে, নাগরিকের কী ধরনের দক্ষতা থাকা দরকার। ফলে, পাঠ্যক্রম এবং পাঠদান পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিক্ষা খাতকে নিয়ন্ত্রণ করা এসব দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলো শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্নভাবে: একটি সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এই ব্যবস্থাকে 'জাতীয়' বলে সম্বোধন করা (এর ফলে অন্যগুলোকে সংকীর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা), শিক্ষক এবং ছাত্রদের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ, মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষার প্রচলন, আর্থিক প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি হচ্ছে এই নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উদাহরণ। আরও যে পদক্ষেপগুলো রাষ্ট্র নেয় সেগুলো হলো: তদারকির ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, সর্বজনীন জ্ঞানভাষ্য থেকে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রান্তিকায়ন এবং ধর্মীয় বিদ্বানদের কর্তৃত্ব হ্রাস। ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যেন রাষ্ট্রের প্রধান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মিল রেখে তাদের ব্যবস্থার সংস্কার করে সেই লক্ষ্যে সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলো ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনা দেয় এবং প্রায়ই সংস্কারের দাবি তোলে। সেক্যুলার শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে সংস্কার পদক্ষেপও গ্রহণ করে।[৯] বিভিন্ন রাষ্ট্র, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন সময়ে নেওয়া এসব সংস্কার উদ্যোগের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্রগুলো ধর্মীয় শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করেছে। এ জন্য রাষ্ট্রগুলো একদিকে তাদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে এবং অন্যদিকে তাদের প্রভাবশালী (বা মূলধারার) শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শেষের পদক্ষেপটির ফলে এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে, যেটাকে আমরা বলতে পারি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় বিদ্যালয় তৈরির সুযোগ। এই পদক্ষেপ দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করে: রাষ্ট্রের সেক্যুলার মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বস্ত করা এবং একটি ধর্মীয় জীবনধারা প্রবর্তন করা।[১০]

রাষ্ট্র যখন নিজের ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, মুসলিম সমাজগুলোতে সাধারণত আলেমদের প্রাথমিক এবং সাধারণ প্রতিক্রিয়া হয় এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধের পেছনে তিনটি কারণ বলা হয়: প্রথমত, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এই ব্যবস্থা শত শত বছর ধরে টিকে আছে। যার অর্থ হচ্ছে, এই ব্যবস্থার ভেতরেই ইতিমধ্যে একধরনের সংস্কার কার্যপদ্ধতি রয়েছে; দ্বিতীয়ত, সংস্কার প্রস্তাবের উদ্দেশ্যগুলো

ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলোর বিপরীত। তৃতীয়ত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের কোনো অধিকারই সেক্যুলার রাষ্ট্রের নেই। প্রতিরোধের রূপ রাষ্ট্রের সঙ্গে অসহযোগিতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। রাজনৈতিক সক্রিয়তা মানে তাদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব পালনের স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র তৈরির জন্য রাষ্ট্র প্রবর্তিত সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি বড় গোষ্ঠী তৈরি করা। এই গোষ্ঠী তৈরির নিমিত্তে ইসলামি ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার জন্য প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নতুন মাদ্রাসা নির্মাণ বা বিদ্যমান মাদ্রাসাগুলোর সংরক্ষণ জরুরি বলে আলেমরা মনে করেন। প্রতিরোধের এই ধারা আধিপত্যবাদী (হেজিমনিক) মতবাদ এবং প্রতি-আধিপত্যবাদী (কাউন্টার-হেজিমনিক) মতবাদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব নিশ্চিত করে। যে মাদ্রাসাগুলো সরকারের আধিপত্য মেনে নেয় না তাদের অবস্থান প্রভাবশালী মতবাদের জন্য চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়।

শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাধীন শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ দাঁড় করায়। আধুনিক রাষ্ট্র শিক্ষাকে দেখে একটি জ্ঞানভান্ডার প্রচারের উল্লম্ব (ওপর থেকে নিম্নমুখী) সুসংগঠিত মাধ্যম হিসেবে। অন্যদিকে, মাদ্রাসাব্যবস্থা উপস্থাপন করে এমন পদ্ধতি, যেখানে জ্ঞান এবং জীবনযাপন-বিষয়ক জ্ঞান বৈচিত্র্যময় এবং তুলনামূলকভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত। এই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে কিছু মাদ্রাসা তাদের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদানপদ্ধতি সংস্কার করতে অস্বীকার করেছে, বিপরীতক্রমে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধগুলোকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। কারণ যেকোনো ধরনের সংস্কারই ঐতিহ্য থেকে একটি বিচ্যুতি এবং ইতিহাস তাদের যে ধরনের ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দিয়েছে বলে তারা মনে করে, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। মাদ্রাসা এবং আলেমদের একাংশের গোঁড়া বা রক্ষণশীল বিশ্বাসের মূল এখানেই প্রোথিত আছে।

তবে সব আলেম সব বিষয়ে একই ভাষায় ও স্বরে কথা বলেন না। আলেমরা প্রকৃতিগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ; ঐতিহাসিকভাবে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী নেই, যাদের 'ওলামা' বলে ডাকা হতো। জনাথন বার্কি ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে আলেমদের বৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন :

> ওলামা খুবই উন্মুক্ত একটি এলিট (সম্ভ্রান্ত) শ্রেণি ছিল। কোন ব্যক্তি একজন আলেম, তা নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি এতটাই ঢিলেঢালা এবং নমনীয় ছিল যে একটি 'আবদ্ধ আলয়' গড়ে তোলা এবং রক্ষা করা বস্তুত অসম্ভব ছিল, যেমনটা সম্ভব হয়েছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপে। কারণ সেখানে যাজকেরা পৌরোহিত্যের অভিষেক, পবিত্রকরণ এবং শিক্ষার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা আধুনিক সময়ে [উচ্চতর ধর্মীয়] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তি এবং স্বীকৃতির সংকীর্ণ সুযোগের মাধ্যমে করা যাচ্ছে (আমাদের ক্ষেত্রে একটি অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের মতো বিষয়)। অন্য কথায়, আধুনিক-পূর্ব যুগে ওলামা একটি বিস্ময়কর

> বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত। এই গোষ্ঠীতে যেমন আইনশাস্ত্র এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিজ্ঞানে বিদ্বান বিখ্যাত ব্যক্তিরা ছিলেন, তেমনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত কম বিদ্বান, ধর্মপ্রচারক, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নয় এ রকম ধর্মীয় বিদ্বান ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ধারার সুফি। একই সঙ্গে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে পেশাদারি বা অপেশাদারি, [শিক্ষকতা করতে] আগ্রহ আছে এ রকম ব্যক্তিও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেষোক্তরা কিছুটা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও অর্থবহভাবেই জ্ঞানের প্রচারে অংশগ্রহণ করতে পারতেন (বার্কি, ২০০৬ : পৃ. ৪৬-৪৭)।

ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত জ্ঞানচর্চায় বহুস্বরের উপস্থিতি ছিল, ফলে শুরু থেকেই এই ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ছিল; যা এখনো বিদ্যমান।[১১] এর প্রমাণ হিসেবে সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে চারটি মাজহাবের (ইসলামি আইনশাস্ত্রভিত্তিক বিভাজন)—হানাফি, শাফি, মালিকি ও হাম্বলি এবং শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কমপক্ষে দুটি ধারার—জাফরি ও জাইদি—উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা যায়। প্রতিটি মাজহাবের ভিন্ন ভিন্ন মাসআলা (ধর্মমত) রয়েছে। যুক্তিবিজ্ঞান প্রশ্নে অষ্টম শতাব্দীতে মুতাজিলা এবং আশারিদের মধ্যে বিতর্ক এই বৈচিত্র্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। ঐতিহাসিক কারণেও বহুস্বরের উদ্ভব হয়েছে। মুসলিমরা যেখানে সংখ্যালঘু, সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অংশে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের কারণে মুসলমানদের স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে এবং বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও আচার-আচরণের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়েছে। এর জন্য আলাপ-আলোচনায়, আচরণে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গিকে জায়গা দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। মুসলিমদের রাজনৈতিক সীমান্ত যত বিস্তৃত হয়েছে, ততই প্রয়োজন হয়েছে বৈচিত্র্যের, কখনো কখনো এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছাপার প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে আরও একটি নতুন স্বর যুক্ত হয়। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, যেমন দেওবন্দ, নাদওয়া, বারেলভি, আহলে হাদিস। এগুলো মতামতের বহুত্ব এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ততারই প্রতিফলন।[১২]

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে ইসলামপন্থার উত্থান এবং ইসলামপন্থীরা আরও ক্রমাগতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হওয়ায় বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মতত্ত্বীয় এবং মতাদর্শিক পার্থক্যগুলো সাধারণভাবে শিক্ষার ভূমিকা এবং বিশেষত মাদ্রাসার ভূমিকা বিষয়ে বিতর্কগুলোর বিভিন্ন দিক নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইসলামপন্থীরা নানা ধারায় বিভক্ত হলেও তারা এ বিষয়ে একমত যে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের সংস্কার প্রয়োজন এবং রাজনীতিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। উদারবাদী সেক্যুলার রাষ্ট্রসমূহ যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেয় এবং ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে ইসলামপন্থীদের এই দাবিগুলো তার থেকে ভিন্ন।

তবে এই দাবিগুলো এই একই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে ইসলামের 'সত্যিকার' অর্থ প্রকাশে এই প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এটা ইসলামপন্থী এবং প্রথানুসারী আলেমদের মধ্যে বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আলেমরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। ইসলামপন্থীদের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা এসেছে তাদের মতাদর্শিক গুরুদের কাছ থেকে, যার সঙ্গে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা এবং রাজনৈতিক কৌশল জড়িত। অন্যদিকে আলেমরা কোরআন-হাদিসের প্রথাগত ভাষ্য এবং তাদের নিজেদের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করেন। এটা বলার অর্থ এই নয় যে সমাজে আলেমদের কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা নেই। সমাজে অবশ্যই তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা আছে। তাঁদের কাছে সফলতার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সমাজের ইসলামীকরণ এবং সমাজের নৈতিক অবক্ষয়গুলো তুলে ধরা। অন্যদিকে ইসলামপন্থীদের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এটা তাঁদের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য, যেটি পশ্চিমের দেশগুলোতে আলাপ-আলোচনায় সব সময় যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না।

মুসলিম সমাজগুলোতে জ্ঞান, কর্তৃত্ব এবং ইসলামের অর্থ নির্ধারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। মোটা দাগে আমরা এগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি: উদারবাদী সেক্যুলার রাষ্ট্র, গোঁড়া ওলামা এবং ইসলামপন্থীরা। তিনটি শক্তির প্রতিটিই এমন মাদ্রাসা স্থাপনের চেষ্টা করে, যা তাদের ধর্মতত্ত্ব এবং মতাদর্শগত অবস্থান তুলে ধরবে এবং যা তাদের ধর্মতত্ত্বগত/রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে তারা এমন শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, যারা আদর্শ পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করবে। মাদ্রাসাশিক্ষার উপযোগিতা এবং পাঠ্যক্রম-সম্পর্কিত বিতর্ক এবং সাধারণ আলাপ-আলোচনায় এই অবস্থানগুলোই উঠে আসে।

বাংলাদেশে মাদ্রাসাব্যবস্থা : একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে দুই ধরনের মাদ্রাসাব্যবস্থা রয়েছে, যা প্রাথমিক পর্যায়ের পরে শিক্ষা দান করে; এগুলো হচ্ছে: আলিয়া মাদ্রাসা, যেগুলো কলকাতা মাদ্রাসাকে (পরবর্তী সময়ে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা) অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত সরকার-সমর্থিত প্রতিষ্ঠান[১৩] এবং কওমি মাদ্রাসা, যেগুলো সাধারণত দেওবন্দ মাদ্রাসার অনুকরণে তৈরি বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাদ্রাসা।[১৪] তবে আলিয়া এবং কওমি দুই ধরনের মাদ্রাসাতেই প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ ইবতেদায়ি শিক্ষা দেওয়া হয়। দুই ব্যবস্থার বাইরেও কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা রয়েছে।[১৫] যদিও এই দুই ধরনের মাদ্রাসাতেই ধর্মীয় পাঠ্যের ভিত্তিতে, বিশেষত কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতে, শিক্ষা দেওয়া হয়; তবু তাদের

বৈশিষ্ট্যগুলো ভিন্ন এবং তাদের পাঠ্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে (এই দুই ব্যবস্থার এবং সেগুলোর সমপর্যায়ের সেক্যুলার ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমের একটি সহজবোধ্য তুলনামূলক চিত্রের জন্য ছক-১.১ দেখুন)।[১৬]

ছক-১.১ : সাধারণ শিক্ষা, আলিয়া এবং কওমি মাদ্রাসাগুলোর প্রধান পাঠ্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র।

	সাধারণ শিক্ষা	আলিয়া মাদ্রাসা	কওমি মাদ্রাসা
১.	**প্রাথমিক** : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, অঙ্কন, ধর্মীয় শিক্ষা	**ইবতেদায়ি** : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সামাজিক বিজ্ঞান, কোরআন, আরবি, আকাইদ, ফিকাহ্	**ইবতেদায়ি** : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, আরবি, উর্দু, কোরআন, ফিকাহ্
২.	**মাধ্যমিক** : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, সামাজিক অধ্যয়ন, ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ইতিহাস, কম্পিউটারবিজ্ঞান, কর্মমুখী শিক্ষা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান	**দাখিল** : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, সামাজিক অধ্যয়ন, ইতিহাস, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ইতিহাস, কম্পিউটারবিজ্ঞান, কর্মমুখী শিক্ষা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, কোরআন, আরবি, আকাইদ, ফিকাহ্	**উস্তানি** : ইতিহাস, রাজনীতি বিজ্ঞান, ফিকাহ্, তাজবিদ (কোরআন পাঠের নিয়ম), মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), বাংলা, আরবি, উর্দু, ফারসি
৩.	**উচ্চমাধ্যমিক** : বাংলা, ইংরেজি, পৌরনীতি, অর্থনীতি, কম্পিউটারবিজ্ঞান, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কর্মমুখী শিক্ষা, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, বাণিজ্য বিদ্যা	**আলিম** : বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, উচ্চতর ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটারবিজ্ঞান, কোরআন, হাদিস, ফিকাহ্, আরবি	**সানুবি** : বাংলা, ইতিহাস, আরবি, উসুল-ই-ফিকাহ্ (ব্যাখ্যামূলক আইন), মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), তাফসির (কোরআনের ব্যাখ্যা), ফারাইজ (উত্তরাধিকার আইন)

৪.	**মানবিক বিদ্যা/ বিজ্ঞান/ বাণিজ্য বিদ্যায় স্নাতক :** বাংলা, ইংরেজি, প্রাচ্যের ভাষা, লিবারাল আর্টস, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান এবং ফিন্যান্স, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত	**ফাজিল** : বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাজনীতিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, কোরআনের ব্যাখ্যা, হাদিস, আরবি	তাফসির (কোরআনের ব্যাখ্যা), উসুল-ই-কোরআন, উসুল-ই-হাদিস (রাসুলের বাণীর ব্যাখ্যা), ফিকাহ্, আরবি
৪.	**স্নাতকোত্তর** : স্নাতক পর্যায়ে অধীত বিষয়গুলোই পড়ানো হয়, তবে বাংলা বা ইংরেজির মতো কোনো সাধারণ বাধ্যতামূলক বিষয় থাকে না	**কামিল** : হাদিস, তাফসির, ফিকাহ্, আরবি, ইতিহাস	**তাকমিল** : হাদিসের পাঠ্যসমূহ (দাওরা হাদিস), আল-কোরআন, তাফসির, ফিকাহ্

উৎস : লেখক কর্তৃক প্রণীত।

আলিয়া মাদ্রাসা

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে পাঁচটি ধাপ রয়েছে। ইবতেদায়ি বা প্রাথমিক পর্যায় পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার সমতুল্য। দাখিলে পাঁচ বছর মেয়াদি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। আলিম উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল্য এবং এর মেয়াদ দুই বছর। ফাজিল স্নাতক পর্যায়ের সমতুল্য এবং এর মেয়াদ তিন বছর। কামিল স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সমতুল্য এবং এটি শেষ করতে দুই বছর সময় প্রয়োজন হয়।

দাখিল পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা চারটি ধারার যেকোনো একটি অধ্যয়ন করতে পারে : সাধারণ, বিজ্ঞান, তাজবিদ (কোরআন আবৃত্তির জন্য সঠিক উচ্চারণের শিক্ষা) বা হিফজুল কোরআন (কোরআন মুখস্থ করা)। আলিম পর্যায়ে তিনটি ধারা বিদ্যমান : সাধারণ, মুজাব্বিদ (ইসলামি জীবনধারা এবং শিষ্টাচার) এবং বিজ্ঞান। ফাজিল পর্যায়ে দুটি ধারা রয়েছে : সাধারণ এবং মুজাব্বিদ; অন্য একটি তৃতীয় ধারায় রাজনীতিবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং এ ধরনের বিষয়সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। কামিলে তিনটি ধারা রয়েছে : ফিকাহ্ (আইনশাস্ত্র), তাফসির (কোরআনের ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা) এবং আদব (শিষ্টাচার)। দাখিল ও আলিমের প্রান্তিক পরীক্ষাসমূহ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসাগুলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করলেও খুব অল্পসংখ্যক, মাত্র তিনটি,

মাদ্রাসা সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মাদ্রাসাগুলো সাধারণত ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকেরাই এই কমিটিগুলো নির্ধারণ করেন।

কওমি মাদ্রাসা

এ দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো কয়েকটি ধারা অনুসরণ করে। বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দাবি করে, তারা হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের মতে, কওমি মাদ্রাসাশিক্ষার তিনটি ধাপ রয়েছে: প্রথম ধাপকে প্রয়োজনীয় ধাপ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এই ধাপ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ধাপের সমতুল্য। এই ধাপের মেয়াদ ১০ বছর। দ্বিতীয় ধাপকে উচ্চশিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধাপের মেয়াদ ছয় বছর এবং স্নাতক পর্যায়ের সমতুল্য। তৃতীয় ধাপটি গবেষণাধর্মী এবং এই ধাপের কোনো সুনির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড শিক্ষাক্রমকে ১৬টি ধাপে বিভক্তও করেছে। এই ধাপগুলোকে আবার পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা সমন্বিত একক (Standardized) সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এই পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা করে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এই পর্যায়গুলো হচ্ছে মারহালাতুল *ইবতেদায়ি* (প্রাথমিক সমপর্যায়ের); মারহালাতুল *মুতাওয়াসিথা* (মাধ্যমিক সমপর্যায়ের); মারহালা *সানুবিয়াহ উলাইয়া* (উচ্চমাধ্যমিক সমপর্যায়ের); মারহালাতুল *ফজিলাত* (স্নাতক সমপর্যায়ের) এবং মারহালাতুল *তাকলিম* ।

বৈচিত্র্যের মাত্রাসমূহ

বাংলাদেশে এই দুই ধরনের মাদ্রাসা শুধু ভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রমই অনুসরণ করে না, তারা একাধিক বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দৃষ্টিভঙ্গিও পোষণ করে। তাদের নিজ নিজ গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্যের কথা মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আমি তিনটি পার্থক্য বিশেষভাবে তুলে ধরব: রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, সক্রিয়তাবাদের (activism) প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক

১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে বেশ কিছু সংস্কার এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে আলিয়া মাদ্রাসাগুলোকে মূলধারার সর্বজনীন সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করা হয়। অন্যদিকে, আলেমদের নিজেদের ইচ্ছায়ই কওমি মাদ্রাসাগুলো রাষ্ট্রীয় তদারকির বাইরে থেকে যায়। পাকিস্তানের ইসলামি-রাষ্ট্র মতবাদের বিরোধিতা করে

বাঙালি নৃ-জাতীয়তাবাদী (ethno-nationalist) আন্দোলনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং স্বাধীনতার পর সংবিধানে সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে বলা হলেও, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকার বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে গেছে। ১৯৭৪ সালে অধ্যাপক কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের তৈরি করা শিক্ষানীতিতে জাতীয়তাবাদী ধারণাসমূহকে, বিশেষভাবে সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত করাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা হয়েছিল। যদিও কমিশন সংবিধানের আলোকে একটি অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল, কিন্তু কমিশন তার প্রতিবেদনে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ (মাদ্রাসাসমূহ) বিলোপের সুপারিশ করেনি। একই সঙ্গে, বেসরকারিভাবে পরিচালিত ইংরেজি ভাষার কিন্ডারগার্টেনগুলো বিলোপের পরামর্শও কমিশনের প্রতিবেদনে ছিল না। ১৯৭২ সালে সব ধরনের ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, ফলে তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিগুলো উপস্থিত ছিল না। ধর্মীয় শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সাধারণ শিক্ষার অংশ করার সুপারিশ করেছিল কমিশন, কারণ দেশের শিক্ষিত এলিটরা এ ধরনের একীভূতকরণের পক্ষপাতী ছিলেন।[১৭] এরই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা (মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম শিক্ষা এবং হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য হিন্দু ধর্মীয় পাঠ) অন্তর্ভুক্ত আছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে কার্যক্রম পরিচালনা, পাঠ্যক্রম সুপারিশ এবং সমন্বিত একক পরীক্ষাগুলো আয়োজনের অনুমতি প্রদান করে।[১৮] ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসে; এরপর থেকে মাদ্রাসাগুলো সরকারি সহায়তা পাওয়া শুরু করে। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে মাদ্রাসা বোর্ড ফাজিল ও কামিল ডিগ্রির পাঠ্যক্রম পুনরালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই পাঠ্যক্রম পুনরালোচনার উদ্দেশ্য ছিল : জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলো মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং নির্বাচিত কিছু মাদ্রাসায় আলিম ও ফাজিল পর্যায়ে আলাদা বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা।[১৯] সত্তর ও আশির দশকজুড়ে সামরিক শাসকেরা শিক্ষা খাতের ইসলামীকরণে প্রকাশ্য চেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম-বিষয়ক কমিটি নিযুক্ত করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়, 'ইসলাম একটি জীবনবিধান, শুধু আনুষ্ঠানিকতার সমষ্টি নয়। একজন মুসলমানকে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত,

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবন ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং, ইসলামি জ্ঞানার্জন নারী-পুরুষ সব মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক' (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৮, পৃ. ১৪৯)।

প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক কারণে যেহেতু সামরিক সরকার ইসলামি বাগ্‌ধারা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল এবং সমাজের ইসলামীকরণে মনোযোগী হয়েছিল, তাই ইসলামের অর্থ সংজ্ঞায়িত করা এবং ইসলামি শিক্ষার কর্তৃত্বের ওপর একধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। এর ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মাদ্রাসাশিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই বোর্ডের ওপর মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষাগুলোকে একই ধাঁচের করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। মাদ্রাসাশিক্ষাকে সেক্যুলার সাধারণ শিক্ষার সমমানের করে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয় মাদ্রাসা বোর্ডকে। এর ফলে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির নেতাকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করে। ১৯৮৭ সালের মধ্যে দাখিল ও আলিম ডিগ্রিকে সেক্যুলার শিক্ষাসনদের সমমর্যাদা দেওয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সনদ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়।

এ ব্যাপারে আলেমদের কাছ থেকে তেমন কোনো প্রতিরোধ আসেনি। এর ফলে আলিয়া মাদ্রাসাকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় সহযোজিত করার ক্ষেত্রে সরকার সফল হয়। সংস্কারের ব্যাপারে প্রতিরোধের অভাব/অনুপস্থিতির বেশ কিছু কারণ ছিল। এর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসাব্যবস্থার ঐতিহাসিক পথপরিক্রমা অন্তর্ভুক্ত (এই ব্যবস্থা ১৭৮০ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে গেছে)। মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্তরা এই একীভূতকরণকে একটি সুযোগ হিসেবে দেখেছিল, যার ফলে একাধারে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া যাবে, আবার তাদের সমাজের উৎপাদনশীল ও সক্রিয় সদস্য হিসেবেও প্রস্তুত করা যাবে। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আলেমরা বললেন যে আলিয়া ব্যবস্থা দিনি শিক্ষা ও দুনিয়াবি শিক্ষা দুটোকে একত্র করেছে, অন্যভাবে বললে যা দাঁড়ায়, *আল-উলুম আল-নাকিলয়া* (প্রেরিত বিজ্ঞান) এবং *আল-উলুম আল-আকলিয়া* (যুক্তিবিজ্ঞান) দুই ধরনের জ্ঞানই একটি সামগ্রিক এককের অংশ। এভাবে তাদের শিক্ষার্থীরা একজন সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার চেতনাকে গ্রহণ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং এই সম্পর্ক এখন বেশ প্রতিষ্ঠিত। মাদ্রাসাশিক্ষার স্বীকৃতি ও সাধারণ সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার সমমর্যাদা আদায়ে জামায়াতে ইসলামী

সামনের সারিতে ছিল বলেই মনে করা হয়। জামায়াতের একজন নেতা বলছিলেন, 'যে শিক্ষার্থী মাদ্রাসা থেকে বের হয়, সে অক্সফোর্ডে যাওয়ারও যোগ্যতা রাখে...ইংরেজি, গণিত ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে ইসলাম কখনো নিষেধ করে না। ইসলাম একটি আধুনিক ধর্ম' (বানো, ২০০৮, পৃ. ২৪)। স্পষ্টতই, এই মাদ্রাসাগুলোর লক্ষ্য শুধু ইসলামি পাণ্ডিত্যের ধারা বজায় রাখা নয়, বরং এমন সব পণ্ডিত তৈরি করা, যারা আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি টেক্সটকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক বিষয়গুলো মোকাবিলা করতে পারে। উদ্দেশ্য হলো নতুন চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামকে ব্যাখ্যা করার মতো অবস্থায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া।

মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় আলিয়া মাদ্রাসাকে একীভূতকরণের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, '১৯৮০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী নিবন্ধনের ক্ষেত্রে, মাদ্রাসা খাত তার সমপর্যায়ের সেক্যুলার খাতের চেয়ে দ্রুত বেড়েছে' (বিশ্বব্যাংক, ২০১০, পৃ. ১১)। দুটি নীতি নেওয়ার ফলে এই বৃদ্ধি ঘটেছে: মাদ্রাসাশিক্ষকদের জন্য বেতন ভর্তুকির বিধান (সেক্যুলার সরকারি স্কুলের মতো) এবং মেয়েশিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান।[২০] শেষেরটি আবার মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সংখ্যাগত লিঙ্গ সমতায় প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'সর্বমোট মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নিবন্ধনে মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে, যা ১৯৯০ সালে ১০ শতাংশেরও কম থেকে ২০০৫ সালে ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে' (বিশ্বব্যাংক, ২০১০, পৃ. ১১)।

যদিও সংস্কার কার্যক্রমের ফলে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে, এগুলোকে টেকসই করেছে এবং আগে সমাজের যেসব অংশ বঞ্চিত ছিল সেখানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে, তবুও সংশ্লিষ্ট সব আলেমকে সন্তুষ্ট করা যায়নি। আলেমদের বড় একটি অংশ মাদ্রাসা খাতের এই সংস্কারকে তাদের কর্তৃত্বের ওপর হুমকি হিসেবে দেখে এবং ফলে তারা 'ইসলামি জ্ঞান' সংরক্ষণের কায়দা হিসেবে আরও বেশি কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। গত তিন দশকে একদিকে আলিয়া মাদ্রাসা মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অনেক বেশি একীভূত হয়েছে, অন্যদিকে আলেমরা গ্রামীণ অঞ্চলে বহুসংখ্যক কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো, ইসলামি জ্ঞান ও ইসলামি কর্তৃত্বকে ধ্বংস করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে এসব প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এ ছাড়া ইসলামি শিক্ষার 'বিশুদ্ধতা' এবং ইসলামি ঐতিহ্য প্রবাহিতকরণের 'আদি' পদ্ধতি বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁদের এই ধারণার ফলে তাদের মধ্যে এমন এক মানসিকতা তৈরি হয়েছে, যা বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসায় পরিবর্তনের অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল।

কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম

এটা বলা যাবে না যে কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিকে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য একই ধরনের করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড গঠনের বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টা এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাগুলোকে সমন্বয় করার যে চেষ্টা, তার ইঙ্গিত বহন করে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বা কওমি মাদ্রাসা বোর্ড ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কওমি মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাগুলোকে তত্ত্বাবধান করার জন্য জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্তৃত্বকে সংগঠিত করার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টায় এই বোর্ড অগ্রণী ভূমিকায় ছিল।[২১] এই বোর্ডের বক্তব্য অনুযায়ী ৯০০০ নিবন্ধিত মাদ্রাসা এই বোর্ডের সদস্য হিসেবে তাদের পাঠ্যক্রম ও বই অনুসরণ করে।[২২] সুতরাং, কওমি মাদ্রাসা একই ধাঁচের করার প্রচেষ্টা আলেমদের জন্য কোনো বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়। তাঁরা যেটা বিরোধিতা করেন তা হলো পাঠ্যক্রম নির্ধারণের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। তাঁদের যুক্তি হলো এসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ইসলামি পণ্ডিত তৈরি করা। তাই কোনটা ইসলামি জ্ঞান, তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার শুধু আলেমদেরই আছে। কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন আলেম বলেন, 'মাদ্রাসার আসল উদ্দেশ্য হলো কোরআন ও হাদিস শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলামি শিক্ষার ভিত্তি ধরে রাখা। প্রধান জোরটা দেওয়া হয় আরবি ভাষায়, যেন বাচ্চারা টেক্সট ভালোভাবে বুঝতে পারে। অনেকেই চাকরি পাওয়ার জন্য ডিগ্রি নিতে চায়। যদি তারা এটা চায়, তাহলে তারা তাদের সন্তানদের আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠাবে। কিন্তু যারা শুধু ইসলাম চায়, তারা কওমি মাদ্রাসায় আসবে' (বানো, ২০০৮, পৃ. ২৭)। কওমি মাদ্রাসাব্যবস্থার সমর্থকেরা এ-ও বলেন যে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে। সে জন্য এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সমকক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এ অবস্থায় তারা এমন সুপারিশও করে না যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসাব্যবস্থায় কিছু পর্যায় পড়ে সেক্যুলার ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে। কিছু কিছু ওলামা যুক্তি দেন যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তাদের ইসলামি চরিত্র হারিয়ে ফেলবে এবং এই ব্যবস্থাও তাদের সহপাঠীদের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাবে।

মাদ্রাসা ও সক্রিয়তা

অনেক কওমি মাদ্রাসা আছে, যেগুলো শিক্ষা প্রদান ও ভবিষ্যৎ পণ্ডিতদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যেই নিয়োজিত থেকেছে। সে জন্য তারা রাজনৈতিক সক্রিয়তা বা সামাজিক বিতর্কিত বিষয় থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াকে এসব প্রতিষ্ঠানের আলেমরা গর্হিত কাজ মনে করেন। অন্যদিকে, এমন কওমি মাদ্রাসাও আছে, যারা রাজনৈতিক সক্রিয়তাবিমুখ নয়।

প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রতি কয়েক দশকে একটি বড় অংশেরই রাজনৈতিকায়ন ঘটেছে। এসব সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রভাব খাটানোর জন্য মাদ্রাসাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নব্বইয়ের দশকে কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত ইসলামী ঐক্যজোটের আবির্ভাব ঘটে এবং প্রভাব বিস্তার করে। তারা ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক জোটের অংশ ছিল। তারা ইসলামি সংবিধান ও ইসলামি আইন চালু করার দাবি তুলেছিল এবং বাংলাদেশে একটি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার প্রতিজ্ঞা করেছিল। তবে তাদের ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা জামায়াতে ইসলামীর মতো ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর চেয়ে আলাদা। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা শুধু মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ নয়, দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের শাখা রয়েছে। যদিও আলিয়া মাদ্রাসাগুলোয় অন্য যেকোনো ছাত্রসংগঠনের চেয়ে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের বেশি প্রভাব রয়েছে, তবুও তারা সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুধু এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভর করে না। যদিও ছাত্রশিবিরের লক্ষ্য একটি ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, তা সত্ত্বেও ইসলামি শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে তাদের কার্যক্রমকে বৈধতা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, তারা নিজেদের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যসংবলিত একটি ছাত্রসংগঠন হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে।

কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমরা মনে করেন, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক লক্ষ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সক্রিয়তার কোনো বিবাদ নেই। তাঁরা বলেন যে জ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষার আরও তিনটি দিক রয়েছে—চরিত্র গঠন, বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়া এবং অনুসারীদের সংহত করা। প্রথমটি 'আদব'-এর ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আদবের ধারণা, অন্যান্য আরবি ধারণার মতোই, কোনো নির্দিষ্ট একক বিষয় নয়, তার রয়েছে বিভিন্ন মাত্রা। কিন্তু সাধারণভাবে আদব বলতে 'আচরণের নিয়মাবলি, মূল্যবোধ এবং নিজেকে নির্মাণও বোঝায়' (মেটকাফ, ২০০৮, পৃ. ৩)। মেটকাফ বলেন :

> এটা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অমার্জিত (বা অশোভন) বা ইসলামপূর্ব রীতিনীতি থেকে পরিশীলিত চরিত্রকে আলাদা করে। সে জন্যই সুবিবেচনা ও প্রচেষ্টার ফসল হলো নৈতিক চরিত্র। আদব অর্থ হলো শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ। এর মানে হলো প্রশিক্ষণের ফলে শিষ্টাচার ও পরিশোধন (মেটকাফ, ২০০৮, পৃ. ৩)।

শিক্ষার দ্বিতীয় দিকটি দাওয়া'র ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দাওয়া কেবল ধর্মপ্রচার বা ধর্মান্তরিত করা নয়, তার চেয়েও বড় কাজ। যদিও সাধারণভাবে দাওয়া বলতে এই ধারণাই প্রচলিত। এর মধ্যে আছে মুসলমান সম্প্রদায়ের বাইরে ও ভেতরে উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামি নিয়মানুযায়ী ধর্মচর্চার বিষয়।

অনেক আলেম জোর দিয়েই বলেন যে সম্প্রদায়কে 'সঠিক' পথে কী করে ডাকবেন, সেটা জানা-বোঝা-চর্চা করা শিক্ষার্থী-বিদ্বানদের জন্য শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অংশ। তৃতীয় উপাদানটি হলো অ্যাক্টিভিজম বা সক্রিয়তা। সংহতির জন্য দরকার সংগঠন, নেতৃত্ব এবং সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া। ঔপনিবেশিক ভারতে উনিশ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত মাদ্রাসাভিত্তিক এ ধরনের সংগঠনের উপস্থিতি এবং কার্যক্রমের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।

সব কওমি মাদ্রাসা ও তার আলেমরা রাজনৈতিক সক্রিয়তার পক্ষে নয়, যদিও অনেক বিষয়ে তাদের মোটা দাগে মতৈক্য রয়েছে। মতৈক্যের বিষয়ের মধ্যে যেমন রয়েছে ইসলামি শিক্ষার বিশুদ্ধতা বজায় রাখা এবং কোনো পরিবর্তন ছাড়া মূল টেক্সট ও পুরোনো ব্যাখ্যার প্রতি অনুগত থাকা। দেওবন্দ ছাড়াও আহলে হাদিস[২৩] নামে ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুগত ব্যক্তিরা সক্রিয়তাকে সমর্থন করেন এবং মাদ্রাসাকে ধর্মতাত্ত্বিক ও সামাজিক সক্রিয়তার ভিত্তি হিসেবে দেখেন। যদিও বিশ শতকের শুরুর দিকে আহলে হাদিস সুন্নি ইসলামের সবচেয়ে রক্ষণশীল উপধারা হিসেবে বিস্তার লাভ করে, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তারা তাদের স্বল্প উপস্থিতি বজায় রেখেছে। বিশ শতকের শেষ দশকে আহলে হাদিসের একটি গোষ্ঠী আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ (আহাব) এবং তাদের যুব সংগঠন, আহলে হাদিস যুব সংঘের (আহাযুস) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কিছু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা শুরু করে। তাদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের পক্ষে জনমত গঠনে শিক্ষার্থীদের নিযুক্ত করা। আহাযুস ও আহাবের প্রতিষ্ঠিত কওমি মাদ্রাসাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথাগত ইসলামি শিক্ষা ও ব্যক্তিগত ধর্মানুরাগের পরিবর্তে কর্মী সংগ্রহ করে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সমর্থন-ভিত্তি তৈরি করা। এসব মাদ্রাসার কার্যপ্রণালি এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার* আহাব পরিচালিত একটি মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীর উক্তি তুলে ধরে, যেখানে বলা হয় যে তাদের যে শিক্ষা প্রদান করা হয় সক্রিয়তা তার অপরিহার্য অংশ, 'সারা দেশের প্রায় ৭০০ আহাব মাদ্রাসার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আহাবের একটি সুবিধাজনক মূল সংগঠনের সঙ্গে কাজ করতে হবে, একাধিক উৎস থেকে জানা যায়। যেমন সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আহাবের শিশু শাখা সোনামণির সঙ্গে কাজ করে। আবার ওপরের শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যত দিন আহাবের সদস্যপদ না পায় তত দিন আহাবের যুব সংগঠন আহলে হাদিস যুব সংঘের সঙ্গে কাজ করে' (*ডেইলি স্টার*, ২০০৫, পৃ. ১)। পত্রিকাটি মাদ্রাসার একজন শিক্ষকের উক্তি তুলে ধরেছে, যেখানে বলা হয়েছিল, 'আহাব তার মসজিদের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগের নিজস্ব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। যে কেউ আমাদের মসজিদে ইমাম হতে পারবে না। আমাদের

ইমামরা জানে কীভাবে ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে হয় এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে হয়।'

রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্র হিসেবে কিছু কওমি মাদ্রাসার ভূমিকা গত দশকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, বিশেষত ২০০৫ সালের পর। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি), জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) এবং জাগ্রত মুসলিম জনতার (জেএমজেবি) মতো গোপন উগ্র সংগঠনের সঙ্গে কিছু কওমি মাদ্রাসা জড়িত বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৪]

শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

ইসলামি শিক্ষার একটি অন্যতম উপাদান হলো শিক্ষাদান পদ্ধতি বা পেডাগজি। বাংলাদেশে আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার মধ্যে পার্থক্যের এটি একটি উৎস। বিভিন্ন সেক্যুলার বিষয় চালু করার মধ্য দিয়ে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো জ্ঞান প্রদানের প্রধান মাধ্যম হিসেবে দীর্ঘদিনের মুখস্থবিদ্যার ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে ইসলামি জ্ঞান বিতরণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে মৌখিক ধারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। রাসুল (সা.) তাঁর অনুসারীদের মৌখিকভাবে কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন এবং অন্যদের মুখস্থ করার মাধ্যমে তা সংরক্ষিত হয়েছে। ফ্রান্সিস রবিনসন বলেন :

> কোরআন মৌখিকভাবেই প্রেরিত হয়েছে। এভাবেই রাসুল (সা.) সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত বার্তা তাঁর অনুসারীদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর কোরআনের বার্তাগুলো লিখিত হয়েছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল স্মৃতিশক্তি ও মৌখিক প্রেরণকে সহায়তা করা। লিখিত কোরআনের কাজ সব সময় এটাই ছিল (রবিনসন, ১৯৯৩, পৃ. ২৩৪)।

মুখস্থ করার ধারাটি কোরআন থেকে অন্যান্য টেক্সটে (যেমন তাফসির) প্রতিলিপি করার বাইরেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। আগেকার শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান লাভের পর শিক্ষার্থী ওই জ্ঞান পুনরুৎপাদনের জন্য প্রস্তুত কি না, তাঁর দীক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে সেটা নিশ্চিত করতে শিক্ষকের ইজাজা বা অনুমতি লাগত (আফসারউদ্দিন, ২০০৫)। এর ফলে একদিকে যেমন বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা হতো, অন্যদিকে জ্ঞানচর্চার একটি স্বীকৃত পরম্পরা নিশ্চিত করা হতো। পরম্পরা পদ্ধতির মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট করা হতো যে শুধু যথাযথ কর্তৃত্বসংবলিতরাই জ্ঞান পুনরুৎপাদন করছে। যার ফলে প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটছে না। এর মাধ্যমে শুধু সামাজিকভাবেই নয়, জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আলেমদের উচ্চাসনে আসীন করা হয় এবং এর ফলে আলেমদের জ্ঞান উৎপাদক হিসেবে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে মৌখিক ধারা এতই বদ্ধমূল ও গুরুত্বপূর্ণ যে ওলামারা ছাপা প্রযুক্তি চালু হওয়াকে

বাধা দিয়েছিলেন (কার্টার, ১৯৪৩; রবিনসন, ১৯৯৩; জামান, ১৯৯৯)। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং সামাজিক শক্তির ওপর আলেমদের যে একাধিপত্য রয়েছে, ছাপা প্রযুক্তিকে তাঁরা সেসবের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছিলেন।

তবে আলিয়া ধারায় খুব অল্পসংখ্যক বিষয়ই আছে, যেগুলোয় প্রধান শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে মুখস্থবিদ্যা ব্যবহার করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রণীত একই ধরনের লিখিত পরীক্ষা শেষ করেই শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি গ্রহণ করতে হয়। অন্যদিকে কওমি মাদ্রাসা শুধু যে মুখস্থবিদ্যানির্ভর তা নয়, উল্টো এমন সব ভাষায় টেক্সট পড়ানো হয়, যেগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য, যেমন উর্দু ও ফারসি। শিক্ষার্থীদের এসব ভাষায় টেক্সটও মুখস্থ করতে হয়। এই মুখস্থবিদ্যার কার্যকারিতা নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেন, কোরআনের মুখস্থবিদ্যা চর্চা একটি ঐশ্বরিক বিষয়, যেমন সৃষ্টিকর্তার বাণী মূর্ত করার প্রক্রিয়া। এর ফলে, সাধারণত যা বলা হয়, তার চেয়ে এটা অনেক বেশি শিক্ষার্থীমুখী এবং অর্থপূর্ণ প্রক্রিয়া (বয়েল, ২০০৬; একই ধরনের যুক্তির জন্য দেখুন বারকি, ২০০৭; এইকেলম্যান, ২০০৭)। যদিও কিছু জ্ঞান প্রদানের পদ্ধতি হিসেবে মুখস্থবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এটা বিচার করে দেখা দরকার যে মুখস্থবিদ্যার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা তাকলিদ বা অন্ধ আনুগত্যকে উৎসাহিত করে কি না। অন্ধ আনুগত্য ইসলামি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইজতিহাদ বা স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণের জন্য ক্ষতিকর। শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে টেক্সটের ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে অনেক বেশি উপদেশমূলক টেক্সট আছে। স্বভাবতই এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার অভাব রয়েছে। উপদেশমূলক শিক্ষার একটি অন্যতম চরিত্র হলো, 'শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া' (পামবার্টন, ২০০২)। এর ফলে লেখকের সঙ্গে সমালোচনামূলক বিনিময়ে যুক্ত হওয়ার তেমন কোনো সুযোগ নেই এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ এসব টেক্সট দেয় না।

মিশেল ফুকো যেমনটি বলেছিলেন, কীভাবে জ্ঞান ক্ষমতা প্রদর্শন করে, তা বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতির এই দুটি উপাদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কওমি মাদ্রাসার আলেমরা শুধু জ্ঞানের একচেটিয়াত্বই দাবি করে না, বরং এমন শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করে যেটা সেই একচেটিয়াত্ব নিয়মমাফিক পুনরুৎপাদন করে এবং এটাকে স্বাভাবিক করে তোলে। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তারা এই ক্ষমতা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চায় না (যেমন রাষ্ট্র)। আলেমরা পাঠ্যক্রমে এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ ধরনের কাজকে ইসলামি শিক্ষা ধ্বংসের চেষ্টা হিসেবে দেখে থাকে। তাই মাদ্রাসার টেক্সট ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো

আলোচনাকে শিক্ষার্থী ও আলেমরা তাদের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে এবং তা প্রতিহত করতে চায়। কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক আলেমদের সক্রিয়তার কারণ এই কাঠামোর মধ্যে নিহিত।

একুশ শতকের ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভাব

বাংলাদেশের মাদ্রাসাশিক্ষা খাতে বিদ্যমান যেসব ভিন্নতা রয়েছে, তার প্রধান প্রভাবগুলো কী? এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে 'শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তির, তথা গোষ্ঠীর বিশ্ববীক্ষা গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা' (উইনথ্রপ ও গ্রাফ, ২০১০, পৃ. ৩১)। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববীক্ষা প্রদান করে এবং সমাজে তাদের ভূমিকা কী সেই উপলব্ধিতে সাহায্য করে। ভিন্নতা ইতিবাচক হতে পারে, যদি তা সামগ্রিক হয় এবং অন্যের বিশ্ববীক্ষাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আবার এটা বদ্ধমূল মতবাদ পরিচালিত সংকীর্ণতার ফলাফলও হতে পারে। ধর্মতাত্ত্বিক ও সামাজিক বিষয়ে এসব মাদ্রাসার মতাদর্শিক অবস্থানেই এর প্রতিফলন দেখা যায়।

অনমনীয়তা সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয় 'সত্যিকারের' ইসলাম বা 'প্রকৃত' মুসলিম বিষয়ে মত ও ব্যাখ্যায়। এই প্রবন্ধে আমি জোর দিয়েছি যে আলেমদের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা খাতের যে ভিন্নতা উপস্থিত এবং বিভিন্ন মাসলাকের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান, তা আসলে সঠিক পথ অনুসরণ করা হবে কি হবে না সে বিষয় নিয়ে। এর শিকড় পাওয়া যায় সপ্তম শতকে শিয়া-সুন্নি মতবাদগত পার্থক্যে, যা অষ্টম শতকে মুতাজিলি ও আশারীয়দের মধ্যে পার্থক্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং দশম শতকে এসে চারটি মাজহাবের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু 'সঠিক পথ' নিয়ে তীব্রতম বিতর্ক দেখা দেয় আঠারো ও উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে, বিভিন্ন সংস্কারবাদী ও পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন, যেমন দেওবন্দ, বারেলভি, আহলে হাদিস, তাবলিগ ইত্যাদির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। এসব আন্দোলনের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, কীভাবে আলেমরা বিভিন্ন বিষয়, যেমন ফিতনা বা বিবাদ, তাকলিদ বা অন্ধ আনুগত্য এবং বিদা বা অধার্মিক আবিষ্কার নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং প্রত্যেকেই নিজেদের মতবাদকে সঠিক পথের একমাত্র পাথেয় বলে দাবি করতে থাকেন।

বিশ শতকের শুরুর দিকে দেওবন্দ ও বারেলভিদের মধ্যে ফতোয়াযুদ্ধের সুর ও মর্ম দেখলে বোঝা যায় কীভাবে আলেমরা নিজেদের বিবেচনা করতেন এবং সম্প্রদায়গত পার্থক্যকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছিলেন। ১৯০৬ সালে বারেলভি মতবাদের প্রবর্তক আহমেদ রিজা বারেলভি একটি ফতোয়া দেন। সেখানে রশিদ আহমেদ গাঙ্গোহি, মুহাম্মদ কাসিম নানুতুভি এবং আশরাফ আলি থানভির মতো দেওবন্দ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাসহ এই ধারার অন্য ব্যক্তিদের কাফেরদের নেতা বলে

অভিযুক্ত করেন। তাদের আরবীয় শুদ্ধবাদী আন্দোলনের নেতা মুহাম্মদ ইবনে আবদাল ওয়াহাবের অনুসারী বা ওয়াহাবি বলেও আখ্যায়িত করেন। দেওবন্দীরাও আহমেদ রিজার ফতোয়ার পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে প্রমাণ করতে চান যে তাঁরাই একমাত্র হানাফি সুন্নি।

এসব বিবদমান আন্দোলন ও মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমদের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের প্রয়াসের মধ্যে একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য পাওয়া যায়: আদর্শ ইসলামের স্থিতিমাপ বা প্যারামিটার নির্ধারণ করা। তাঁরা পুরোপুরি হয়তো সফল হননি, কিন্তু বারবারা মেটকাফের মতে, তাঁরা বিশ্বাসের ধর্মীয় উৎসের ওপর মনোযোগে জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে সফলতা দাবি করতে পারেন (মেটকাফ, ১৯৮২, পৃ. ৬৪)। এটাই হলো 'অর্থকে নিয়ন্ত্রণ' করা, যা আমি প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করেছি। এই উদাহরণের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করা—কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা সেটা নির্ধারণ করা। সব ধরনের আলেম একমত যে শুধু তাঁদেরই অর্থকে নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব আছে। মাদ্রাসাগুলো বিরামহীন বিতর্কের বাহন ও 'সঠিক পথের' জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার স্থানে পরিণত হয়েছে। সে জন্য এসব মাদ্রাসার মূল উদ্দেশ্য হয়ে গেছে আসল মুসলমানত্ব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকা নির্ধারণ করা। প্রকাশ্য বক্তৃতা ও বিতর্কের মাধ্যমে আলেমরা শুধু আসল ইসলাম বা মুসলিমের অর্থই নির্ধারণ করেন না, বরং তাঁরা আদর্শ টেক্সটের সারবত্তা নির্ধারণ, নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতার গ্রহণযোগ্যতার মীমাংসা এবং আদাবের মূল উপাদানগুলো দৃষ্টিগোচর করে থাকেন। এগুলো মাদ্রাসায় দৈনন্দিন নিয়মমাফিক অনুশীলনের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন করে এবং দাওয়া কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে যাবে বলে আশা করেন। প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং টেক্সট বা অনুশীলন উভয়ই অতীতের মতো এখনো 'সত্যিকারের মুসলিম' যেমন নির্ধারণ করে, তেমনি 'অন্যদের' বা কারা 'সত্যিকারের মুসলিম' নয়, সেটাও নির্ধারণ করে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পাঠ্যক্রমে সরকারের তত্ত্বাবধান থাকা সত্ত্বেও, যেটা আগেই বলেছি যে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো মূলধারার ইসলামি রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। জামায়াতে ইসলামী সর্ববাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী, যা 'সত্যিকারের মুসলিম' এবং 'অন্যদের' পরিচয় নির্ধারণ করে দিতে চায়। আবু আলা মওদুদির মতো ইসলামি আন্দোলনের ভাবাদর্শীরা শুধু যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তা-ই নয়, বরং এমন এক আখ্যান তৈরি করেছেন, যা ইসলাম এবং অন্যদের মধ্যে সার্বক্ষণিক বিবাদ আছে বলে মনে করেন। জামায়াতের এই সংজ্ঞা আহমদিয়াদের মুসলমান হিসেবে ধরে না। তারা সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় কাজ হিসেবে মনে করে। একইভাবে,

কওমি মাদ্রাসার মধ্যে, বিশেষ করে যারা কোনো পরিমার্জন ছাড়া দেওবন্দ ধারা অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে আহমদিয়া ও অন্যান্য মাসলাক, যেমন বারেলভিদের নিন্দা করার দীর্ঘদিনের অভ্যাস রয়েছে।[২৫] আহলে হাদিস মাদ্রাসাগুলো ধর্মীয় গ্রন্থের আরও সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দেয় এবং অনেকের মতে মগজধোলাইয়ের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একুশ শতকে এসে বাংলাদেশে আহলে হাদিস মাদ্রাসাগুলো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। আহমদিয়া সম্প্রদায়কে নিন্দা করার প্রকরণ সাম্প্রতিক দশকগুলোয় প্রাধান্য পেয়েছে, যা তাদের মসজিদগুলোয় সরাসরি হামলায় পর্যবসিত হয়েছে (এইচআরডব্লিউ, ২০০৫)। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুফি ধারা, স্থানীয় পীরদের ভক্তি করা, স্থানীয় মানবতাবাদী ধারা বা বিখ্যাত বাউলদের নিয়ে উৎসবের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক একুশ শতকে এসে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে এবং এসব বিতর্ক অনেক সময়ে সহিংসতায় রূপ নিয়েছে।[২৬] কবির যথাযথভাবেই বলেছেন, 'মাদ্রাসা ও ওলামা মহলে মুসলিম পরিচয় সব সময়ই বিবাদযোগ্য। এক গোত্র থেকে আরেক গোত্র (যেমন সুন্নি/আহমদি) এবং এক মতবাদী গোষ্ঠী থেকে আরেক গোষ্ঠীকে (যেমন দেওবন্দ/বারলভি) আলাদা করা এবং "অপর" করার মাধ্যমে এই বিবাদ চলতে থাকে' (কবির, ২০০৯, পৃ. ৪২৩)।

বাংলাদেশে আলিয়া মাদ্রাসাকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সহযোজিত করার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে গঠন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক পর্যবেক্ষক এটাকে রাষ্ট্রীয় সংস্কার কর্মসূচির সাফল্য হিসেবে দেখে। এর ফলে বাচ্চাদের ধর্মীয় ও সেক্যুলার উভয় ধরনের শিক্ষা দিতে আগ্রহী অভিভাবকদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর ফলে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে সব আলেমই মাদ্রাসাশিক্ষায় পরিবর্তনের বিরোধী নয়। কিন্তু এর জন্য এসব আলেমকে কিছু মূল্য দিতে হয়েছে, যেমন ধর্মীয় বিদ্বান হিসেবে তাঁদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে। দেশের ধর্মীয় নেতৃত্বের দিকে নিবিড়ভাবে তাকালে বোঝা যায় যে কওমি মাদ্রাসার আলেমরাই সামনের সারিতে। ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কারিদেরই সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, ইসলামের প্রামাণিক বা কর্তৃত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে দেখে এবং ইসলামি নীতি ও পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে তাঁদের কাছে পরামর্শ চায়। যদিও তাঁরা এসব পরমর্শ দেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন, তবুও এর ফলে তাঁরা সমাজে কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করেন। অনেকেই এই প্রভাবের অপব্যবহার করে থাকেন। নব্বইয়ের দশক থেকে গ্রামীণ বাংলাদেশে স্থানীয় মোল্লাদের ফতোয়া জারির ঘটনা দেখলে এই ব্যাপারটি বোঝা যায়।[২৭] এ ছাড়া, রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে দাবি দাওয়া আদায়ে সোচ্চার হতে যেসব আলেমকে সময়ে সময়ে দেখা গেছে, তাঁরা কওমি

মাদ্রাসাভিত্তিক দল বা বিখ্যাত মসজিদের ইমামদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।[২৮] এসব ঘটনার ফলে মাসুদা বানো বলেছেন, 'বাংলাদেশ যা অর্জন করেছে তা হলো একটি বিকল্প মাদ্রাসার ধারা; কিন্তু প্রথাগত মাদ্রাসা সংস্কারে সফল হয়নি' (বানো, ২০০৮, পৃ. ৩২)। আলিয়া মাদ্রাসা সংস্কারের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, একটি ধারার মাদ্রাসার আদর্শায়ন ও মূলধারায় সহযোজিতকরণ হলেই রাষ্ট্র ইসলামের অর্থ সংজ্ঞায়িত করা ও ইসলামি অনুশীলনের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালনকারী হয়ে যায় না। স্পষ্টতই, ধর্মীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রটি আরও বেশি গোঁড়া ওলামাদের কাছে রাষ্ট্র ছেড়ে দিয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে, এই প্রবন্ধের তিনটি কেন্দ্রীয় যুক্তিকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করব। প্রথমত, গণমাধ্যম ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যেটা ভাবা হয় যে মাদ্রাসা খাত একটি মনোলিথিক বা একক সত্তা, সেটা সত্যি নয়। বরং মাদ্রাসা খাত বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইসলামি বিষয়ে বহুপক্ষীয় বক্তব্যে যেমন এই বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়, তেমনি এসব প্রতিষ্ঠান সমাজের যেসব নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে বিরাজমান, সেসব পরিস্থিতিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি যে সাধারণ পর্যায়ে দুই ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে: আলিয়া (রাষ্ট্রপোষিত) এবং কওমি (বেসরকারিভাবে পরিচালিত)। এই দুই ধরনের মাদ্রাসা বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। এর মধ্যে রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং সমাজে আলেমদের ভূমিকা ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয় রয়েছে। যদিও ইসলামি ধারার সংরক্ষণ, প্রবাহ ও পুনরুৎপাদন বিষয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের অভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে, তবু ইসলামি জ্ঞান কোনটি এবং কীভাবে তা ছড়ানো যায়, সে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ মতভেদ আছে। কওমি মাদ্রাসার মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ থাকায় এই ধারার মধ্যে পার্থক্যগুলো বেশি লক্ষণীয়। পৃথক্করণ ও 'অপরকরণ' তাদের মূল বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণে বেশ কিছু অ্যাক্টর বা ব্যক্তি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র, বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক মতের আলেমরা এবং বিভিন্ন ধরনের ইসলামপন্থীরা। তাদের সম্পর্কগুলো জটিল, বহুস্তরবিশিষ্ট এবং বেশ কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক বিবেচনাসাপেক্ষ। কিন্তু সব গোষ্ঠীই জ্ঞান, ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং পরিচয়ের সীমা সংজ্ঞায়ন ও সীমা নির্ধারণ বিষয়ে বিবাদে জড়ায়। এটা বস্তুত ক্ষমতার লড়াই। ফুকোর যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করে আমি বলেছি যে সংজ্ঞার দিক থেকে প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রচেষ্টাই ইসলামের সঠিক জ্ঞান বিষয়ে নিজেদের দাবির

ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ক্ষমতার কার্যপ্রণালি পরিচালিত হয় (কোনটি সঠিক ইসলাম আর কোনটি নয়)। এটা করা হয় সীমানা নির্ধারণ (আদর্শ ইসলামে কোনটা করা যায় আর কোনটা যায় না) এবং জ্ঞান পুনরুৎপাদনের পদ্ধতি (ইজতিহাদ ও তাকলিদ, মুখস্থবিদ্যা বিষয়ে বিতর্ক) সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে। তবে রাষ্ট্রের জন্য মৌলিক বিষয় হলো কোনটা জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপযোগিতা কী সেটা। জ্ঞান, এর অর্থ, এর উপযোগিতা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে রাষ্ট্র শিক্ষা বিষয়ে তার অবস্থানের ওপর বৈধতা আরোপ করতে চায়। গত দুই শতাব্দীর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলে রাষ্ট্রের যেমন আধিপত্য তৈরি হয়েছে, তেমনি আলেমদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই ক্রমবিকাশগুলো সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে। এত দিন আলেমরা ও মাদ্রাসাগুলো আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, কিন্তু এখন সেই আধিপত্যকে মোকাবিলা করার এবং তাদের ক্ষমতাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা সুযোগ পেয়েছে, যা সামনের দিনগুলোতে আরও বেশি প্রাধান্য পাবে।

তৃতীয়ত, যেকোনো বিবাদেই সমঝোতা ও সহযোজনের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র এ ধরনের সমঝোতা করতে পারে এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোজিত করতে পারে। এর ফলে, নির্ধারিত সীমায় সেক্যুলার ও ধর্মীয় উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের সমঝোতার কৌশলের মানে এই নয় যে ইসলামি জ্ঞানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কারণ সব আলেমই কর্তৃত্বের প্রশ্নে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে আগ্রহী নন। বরং বাংলাদেশের মতো জায়গায়, ইসলামি কর্তৃত্ব আরও বেশি বিভাজিত হয়ে যেতে পারে। যার ফলে, আলেমদের মধ্যে চলমান বিবাদে রাষ্ট্র একটি অংশগ্রহণকারীতে পরিণত হয়েছে। এই ক্রমবিকাশের প্রভাব কী হবে সেটা বলা মুশকিল, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে।

[লেখাটি ২০১৪ সালে সাঈদা বুয়াং ও ফিলিস ঘিম-লিয়ান চিউ সম্পাদিত *মুসলিম এডুকেশন ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি : এশিয়ান পারসপেকটিভ* গ্রন্থে 'মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বাংলাদেশ : কনটেস্টেশনস অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বইটি টেইলর ও ফ্রান্সিস, লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত।]

টীকা

১. ইলম শব্দটিকে সাধারণত জ্ঞান হিসেবে অনুবাদ করা হয়। ল্যাপিডাস উল্লেখ করেছেন যে এটার নানা রকম অর্থ রয়েছে : ইলমকে 'জ্ঞান' হিসেবে অনুবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু অনেক আরবি শব্দের মতো এটার কোনো একক সংজ্ঞা নেই, এটা একটা চিহ্ন, যা অনেকগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত অর্থকে নির্দেশ করে। ইলম সাধারণত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ

পাঠ্যবিষয়, জ্ঞানের একটি কাঠামো বা একটি বিজ্ঞানকে, যেকোনো সংস্কৃতিমান শিক্ষার একটি উপাদানকে নির্দেশ করে। তবে বিশেষত এটা নির্দেশ করে ধর্মীয় জ্ঞানকে, যা কোরআন, হাদিস ও শরিয়ায় উল্লেখ করা আছে (ল্যাপিডাস, ১৯৮৪, পৃ.৩৯)।

২. কোরআনে ৭৫০ বার ইলম শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। যে দুটি শব্দ এর চেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো 'আল্লাহ' ২৮০০ বার এবং 'রব' ৯৫০ বার। এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন রোজেনথ্যাল (১৯৭০, পৃ. ২০-২১) এবং বয়েল (২০০৬, পৃ. ৪৭৮-৪৯৫)। ইলমের (জ্ঞান) ওপর আরোপিত গুরুত্ব আরও অধিক প্রতিভাত হয়, যদি আমরা দেখি যে কোরআনে ফরজ নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় ২০০ বার।

৩. এটা একইভাবে আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও সত্য, যেখানে সরকারি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে চার্চগুলো সরকারি বিদ্যালয়গুলোর জনপ্রিয়তাকে বিনা বাধায় মেনে নিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষণ-মূল্যায়নকেন্দ্রিক চলমান দ্বন্দ্ব এই বিতর্কেরই প্রতিধ্বনি করে। যদিও অনেকে মনে করেন যে সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬০-এর দশকে বিধিবদ্ধ সর্বজনীন প্রার্থনা এবং বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ করে যে রায় দিয়েছিলেন, তা এই বিষয়টির একটি ইতি টেনেছে।

৪. এই প্রবন্ধে আমি সেক্যুলার শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলো আলোচনা করিনি। সেক্যুলার শিক্ষা, ইসলামি শিক্ষা এবং ইসলামি শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যকার সম্পর্কের ওপর আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি।

৫. মুসলিম সমাজগুলোতে জনপরিসর এবং আলেমদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন হোয়েস্টার, আইসেনস্টেড এবং লেভটজিওন (২০০২)।

৬. এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে [আলেমরা] বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদবি ধারণ করেছেন: ফারসিভাষী ইরান, মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারতে মোল্লা, আরবিভাষী মধ্য ইসলামি অঞ্চলে শায়খ, ইন্দোনেশীয় দ্বীপাঞ্চলে কিয়ায়ি এবং পশ্চিম আফ্রিকাঞ্চলে মাল্লাম বা কারামোকা (রবিনসন, ১৯৯৬, পৃ. ২৯১)।

৭. অন্য প্রভাবশালী পরিবর্তনটি ছিল ছাপানোর প্রযুক্তি গ্রহণ, যা আমি এই প্রবন্ধের পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব।

৮. আলেমদের কর্তৃত্বে পরিবর্তনের মাত্রা বর্তমান সময়ে একটি তীব্র বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক মূল্যায়নগুলো: যেমন আলেমদের ইসলামি জ্ঞান 'অপ্রাসঙ্গিক' হয়ে পড়েছে (নাফি এবং তাজি ফারুকি, ২০০৪, পৃ. ৬) বা তাঁদের কর্তৃত্ব 'অপূরণীয়ভাবে খর্ব করা হয়েছে' (সারাবি, ১৯৯৬, পৃ. ২৬-৩৬; ক্রিসিলিয়াস, ১৯৭২, পৃ. ১৬৭-২০৯) এখন অত্যুক্তি হিসেবে দেখা হয়। তবে সমালোচকেরা এ বিষয়ে একমত যে আলেমদের কর্তৃত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

৯. এ রকম সংস্কারের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। পাকিস্তানে নেওয়া এ রকম বিভিন্ন সংস্কারের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন মালিক (১৯৯৬)। আমি তিন দশক ধরে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নেওয়া পদক্ষেপগুলো আলোচনা করেছি (রীয়াজ, ২০০৮ক, পৃ. ১৯০-২২১)। অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের আলোচনার জন্য দেখুন ট্যান (২০১০)।

১০. যুক্তরাষ্ট্রের চার্টার/সম্প্রদায়গত বিদ্যালয়, ব্রিটেনের ফেইথ/ধর্মীয় বিদ্যালয় এবং ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় বিদ্যালয়—এ রকম কিছু উদাহরণ। বাংলাদেশে মাদ্রাসা নিয়ে

একই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচিত হবে। বিভিন্ন দেশের বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ওউনবার্গ (২০০৭); ব্রিটেন বিষয়ে, ফ্লিন্ট (২০০৯) এবং ইসরায়েল বিষয়ে, তাউব ও ক্লেইন (২০০০)।

১১. ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার বিভিন্ন ধারাবিষয়ক আলোচনার জন্য দেখুন, ডাফটারি (২০০১)।

১২. উনিশ শতকের বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনের সবচেয়ে প্রামাণিক তুলনামূলক গবেষণা করেছেন রিজৎস (২০০৬)। আরও দেখুন মেটকাফ (২০০৪), রবিনসন (২০০১), স্যানাল (১৯৯৬), সিকান্দ (২০০২) ও ফ্রিডম্যান (২০০০)।

১৩. ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সহায়তায় কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাদ্রাসা তখন উপযোগবাদী পাঠ্যক্রম গ্রহণ করেছিল। একই রকম প্রতিষ্ঠান তখন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল, বিশেষ করে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে।

১৪. ১৮৬৭ সালে আলেমরা দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন দেওবন্দে (বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশে)। ইসলামি শিক্ষার ধারা সংরক্ষণ করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। খুব শিগগির মাদ্রাসা একটি আদর্শে পরিণত হয়। এর ফলে অন্যান্য স্থানেও অনুকরণীয় মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামি পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক সক্রিয়তার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে।

১৫. দুই ধরনের প্রাক্-প্রাথমিক মাদ্রাসা রয়েছে : চার বছরব্যাপী মৌলিক ইসলামি শিক্ষা দেওয়া ও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করানোর উদ্দেশ্য রয়েছে ফুরকানিয়া/হাফিজিয়া মাদ্রাসা এবং সাক্ষরতা ও ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে রয়েছে নুরানি মাদ্রাসা/মক্তব।

১৬. বাংলাদেশের মাদ্রাসার ওপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন রীয়াজ (২০০৮এ, পৃ. ১১৬-১৬১)।

১৭. কমিশনের পাঠানো প্রশ্নমালার উত্তরে সমাজের এলিট শ্রেণির সদস্যদের সিংহভাগই (৭৪.৬৯%) মত দেন যে 'ধর্মীয় শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত' (কবির, ২০০৪, পৃ. ১)। এলিট শ্রেণির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিগ্রি কলেজের উপাচার্য ও অধ্যাপক, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, উচ্চমাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় ও কলেজ সমিতির সদস্যরা, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও সাংসদ।

১৮. বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২১১/এস-১৩, তারিখ, ২০ জানুয়ারি ১৯৭৫। এই প্রজ্ঞাপনে ইবতেদায়ি ও দাখিল পরীক্ষা ১৯৭৬ সালে হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৯. বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৮৪৫৫/এস-১৩, তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫; প্রজ্ঞাপন নম্বর ৯৪৮৫/এস-১৩, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যক্রম অনুমোদন করে; শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং পরমাণু শক্তি, মেমো নম্বর ১০২৩/৮, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৫।

২০. বেশ কয়েকটি স্থানীয় পর্যায়ের পরীক্ষামূলক প্রকল্পের পর, ১৯৯৪ সালে জাতীয়ভাবে ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু হয়। এই কর্মসূচির আওতায়, গ্রামীণ অঞ্চলে যেসব মেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে, তারা সবাই সরকার কর্তৃক মাসিক উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য হবে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অনুযায়ী উপবৃত্তির পরিমাণ ভিন্ন হবে। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বই ও নির্ধারিত জাতীয় পরীক্ষার ফি প্রদানের জন্য অতিরিক্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে। চলমান

সহায়তা পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে: তাদের অবশ্যই কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি থাকতে হবে, বার্ষিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা (এসএসসি) না দেওয়া পর্যন্ত বা ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে (এই কর্মসূচির মূল্যায়নের জন্য দেখুন শারম্যান, ২০০৯, পৃ. ৫০৫-৫১৭)। ১৯৯০ সালে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রী শিক্ষা বেতনহীন করা হয়, যার আওতা পরবর্তী সময়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

২১. এ ছাড়া, কমপক্ষে চারটি আঞ্চলিক কওমি মাদ্রাসার বোর্ড রয়েছে, যারা হাজার হাজার মাদ্রাসার পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করে।

২২. এর মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার হলো প্রাথমিক ও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

২৩. উনিশ শতকের আন্দোলনের উৎপত্তি ও প্রধান ধারাগুলোর সংক্ষিপ্ত ধারণার জন্য দেখুন, মেটকাফ (২০০৪, পৃ. ২৬৮-২৯৬)।

২৪. ২০০৫ সালের ঘটনাগুলোর বিস্তারিত জানতে, এসব উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর পরিচয় এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপে কওমি মাদ্রাসার সম্পৃক্ততা জানতে দেখুন, রীয়াজ (২০০৮বি, পৃ. ৫১-৫৬, পৃ. ৮৩-৮৬), রীয়াজ (২০১১, পৃ. ১২৮-১৩১)।

২৫. কওমি মাদ্রাসাগুলো কর্তৃক অন্যান্য ধারাকে নিন্দা করার বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, কবির (২০০৯)।

২৬. এসব বিতর্ক এবং মানবতাবাদী ধর্মীয় অনুশীলনকারীদের ওপর শারীরিক আক্রমণের উদাহরণের মধ্যে রয়েছে ২০০০ দশকের শুরুর দিকে মাজার ও ওরসে বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৮ সালে লালন শাহর ভাস্কর্য ধ্বংসকরণ এবং ২০১১ সালে বাউলদের ওপর আক্রমণ।

২৭. ফতোয়া ও এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, রীয়াজ (২০০৫)।

২৮. এ ধরনের প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন নাম রয়েছে: যেমন সম্মিলিত উলামা মাশায়েখ পরিষদ, সম্মিলিত ইমাম আকিদা হেফাজত কমিটি, জাতীয় শীর্ষ উলামা মাশায়েখ পরিষদ।

গ্রন্থপঞ্জি

Afsaruddin, Asma (2005). Muslim views on education: Parameters, purview, and possibilities. *Journal of Catholic Legal Studies,* 44(1), 143-177.

Althusser, Louis (2001). *Lenin and Philosophy and Other Essays* (translated by Ben Brewester). New York: Monthly Review Press.

Anderson, Benedict (1991). *Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of nationalism.* London: Verso.

Apple, Michael W. (2004). Preface to the 25th Anniversary Third Edition. *Ideology and Curriculum.* New York/London: RoutledgeFalmer.

Bangladesh Qwami Madrassah Education Board (n.d.). *Introduction.* Dhaka: Bangladesh Qwami Madrassah Education Board.

Bano, Masooda (2008). Allowing the Diversity: State-madrasa relations in Bangladesh. *Religions and Development Working*

Paper 13, International Development Department, University of Birmingham.

Berkey, Jonathan P. (2006). Madrasas medieval and modern: Politics, education, and the problem of Muslim identity. In Robert W. Hefner and Muhammad Qasim Zaman (Eds), *Schooling Islam: Vie culture and politics of modern Muslim education* (pp. 40-60). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Boyle, Helen N. (2006). Memorization and learning in Islamic schools. *Comparative Education Review*, 50 (3), 478-495.

Carter, T.F. (1943). Islam as a barrier to printing. *The Muslim World*, 33 (3), 213-216.

Coury, Ralph M. (2004). Nationalism and culture in the Arab and Islamic worlds: A critique of modern scholarship. In Suha Taji-Farouki and Basheer M. Nafi (Eds), I*slamic Thought in the Twentieth Century* (pp. 128-171). London/New York: I. B. Tauris.

Crecelius, Daniel (1972). Nonideological responses to Egyptian 'ulama to modernization. In Nikki R. Keddie (Ed.), *Scholars, Saints, and Sufis: Muslim religious institutions in the Middle East since 1500*. Berkeley, CA: University of California Press.

Daftary, Farhad (Ed.) (2001). *Intellectual Traditions in Islam*. London/New York: I.B. Tauris.

Daily Star (2005). Ahab men on the run, JMJB flouts ban, 26 February 2005.

Diner, Dan (2009). *Lost in the Sacred: Why the Muslim world stood still*. Princeton, NJ: Princeton University Presss.

Eickelman, Dale F. (2007). Madrasas in Morocco: Their vanishing role. In Robert W. Hefner and Muhammad Qasim Zaman (Eds), *Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education* (pp. 131-148). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Flint, John (2009). Faith-based schools: Institutionalizing parallel lives. In Adam Dinham, Robert Furbey and Vivien Lowndes (Eds), *Faith in the Public Realm: Controversies, policies and practices*. London: Politcy Press.

Foucault, Michel (1979). *Discipline and Punish: The birth of the prison* (translated by Alan Sherridan). New York: Vintage.

Friedman, Yohanan (2000). *Shaykh Ahmad Sirhindi. An outline of his thought and a study of his image in the eyes of posterity*. Oxford University Press.

Government of Bangladesh (GOB) (1978). Ministry of Education, '*Bangladesh National Syllabi and Curriculum Committee Report*, Part II,' April 1978.

Hoester, Miriam, Eisenstadt, Shmuel N. and Levtzion, Nehemia (Eds). (2002). *The Public Sphere in Muslim Societies*. New York: SUNY Press.

Human Rights Watch (HRW) (2005). *Breach of Faith: Persecution of the Ahmadiyya Community in Bangladesh*, 16 June 2005, C1706. Retrieved from http://www.unhcr.org/refworld/docid/42c3bce80.html on June 2011.

Juergensmeyer, Mark (2008). *Global Rebellion: Religious challenges to the secular state, from Christian militias to al Qaeda*. Berkeley, CA: University of California Press.

Kabir, Humayun (2009). Replicating the Deobandi model of schooling: The case of a Quomi madrasa in a district town of Bangladesh. *Contemporary South Asia*, 17 (4): 415-428.

Kabir, Nurul (2004). De-secularising Bangladesh: Will the whimper of the minority sink into the thunder of the majority? *Holiday*, 11 November.

Lapidus, Ira M. (1984). Knowledge, virtue, and action: The classical Muslim conception of *Adab* and the nature of religious fulfillment in Islam. In Barbara Daly Metcalf (Ed.), *The Place of Adab in South Asian Islam* (pp. 38-61). Berkeley, CA: University of California Press.

Malik, Jamal (1996). *Colonization of Islam: Dissolution of traditional institutions in Pakistan*. Delhi: Manohar.

Metcalf, Barbara Daly (1982). Islam and custom in ninteenth-century India: The reformist standard of Maulan Thanwi's Bihisti Zawar. *Contribution to Asian Studies*, 17, 62-78.

Metcalf, Barbara Daly (1984). Introduction. In Barbara Daly Metcalf (Ed.), *The Place of Adab in South Asian Islam*. Berkeley, CA: University of California Press.

Metcalf, Barbara Daly (2004). *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900*. New Delhi: Oxford India.

Mottahedeh, Roy (1985). *The Mantle of the Prophet: Religion and politics in Iran*. Oxford: Oneworld.

Moyser, G. (1991). Politics and religion in the modern world: An overview. In G. Moyser (Ed.), *Politics and Religion in the Modern World* (pp. 1-27). London: Routledge.

Nafi, Basheer M. and Taji-Farouki, Suha (2004). Introduction. In Suha taji-Farouki and Basheer M. Nafi (Ed.), *Islamic Thought in the Twentieth Century*. London/New York: I.B. Tauris.

Pemberton, Kelly (2002). Islamic and Islamicizing discourses: Ritual performance, didactic texts, and the Reformist challenge in the South Asian Sufi Milieu. *The Annual Journal of Urdu Studies*, 17, 55-83, available at :

http://www.urdustudies.com/pdf/17/09_Pemberton.pdf.

Reetz, Dietrich (2006). *Islam in the Public Sphere: religious groups in India., 1900-1947*. Delhi/Oxford: Oxford University Press.

Reetz, Dietrich (2010). From Madrasa to university- The challenges and formats of Islamic education. In Akbar S. Ahmed and Tamara Sonn (Eds), *The SAGE Handbook of Islamic Studies*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Riaz, Ali (2005). Traditional institutions as tolls of political Islam in Bangladesh. *Journal of Asian and African Studies,* 40(3), 171-196.

Riaz, Ali (2008a). *Faithful Education: Madrassahs in South Aisa*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Riaz, Ali (2008b). *Islamist Militancy in Bangladesh: A complex web*. London/New York: Routledge.

Riaz, Ali (2011). Islamist politics and education. In Ali Riaz and C. Christine Fair (Eds), *Political Islam and Governance in Bangladesh.* London/New York: Routledge.

Robinson, Francis (1993). Technology and religious change: Islam and the impact of print. *Modern Asian Studies,* 27(1), 229-251.

Robinson, Francis (1996). Knowledge, its transmission and the making of Muslim societies. In Francis Robinson (Ed.), *The Cambridge Illustrated History of the Islamic World* (pp. 208-249). Cambridge: Cambridge University Press.

Robinson, Francis (2001). *Ulama of Farangi Mahall and Islamic Culture in South Asia.* London: C Hurst & Co.

Rosenthal, Franz (1970). *Knowledge Triumphant.* Leiden: E.J. Brill.

Sanyal, Usha (1996). *Devotional Islam and Politics in British India: Ahmad Riza Khan Barelwi and his movement, 1870-1920.* New York: Oxford University Press.

Schurmann, Anna T. (2009). Review of the Bangladesh Female Secondary School Stipend Project using a social exclusion framework. *Journal of Health Population and Nutrition,* 27(4), 505-517.

Sharabi, Hisham (1996). Islam and modernization in the Arab world. In Jack H . Thompson and Robert D. Reischauer (Eds), *Modernization of the Arab World.* Princeton, NJ: Van Nostrand.

Sikand, Yoginder (2002). *Origins and Development of the Tablighi-Jama'at (1920-2000): A cross-country comparative study.* New Delhi: Sangam Books.

Tan, Charlene (2010). Contesting Reform: Bernstein's pedagogic device and madrasah education in Singapore. *Journal of Curriculum Studies,* 42(2), 165-182.

Taub, David and Klein, Joe (2000). State religious education - religion vs. state. *Journal of Church and State,* 42(2) (Spring).

Weinberg, Laurence D. (2007). *Religious Charter Schools: Legalities and practicalities,* London: lAP.

Winthrop, Rebecca and Graff, Corinne (2010). Beyond Madrasas: Assessing the links between education and militancy in Pakistan. Center for Universal Education Working Paper 2, Brookings Institution, Washington DC, June.

World Bank (2010). *Secondary School Madrasas in Bangladesh: Incidence, quality and implications for reform.* Bangladesh Development Series 27, Dhaka: World Bank.

Zaman, Muhammad Qasim (1999). Commentaries, print and patronage: Hadith and the madrasas in modern South Asia. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 62, 60-81.

Zaman, Muhammad Qasim (2007). *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of change.* Princeton, NJ: Princeton University Press.



ব্যাংকিং নৈতিকতা

অমিয় কুমার বাগচি

[নুরুল মতিন ছিলেন বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের একজন অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদকে অলংকৃত করেছেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) তিনি অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা। প্রথিতযশা রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচি ২০১৪ সালে এই নুরুল মতিন স্মারক বক্তৃতাটি প্রদান করেন। সামগ্রিক মার্ক্সীয় ও বাম কেইনেসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনৈতিক ইতিহাসসহ ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ইতিহাস, শিল্পায়ন ও অ-শিল্পায়নের অর্থনীতি এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিষয়ে বাগচির রয়েছে বিশেষ অবদান। সাম্রাজ্যবাদ ও অনুন্নয়ন তত্ত্বের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে সমাদৃত। বিশ্বের অনেক স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অতিথি অধ্যাপক হিসেবে পড়ান। বেশ কিছু প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি ছাড়াও অনেক সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেছেন।— সম্পাদক]

শুরুতেই ১৪তম নুরুল মতিন মেমোরিয়াল লেকচার দেওয়ার সুযোগ দিয়ে আমাকে সম্মানিত করার জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান ও বিআইবিএমের ডিরেক্টর জেনারেল ড. তউফিক আহমেদ চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মাত্র ৫০ বছর বয়সে অকালপ্রয়াত নুরুল মতিনকে আমার যেভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে, সব বিচারেই তিনি ছিলেন একজন অসাধারণভাবে নিষ্ঠাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। নবগঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নৈতিক ব্যাংকিং কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিধিমালা ও প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে তিনি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এটাই সংগত হয়েছে যে তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠিত বক্তৃতা দিয়েছেন বাংলাদেশের একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান বিচারপতিরা, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক উচ্চপদস্থ উপদেষ্টা কিংবা

---

* অনুবাদ : **রাশেদ রাহম**

বাংলাদেশ ও ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের কেউ—যাঁদের একজনকে পড়ানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিংবা পেশাদার অর্থনীতিবিদেরা, যাঁদের মধ্যে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, রেহমান সোবহান, সনৎকুমার সাহা এবং ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদকে বন্ধু হিসেবে জানার সৌভাগ্য হয়েছে। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আমার কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। আমি খুবই আনন্দিত যে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এই অনুষ্ঠানকে আলোকিত করতে সম্মত হয়েছেন।

কৃষি অর্থনীতিতে নৈতিক ব্যাংকিং

ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিনিময় প্রথার মতোই প্রাচীন। দক্ষিণ এশিয়ার জাতক কাহিনিগুলোতে প্রায়ই শ্রেষ্ঠীদের প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। তাঁদের অনেকেই ছিলেন প্রচুর সম্পদশালী। কিন্তু তাঁদের কাছে যেটাকে ন্যায্য উপলক্ষ মনে হতো, সে জন্য তাঁরা তাঁদের সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন। যেমন শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডক গৌতম বুদ্ধের বসবাসের জন্য পুরো বাগান স্বর্ণে পরিপূর্ণ ধরে নিয়ে সেই মূল্যে বাগান (জেতাবন) কিনেছিলেন।

আমাদের কালের আরও নিকটবর্তী, যেমন মোগল ভারতে, এবং বাহাদুর শাহ ও ১৭৯৯ সালে ব্রিটিশরা তাদের সবচেয়ে জাঁদরেল শত্রু টিপু সুলতানকে পরাজিত ও হত্যা করার মাঝামাঝি সময়ে মোগল-উত্তরকালে অনেক ধনী ব্যাংকার ছিলেন। এমনকি পরেও ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন অনেক নেটিভ স্টেটে ভারতীয় ব্যাংকাররা তাঁদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিলেন।

বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে এই ভারতীয় ব্যাংকারদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করলে সুবিধাজনক হবে। শীর্ষস্তরে ছিলেন যাঁরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্রকে সেবা প্রদান করতেন। যেমন ফতেহ চাঁদ ও জগৎ শেঠ, যাঁদের পরিবার বাংলার নবাবদের ব্যাংকারে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী স্তরে ছিলেন এমন ব্যাংকাররা, যাঁরা নবাব বা সুবাদারদের ঋণ দিতেন এবং কোনো একটা অঞ্চলের মালিকানার দাবিদার জমিদাররা, যাঁরা নবাব বা সুবাদারদের রাজস্ব পরিশোধের জন্য দায়ী থাকতেন। তৃতীয় স্তরে ছিলেন সেসব মহাজন, যাঁরা জমির প্রকৃত চাষিদের অর্থঋণ দিতেন। ব্রিটিশরা জমিসংক্রান্ত বিভিন্ন অধিকারকে (যেমন সরকারি কোষাগারে ভূমিকর পরিশোধের অধিকার) সম্পূর্ণভাবে বিপণনযোগ্য[১] করে তোলার আগে ব্যাংকার, মহাজন, জমিদার কিংবা কৃষকেরা একটা পারস্পরিক সহনশীলতার নীতি মেনে চলতেন। শুধু সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবেই ঋণ প্রদানে অক্ষমতার ফলে জমিদারি হাতবদল হতো কিংবা ঋণগ্রস্ত কৃষকেরা খুব কমই তাঁদের জমি হারাতেন (বাগচি ২০০২, পৃ. ২৫-২৬)। তা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন অংশে এ রকম প্রথা চালু ছিল, যেখানে ঋণদাতা কখনো আসলের দ্বিগুণ দাবি করতে পারত না (দামদুপাট নীতি)

(দেখুন, ডেকান রায়টস কমিশন ১৮৭৬)। এ রকম কিছু প্রাক-ব্রিটিশ প্রথা বারোদার মতো অনেক নেটিভ স্টেটে চালু ছিল।

যখন ব্রিটিশ প্রশাসন মহাজনদের যেকোনো হারে সুদ নির্ধারণ, কৃষকের বন্ধকি জমি খালাসের অধিকারহরণ (foreclose) কিংবা জমি দখল করার (take over) অনুমোদন দিল, তখন থেকেই সারা ব্রিটিশ ভারতের কৃষকেরা তাঁদের জমির মালিকানা হারাতে শুরু করলেন কিংবা খাইখালাসি বন্ধকি (usufructuary mortgage) শর্তের বেড়াজালে পড়ে নিজেদের জমিতেই ভূমিদাসে (serf) পরিণত হতে হলো। কৃষকদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। যেহেতু আদালতের এখতিয়ার গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে বহুদূরের শহর ও মফস্বলের আদালতে সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং যেহেতু বিচরকেরা শুধু ওয়াকিবহাল ও মোটামুটিভাবে স্বনির্ভর মামলাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিচার করতেন, ফলে কৃষক যে অল্প পরিমাণ অধিকার পেতেন, সে ক্ষেত্রেও তাকে মারাত্মক দুর্দশার শিকার হতে হয়। এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কৃষিজীবীদের কাছ থেকে অকৃষিজীবীদের কাছে জমি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করতে বোম্বে প্রেসিডেন্সি ও পাঞ্জাবে সুনির্দিষ্ট আইন চালু করতে বাধ্য হয়। ফলে সেসব প্রদেশে সমস্যা কমে এসেছে, কিন্তু কোনোভাবেই তার মূলোচ্ছেদ হয়নি। প্রথমত, ধূর্ত মহাজনেরা চাইলে বেনামি লেনদেন ব্যবহার করে কিংবা দুই ধরনের কাগজপত্র—একটা অফিশিয়াল লোকদের দেখানোর জন্য এবং অন্যটা প্রকৃত লেনদেন রেকর্ড করার জন্য—সংরক্ষণ করে আইন ফাঁকি দিতে পারতেন। দ্বিতীয় ধরনের কাগজপত্র চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থান কৃষকদের ছিল না বললেই চলে।[২] তা ছাড়া, বহু ধনী কৃষক নিজেরাই মহাজন হিসেবে আবির্ভূত হন এবং প্রকৃত চাষিরা ভূমিচ্যুত শ্রমিকের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকেন।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এবং যুক্তপ্রদেশের আগ্রা ও অযোধ্যার মতো জমিদারি কিংবা তালুকদারি এলাকায় কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা ও পর্যায়ক্রমে মালিকানাচ্যুতির সমস্যা বিশেষভাবে প্রকট ছিল। কর পরিশোধসংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের অধিকার ইজারা দেওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়া এসব প্রদেশে এক অবিশ্বাস্য প্রকৃতির উপসামন্ততান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়া (sub-infeudation) তৈরি করে এবং অধিকাংশ প্রকৃত চাষিকে তাঁদের চাষকৃত জমিতে কোনো ধরনের আইনি অধিকারবিহীন ভাগ-চাষির পর্যায়ে নামিয়ে আনে। বাংলায় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের সিরিজ সংশোধনের মাধ্যমে তথাকথিত ভোগদখলকারী চাষিদের কিছু মধ্যস্বত্ব অধিকার প্রদান করা হয়, কিন্তু তাঁরা ছিলেন প্রকৃত কৃষকদের একটা ছোট্ট অংশ মাত্র। ১৯২৬ সালে শুরু হওয়া এবং ১৯৩০-এর দশকজুড়ে চলতে থাকা কৃষি বাজারের মন্দা চরম অনিশ্চিত ও আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে (সান্যাল ২০০৪)।

১৯৩৫ সালে দ্য বেঙ্গল অ্যাগ্রিকালচারাল ডেটরস অ্যাক্ট (বিএডি) পাস হয়। এর কারণ হিসেবে গোপনীয় অফিশিয়াল নথিতে বলা হয়, 'বঙ্গদেশ বিশেষত এর উর্বর এবং আগেকার সবচেয়ে উর্বর জেলাগুলোর কৃষিজীবীরা এমনভাবে ঋণে জর্জরিত যে, তা পরিশোধ করা তাদের সামর্থ্যের বহু ঊর্ধ্বে এবং যদি প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, এর ফলাফল হবে প্রদেশের জন্য বিপর্যয়কর' (আহসান ২০০২, পৃ. ১৭৬)।

এই আইনের বিধান অনুযায়ী, জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে (ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের বিচার করার ক্ষমতা দিয়ে) ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের সমর্থন নিয়ে কৃষক প্রজা লীগের শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হলে এই আইন আরও জোরালোভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যা-ই হোক, এসব বোর্ডের কার্যক্রম ছিল হতাশাব্যঞ্জক :

> '১৯৪৩ সাল পর্যন্ত নিষ্পত্তির জন্য বোর্ডে জমাকৃত সর্বমোট আবেদনের মাত্র ৩১% আংশিক বা সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয়, ২৯% ঝুলন্ত ছিল এবং ৪০% বদলি কিংবা বাতিল করা হয়' (আহসান ২০০২, পৃ. ১৭৭)।

ঋণ সালিসি বোর্ডের কার্যক্রম কয়েকটি সমস্যার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। প্রথমত, ময়মনসিংহের কালেক্টর যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন :

> 'খুব কম চাষিরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত আয় থাকে। যদি কোনো বছর ফসল স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে কম হয় কিংবা পরিবারের উপার্জনক্ষম কোনো সদস্য বছরের কোনো সময় অসুস্থ থাকে, তখন তথাকথিত উদ্বৃত্ত ঘাটতিতে পরিণত হয়। ফলে, খুব কম ঋণদাতাই বিশ্বাস করেন যে, ঋণগ্রহীতারা (ঋণ সালিসি বোর্ডের) মীমাংসার শর্তানুযায়ী ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।' (প্রাগুক্ত)

দ্বিতীয়ত, দুপক্ষের জন্য সম্মানজনক কোনো মীমাংসায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ঋণদাতা ও গ্রহীতা দুপক্ষকেই অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে পড়তে হতো। ১৯৪০ সালে পাসকৃত বেঙ্গল মানিলেন্ডারস অ্যাক্টের শাস্তিমূলক বিধানগুলোও অবস্থার বিশেষ তারতম্য ঘটাতে পারেনি। তৃতীয়ত, বিশেষ করে ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাংলার মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগের আধিপত্য দেখা দেয়। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব পরিচালিত হতো বড় জমিদারদের স্বার্থে, ঋণ সালিসি প্রক্রিয়ায় যাদের ন্যূনতম স্বার্থও ছিল না।

আগ্রা ও অযোধ্যা নিয়ে গঠিত যুক্ত প্রদেশের ঝাঁসির মতো কিছু কিছু জেলার সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতা চাষি বা পশুচারণজীবীরা জমির মালিক ও মহাজনদের মধ্যকার প্রাক-ব্রিটিশ সম্পর্কের ওপর আস্থা রেখে 'নমনীয়' (accommodating) মহাজনদের বস্তুত নিজেদের গ্রামে বসতি স্থাপনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন (কফ্ [Kolff] ১৯৭৯, পৃ.৬১)। যা-ই হোক, এসব নমনীয় মহাজন প্রথমে ঋণগ্রহীতাদের বিশাল অঙ্ক পর্যন্ত ঋণ অনুমোদন করেছেন এবং তারপর ব্রিটিশ ভারতীয় আইন

অনুযায়ী ঋণের বদলে ঋণগ্রহীতাদের বন্ধকি সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ করে তাঁদের জমি দখল করে নিয়েছেন। এভাবে ঝাঁসির মহ তহশিলে ১৮৬৫ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ঠাকুর, আহির ও কুর্মি জমিদার, পশুচারণজীবী ও চাষিরা তাঁদের সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি হারিয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন মাড়োয়ারি, বেনিয়া ও কায়স্থরা (কফ্, ১৯৭৯, পৃ.৫৮, টেবিল ১১)।

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ দুটি অঞ্চলের দুটি কেস স্টাডি থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যদি শোষণের কারণে কৃষকেরা নিরক্ষর ও দরিদ্র থেকে যান, যদি তাঁদের কোনো ধরনের প্রণোদনা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির—যেমন সেচ ও সার—প্রবেশাধিকার না থাকে, তাহলে ঋণের শর্ত-প্রশ্নে কোনো ধরনের সমাধানের চেষ্টাই নৈতিক ব্যাংকিংয়ের কোনো কাঠামো উপহার দিতে পারবে না।

এমনকি ঔপনিবেশিক ভারতেও কৃষিকাজ সরাসরি দেখাশোনা করতেন এমন চাষি বা বড় কৃষকেরা যদি সরাসরি সরকারি কোষাগারে ভূমি কর দেওয়ার অধিকার ভোগ করতেন—যে অধিকার তাঁরা রাইয়তিব্যবস্থার অধীনে ভোগ করতেন—তাহলে তাঁরা সস্তা ঋণের আরও ভালো প্রবেশাধিকার পেতেন। একইভাবে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ, বর্তমানের তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের বহু জেলায় 'নিধি' ও 'চি' তহবিল গজিয়ে উঠেছে। এসব ফান্ডে মহাজন ও চাষি উভয়ের শেয়ার থাকত এবং চাইলে তাঁরা এই ফান্ড থেকে ঋণ নিতে পারতেন (রায়, ২০০৪)। এ রকম কিছু ফান্ড পরবর্তীকালে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া দুটি ব্যাংকের উত্থানের সাক্ষী এই অঞ্চল—ক্যানারা ব্যাংক ও সিন্ডিকেট ব্যাংক, যাদের প্রধান কাজ ছিল জমির মালিক ও চাষিদের ঋণ প্রদান করা। ১৯৬৯ সালে ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে জাতীয়করণের বহু আগেই তারা এসব ঋণগ্রহীতার জন্য আনুষ্ঠানিক ঋণ (formal credit) সরবরাহ নিশ্চিত করেছিল।

অকৃষিজ খাতে নৈতিক ব্যাংকিং ও সম্পর্কসূচক ব্যাংকিং

কিছুকাল আগে আমি লিখেছিলাম, 'ব্যাংকারগণ সব সময় যার স্বীকৃতি দিয়ে আসছিলেন এমন একটি বিষয়কে সম্প্রতি অর্থনীতিবিদগণ তত্ত্বরূপ দিয়েছেন। সেটা হলো—ঋণের বাজার নিশ্চিতভাবেই ত্রুটিপূর্ণ এবং দর বৈষম্য (rate discrimination) ও ঋণ রেশনিং এখানে বিশ্বজনীন ব্যাপার। ঋণ-বাজারের ত্রুটিপূর্ণতার তৃতীয় মাত্রাটি হলো—কোনো সুনির্দিষ্ট ঋণদাতা কোনো সুনির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতাকে কত সময়কালের জন্য ঋণ দিতে প্রস্তুত' (বাগচি ১৯৯৭বি, পৃ.৪২)।

ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করার ক্ষেত্রে এসব বিচিত্র মাত্রার পাশাপাশি তাদের অবাধ ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করতে হয়। কাজে কাজেই, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্সের ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে।

তথ্য জোগাড় করার প্রক্রিয়া থেকেই নৈতিকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান শুধু যেটাকে বলা হচ্ছে 'সম্ভাব্যতামূলক বৈষম্য' (probabilistic discrimination), তার ওপর ভিত্তি করেই ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সেটা (সম্ভাব্যমূলক বৈষম্য) হলো—সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতার প্রকৃত ঋণ-প্রাপ্যতা (creditworthiness) নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান না করে একটা পুরো গ্রুপের গৎবাঁধা কাঠামোর ওপর নির্ভর করা। সামঞ্জস্যহীন তথ্যের প্রভাব কমানোর একটা উপায় হলো ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করা। এ রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে 'সম্পর্কসূচক ব্যাংকিং' (relationship Banking) বলা হয় অর্থাৎ এমন একটা কাঠামো, যেখানে সম্পৃক্ততার পুনরাবৃত্তি থাকবে, ব্যাংক ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক থাকবে (বেসাঙ্কো ও ঠাকুর, ২০০৪, পৃ.১)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রধানত বৃহত্তর জ্ঞাতিসম্পর্কের নেটওয়ার্কের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কসূচক ব্যাংকিং উনিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ডে শিল্পকারখানা এবং খনি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকাশে সহায়তা করেছে (Lamoreaux, 1986)।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই) অর্থায়ন ঘটেছে সম্পর্কসূচক ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। এই একবিংশ শতকের শুরুতেও শিল্পায়িত দেশগুলোর ৯০ শতাংশ ফার্ম এখনো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং দুই-তৃতীয়াংশ কর্মশক্তি এই খাতে কাজ করে (বাস ও জার্মানি, ২০০৫)। জার্মানিতে মিটেলস্ট্যান্ড উদ্যোগগুলোর [জার্মান-ভাষী রাষ্ট্র, বিশেষত জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বোঝাতে Mittelstand শব্দটি ব্যবহৃত হয়।] অর্থায়ন হয়েছে সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের আঞ্চলিক সেভিংস ব্যাংকের মাধ্যমে। জার্মানির ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো প্রত্যক্ষ অফিশিয়াল নীতি দ্বারা সমর্থিত। তাদের ব্যাংকগুলোর কাঠামোতে আছে 'স্পার্কাসেন' (মিউচুয়াল সেভিংস ব্যাংক) (sparkassen mutual saving banks) ও 'ভলস্ব্যাংকেন' (volksbanken) বা 'কো-অপারেটিভ' ব্যাংকের মতো বিশালসংখ্যক আঞ্চলিক ও স্থানীয় ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, যাদের প্রধান সম্পদ হলো স্থানীয় {মিটেলস্ট্যান্ড} গ্রাহকদের কাছাকাছি থাকা। এই নৈকট্য {মিটেলস্ট্যান্ড} ঋণের ঝুঁকি সম্পর্কে উৎকৃষ্টতর মূল্যায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে সহায়তা করে (পাওস্ট, ২০১৪)।

আমি জার্মান মিটেলস্ট্যান্ড বা এসএমই সম্পর্কে একটু মনোযোগ দেব। কারণ, জার্মানি এখনো ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনীতি হিসেবে টিকে আছে এবং নিরাশাবাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে জার্মানির এসএমই খাত বিশ্বায়নের প্রবল চাপের মধ্যেও বিকশিত হয়েছে। জার্মানিতে উনিশ শতাব্দী থেকে প্রথমে

স্টিল ইন্ডাস্ট্রি এবং পরবর্তী সময়ে অটোমোবাইল ও ই-ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি ইন্ডাস্ট্রিতে বৃহৎ ও উল্লম্বভাবে অঙ্গীভূত 'autackic' বা স্বনির্ভর ফার্মগুলো বিকশিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে Constituent Lander বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে কিছু আইনি ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করার ফলে এমনকি ওহোমাইন রাইখ [১৮৯০-১৯১৪] ও ভাইমার রিপাবলিকের [১৯১৮-১৯৩০] আমলেও বৃহৎ কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি কুটির শিল্পভিত্তিক এসএমইগুলো বিকশিত হয়েছে (হেরিগেল, ১৯৯৬, অধ্যায় ৩)। ১৯৪৫ সালের পর এই কাঠামো পুনর্গঠন করা হয় এবং তা ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে জার্মান অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রথমে মনে হয়েছিল নব্য উদারনৈতিক বিশ্বায়নের চাপে পিষ্ট হয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো টিকবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ফোর্ডিস্ট ('স্বনির্ভর') শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এবং অটোমোবাইল ও অন্য সব ধরনের মেশিন-যন্ত্রাংশের আউটসোর্সিং খাতের ক্রম অবনতির ফলে জার্মান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো নবজীবন লাভ করেছে (হেরিগেল, ১৯৯৬, অধ্যায় ৫; পাওস্ট, ২০১৪)।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর এই গতিশীলতার একটি প্রধান ভিত্তি হলো জার্মানির শিক্ষাব্যবস্থা। সেখানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে বাধ্যতামূলক এবং ১৮ বা ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত আংশিকভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে বাধ্যতামূলক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। অধিকাংশ ছাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তাদের অধিকাংশই কোনো না কোনো দক্ষতাভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত হয়। যদিও কারিগরি শিক্ষার্থীদের মধ্যেও কেউ কেউ তাদের পছন্দের বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় (হিপ্পাচ-স্নাইডার, খাউজা ও ওল ২০০৭; লহমার ও এখার্ড ২০১৩)। দক্ষ শ্রমিকদের অনেকেই পরিবারের মালিকানাধীন এসএমইতে যোগ দেয়, যার ফলে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক মজবুত হয় এবং নিজেদের এলাকার জন্য সামাজিক দায়িত্বমূলক প্রকল্প হাতে নিতে তারা উৎসাহিত হয় (পাওস্ট, ২০১৪)। ফার্মের এই ধরনের গঠনপ্রক্রিয়া অ্যাংলো-সেক্সন, নব্য উদারনৈতিক 'শেয়ারহোল্ডারই রাজা' মডেলের ফার্মকাঠামো ও কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত (বাগচি ১৯৯৭এ)। জার্মানির প্রায়োগিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ফ্রনোওফার সোসাইটির (Fraunhofer Society) সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সেখানকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কার্যক্রমকে প্রযুক্তিগতভাবে আরও উন্নত করা হয়েছে। ২০১৩ সালে ফ্রনোওফার সোসাইটির বার্ষিক বাজেট ছিল ১ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ইউরো। তারা প্রায় ৬ হাজার প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দিচ্ছে এবং প্রতিবছর প্রায় ৪০০টি নিবন্ধিত পেটেন্ট উৎপাদন করছে (হল্জ, ২০১৩)। দক্ষিণ-এশিয়ার অনেক শিল্পায়িত অর্থনীতি, বিশেষত গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (পিআরসি) ও তাইওয়ানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি

শিল্পগুলো আয়, চাকরি ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চীনে যেমন 'জিডিপিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের অবদান ৬০ শতাংশ এবং কর্মশক্তির ৮২ শতাংশ এই খাতে নিয়োজিত' (পাওস্ট, ২০১৪)। ছোট রাষ্ট্র তাইওয়ান যদিও আধা পরিবাহী পদার্থ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর নেতৃত্বস্থানীয় কয়েকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের গর্বে গর্বিত দেশ, ২০০৯ সালে 'তাইওয়ানের ১ দশমিক ২ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সে দেশের সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ৯৮ শতাংশ। এ খাত রাষ্ট্রের সর্বমোট বিক্রির ৩১ শতাংশ ও রপ্তানি ১৭ শতাংশ উৎপাদন করে' (ওয়াং, ২০১০)। সাফল্য অর্জনকারী জার্মানির মতোই বর্তমানের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে ফান্ড বরাদ্দের ক্ষেত্রে শক্তিশালী সরকারি সহায়তা, কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভ্যন্তরীণ স্পেসের সুরক্ষা এবং চিহ্নিত খাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণা ও উন্নয়ন (ইউএন এসকাপ, ২০১৪, অধ্যায় ৫)।

জার্মানি ও তাইওয়ানের সাফল্যের গল্প থেকে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে শেষ পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তব্য হলো প্রকৃত অর্থনীতিকে সহায়তা করা; অনিয়ন্ত্রিত ফিন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিকে নয়, যা ফিন্যান্স-ব্যারনদের আরও অর্থশালী করার জন্য তহবিল শুষে নেয় এবং পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় যে অনিয়ন্ত্রিত অর্থায়ন যুক্তরাষ্ট্র (ওরহানগাজি, ২০০৮), যুক্তরাজ্য এবং আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো ও তুরস্কের মতো পৃথিবীর উদীয়মান ফিন্যান্সনির্ভর অর্থনীতিগুলোকে এক মারাত্মক ধসের পথে নিয়ে গেছে (দেমির, ২০০৬)।

অনিয়ন্ত্রিত অর্থায়ন এবং অপরিহার্য জন-কর্মকাণ্ড থেকে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রত্যাহার অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পর্কসূচক ব্যাংকিংকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে

যখন অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অনিয়ন্ত্রিত ব্যাংক কিংবা আর্থিক কোম্পানিগুলোকে অর্থায়ন ব্যবসায় নামার অনুমোদন দেওয়া হয় এবং ফার্মগুলোকে অনিয়ন্ত্রিত ক্যাপিটাল মার্কেটে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করা হয়, তখন সম্পর্কসূচক ব্যাংকিং অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে (বেসাঙ্কো ও ঠাকুর, ২০০৪)। চারটি ভুল ধারণাকে সমর্থন করার জন্য প্রধানত নব্য ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদেরা বিশাল আবর্জনার স্তূপ পরিমাণ (অর্থনীতি) সাহিত্যকে বিকৃত করেছেন। প্রথম ভুল ধারণাটি হলো—শেয়ারহোল্ডাররাই একমাত্র স্টেকহোল্ডার, যাঁরা কোনো ফার্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা জোগানদার কেউই বিবেচ্য হওয়ার নয়। দ্বিতীয় ভুল ধারণা হলো—হঠাৎ কোনো একমুহূর্তে স্টক মার্কেট কোনো ফার্মের অন্তর্নিহিত মূল্য (fundamental value) প্রকাশ করতে পারে। তৃতীয় ভুল ধারণা—যা দ্বিতীয়টির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত, তা হলো স্টক মার্কেট কার্যকরভাবে কাজ করে, এই অর্থে যে স্টক মার্কেটে ব্যবসা করে কেউ লাভবান হতে পারে না।

চূড়ান্ত ভুল ধারণাটি হলো, স্টক মার্কেট কর্তৃক প্রকাশিত অন্তর্নিহিত মূল্যের ভিত্তিতে আপনি ডিরাইভেটিভসের মূল্যের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন (বাগচি, ১৯৯৭এ)। এই শেষ ভুল ধারণার তত্ত্বরূপ দেওয়ার জন্যই ১৯৯৭ সালে রবার্ট মার্টন ও মাইরন স্কোলসকে অর্থনীতিতে সুইডিশ ব্যাংক পুরস্কারে (যেটাকে ভুলভাবে অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার বলা হয়) ভূষিত করা হয় (স্টক মার্কেটকে বিপজ্জনক করে তোলা বহুবিধ অকার্যকারিতার একটা জরিপ পাওয়ার জন্য, দেখুন শ্লেইফার, ২০০০)। মার্টন ও স্কোলস লং-টার্ম ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এলপি (LTCM) এর প্রধান শেয়ারহোল্ডার ও বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের সদস্য ছিলেন। মার্টিন ও স্কোলসের সুইডিশ ব্যাংক পুরস্কারপ্রাপ্তির মাত্র এক বছরের মধ্যে এই ফার্মের অতিমাত্রায় লেভারেজ্ড মাস্টার হেজ ফান্ড লং-টার্ম ক্যাপিটাল পোর্টফোলিও এলপি ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি এক্সপোজার নিয়ে ১৯৯৮ সালের শেষদিকে মুখ থুবড়ে পড়ে। ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নেতৃত্বে ১৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের পুঁজিকাঠামো পুনর্বিন্যাস (recapitalization) ও বেইল আউটের (bail out) লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল ব্যাংকারস ট্রাস্ট বারক্লেইজ, বিয়ার স্টিয়ার্নস, চেইজ ম্যানহাটন ব্যাংক, ক্রেডিট অ্যাগ্রিকোল, ক্রেডিট সুইসি ফার্স্ট বস্টন, ডাটসি ব্যাংক, গোল্ডম্যান স্যাক্স, জেপি মরগ্যান, লেহম্যান ব্রাদার্স, মেরিল লিঞ্চ, মরগান স্ট্যানলি, প্যারিবাস, সলোমন স্মিথ বার্নে, সোসিয়েতে জেনারেলে ও সুইজারল্যান্ডের ইউবিএস (গ্রিনস্প্যান, ২০০৭, পৃ. ১৯৩-৫)।

লং-টার্ম ম্যানেজমেন্টের পতনের ফলে ব্ল্যাক-মার্টন-স্কোলস ফরমুলার প্রয়োগ বন্ধ হয়। কিন্তু কোলাটেরালাইজড ডেট অবলিগেশন (CDOs) এবং অনেক ব্যাংক ও হেজ ফান্ডের ঋণ অফ-ব্যালেন্স শিট অ্যাকাউন্টে দেখানো ইত্যাদি যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ডিরাইভেটিভসের বিস্তৃতি বন্ধ হয়নি। যারা LTCM-এর বেইল আউটের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের অধিকাংশই যেমন—বিয়ার স্টিয়ার্নস, লেহম্যান ব্রাদার্স ও মেরিল লিঞ্চ ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দায় দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ১৯৮০-র দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ফিন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি সমৃদ্ধি লাভ করে। আর্থিক খাতের মুনাফা যোগ্যতা (profitability) প্রকৃত পণ্য খাতের মুনাফা যোগ্যতাকে ডিঙিয়ে অনেক দূর ছাড়িয়ে যায় এবং অফিশিয়ালদের গড় বেতন অর্থনীতির অন্যান্য খাতের তুলনায় ১৮১ শতাংশ বেড়ে আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে ফিন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি শত শত মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে পারে হোয়াইট হাউস ও ক্যাপিটল হিলে লবি নিয়োগ কিংবা রাজনীতিবিদদের প্রচারণার জন্য, যারা স্বাভাবিকভাবেই তাদের বশংবদ হয়ে থাকবে। যেহেতু প্রকৃত বিনিয়োগে অর্থলগ্নি করার সুযোগ রুদ্ধ হয়ে যায়, ফিন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি ঊর্ধ্বমুখিন হলেও ব্যাংক,

বহুজাতিক ফিন্যান্স করপোরেশন ও মর্টগেজ লেন্ডার প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্ন থেকে নিম্নতর মানের প্রকল্পে অর্থায়ন করতে শুরু করে এবং সব সময় এই আশায় দিন গুনতে থাকে যে অন্য কেউ এসে ট্যাবটা ওপরের দিকে তুলে নেবে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হলো তথাকথিত নিনজা লোনস্ অর্থাৎ উপার্জন, চাকরি ও সম্পত্তিহীন লোকদের ঋণ প্রদান। একটা ফিন্যান্সিয়াল অলিগার্কি বা আর্থিক গোষ্ঠীতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রকে দখল করে নিয়েছে। দেশটির একজন সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ সায়মন জনসন যেমন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সেন্ট্রাল আমেরিকার 'ব্যানানা রিপাবলিকে'র চেয়ে ভালো নয়, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি করপোরেশন ইউনাইটেড ফ্রন্ট কোম্পানি দীর্ঘদিন যাবৎ সরকার (সাধারণত একজন মেরুদণ্ডহীন স্বৈরশাসক) নির্ধারণ করে আসছে (জনসন ২০০৯)।

যুক্তরাষ্ট্রের ফিন্যান্সিয়াল অলিগার্কির ক্ষমতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন বেইলিং আউট করা ব্যাংক, হোম মর্টগেজ ইনস্টিটিউশন এবং এআইজি (AIG)—এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, যাদের প্রধান নির্বাহীদের অবৈধ পথে অর্জিত সম্পদ গলায় হাত দিয়ে বের করে আনার ব্যবস্থা করা হয়নি; কিংবা শাস্তিযোগ্য অসতর্কতা এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্জলা প্রতারণার জন্যও যাদের কোনো শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি—তাদের জন্য সরকার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে (রেকফ, ২০১৪)। যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক জেড রেকফ যেমন দেখিয়েছেন, হেজ ফান্ডের বিরুদ্ধে যে অল্প কিছু দেওয়ানি মামলা রুজু করা হয়েছে, সেখানে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে খুব দুর্বলভাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট তাদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করেনি। ডিপার্টমেন্ট ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রতারণামূলক বিনিয়োগের (Ponzi scheme) জন্য বার্নার্ড ম্যাডফের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে, যেখানে ফিন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির কিছু বড় নামসহ অনেক লগ্নিকারীকে টানা হয়েছে এবং ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের জন্য রজত গুপ্ত ও রাজরত্নমকে বিচারপ্রক্রিয়ার মুখোমুখি করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী কোম্পানিগুলোর কোনো একজন সিইওকেও বিচারপ্রক্রিয়ায় আনা হয়নি।[৩]

ঔপনিবেশিক ভারতে সম্পর্কসূচক ব্যাংকিং ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ঔপনিবেশিক ভারতে সম্পর্কসূচক ব্যাংকিংয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখানে জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক নেটওয়ার্কের ফলে আস্থার জটিল জালগুলো তৈরি হয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় শাখা খোলার বহু আগেই কিছু ভারতীয় ব্যাংকারের শাখা বা এজেন্সি ভারতজুড়ে—পেশোয়ার থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ভারতীয়

ব্যাংকারদের এসব নেটওয়ার্কের প্রভাব সুস্পষ্ট হয় ১৮৯০-এর দশকে, যখন অফিশিয়াল টাঁকশালে বিনা পয়সায় রৌপ্য মুদ্রা সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ঋণের ক্ষেত্রে চরম সংকট দেখা দেয় (তথাকথিত 'limping standard'[এমন মুদ্রাব্যবস্থা যেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য দুটোই বিহিত মুদ্রা, কিন্তু শুধু একটিকে ফ্রি কয়নেজ দেওয়া হয়]-এর কাল)। ব্যাংক অব বোম্বের সেক্রেটারি জি এইচ স্লেইজ *টাইমস অব ইন্ডিয়ায়* লেখা (স্লেইঘ, ১৯৯৮) একটা চিঠিতে দাবি করেন, যে সব শ্রফ বোম্বের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পুরোটাই অর্থায়ন করতেন, তাঁরা সাধারণভাবে তাঁদের দর ৮ শতাংশের বেশি উঠতে দিতেন না। এমনকি যখন তিনটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সি ব্যাংকের দর এর চেয়ে অনেক বেশিতে উঠে যেত, তখন তাঁরা একজন আরেকজনের বিল আরও নিচু দরে ছেড়ে দিতেন (আরও দেখুন, জেইন ১৯২৯, পৃ. ৯৫-৬ ও পৃ. ১০৩; দ্বিতীয় উৎসে ১৮৬৭ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত আন্তব্যাংক দর (sahukari rates) দেওয়া আছে। সেখানে দেখা যাবে, ক্রমপতনপ্রবণতার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য রকম স্থিরতা, যা প্রায়শ প্রেসিডেন্সি ব্যাংকগুলো কর্তৃক নির্ধারিত দরের চেয়েও নিচে নেমে যেত।)।

তবে অবশ্যই এই নেটওয়ার্ক-সম্পর্কগুলো শ্রফদের পক্ষপাতপুষ্ট গ্রাহকদের উপকৃত করেছে এবং তারা অন্যদের প্রতিও ছিল বৈষম্যমূলক। বুড়াবাজারের মাড়োয়ারি শ্রফরা ব্যাংক অব বেঙ্গল থেকে যে দরে ঋণ নিতেন, তার চেয়েও কম দরে তাঁদের নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের ঋণ দিতেন। অন্যদিকে, বাঙালি ব্যবসায়ী কিংবা নাকুদা অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করতেন এমন অবাঙালি মুসলমান ব্যবসায়ীদের ঋণের বিপরীতে তাঁরা অনেক বেশি চড়া সুদ ধার্য করতেন (বাগচি, ১৯৯৭বি, পৃ. ৪৮-৯)।

ব্যাংক অব বেঙ্গল বৈষম্যের নীতিতে এক ধাপ এগিয়ে শুধু মাড়োয়ারি শ্রফদের সঙ্গেই লেনদেন করত, যাদের তারা বাঙালি ও নাকুদা ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি ঋণপ্রাপ্য (credit-worthy) মনে করত (বাগচি, ১৯৯৭বি, পৃ. ৪৮-৯)। সমাজের নীচু শ্রেণির ক্ষেত্রে সুদের হার ও ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য চরম মাত্রায় ধারণ করত। যেমন বিশালসংখ্যক উপজাতি বসবাস করে—এমন জেলাগুলোতে কালি পরজ বা কালো গায়ের রংবিশিষ্ট লোকদের উজলি পরজ বা ফরসা গায়ের রংবিশিষ্ট গোত্রের চেয়ে বেশি হারে সুদ দিতে হতো (উপরোক্ত, পৃ. ৪৩)।

দক্ষিণ এশিয়ায় আধুনিক লিমিটেড-লায়াবিলিটি জয়েন্ট-স্টক ব্যাংকিং প্রবর্তন করেন ঔপনিবেশিক শাসকেরা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ব্যাংক অব বেঙ্গল (১৮০৯), ব্যাংক অব বোম্বে (১৮৪০) ও ব্যাংক অব মাদ্রাজকে (১৮৪৩) সংসদীয় সনদ প্রদান করার মাধ্যমেই এর শুরু হয়। এসব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং ইউরোপীয় ঋণগ্রহীতাদের তুলনায় ভারতীয় ঋণগ্রহীতাদের প্রতি

আচরণে বৈষম্য বিরাজমান ছিল। ১৮১০ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বোম্বে ব্যাংক ব্যতীত কোনো ব্যাংকে ভারতীয় পরিচালক ছিল না। আবার এই বোম্বে ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাংকে কোনো ভারতীয় নগদ ঋণসুবিধা পাননি। ঋণ পাওয়ার জন্য তাঁদের সব সময় সরকারি বন্ড বা অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটি ডিপোজিট করতে হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত কোনো ভারতীয়কে কোনো ব্রাঞ্চের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি (বাগচি ১৯৮৭, অধ্যায় ৩, ৫, ৭, ৯, ১২, ১৫; বাগচি ১৯৯৭বি, অধ্যায় ৬, ১২ ও ১৫)।

উন্নয়নবান্ধব ব্যাংকিং (developmental banking), সম্পর্কসূচক ব্যাংকিংয়ের আরেকটি রূপ

উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বা অঞ্চলগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পায়িত রাষ্ট্রগুলো অর্থাৎ তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি পিপলস রিপাবলিক অব চায়না (পিআরসি), রিপাবলিক অব কোরিয়া (ROK) বা দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর[৪] প্রভৃতি দেশ ফিন্যান্স কোম্পানি ও স্টক মার্কেটের অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট অন্তঃবিস্ফোরণ থেকে বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। এসব রাষ্ট্র অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে জাপানের কৌশল অনুসরণ করেছে। এক. দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, এমনকি যখন তারা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির সাহায্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল, তখনো তারা একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করেছে। চীন অবশ্য ১৯৮০-এর দশকের সংক্ষিপ্ত কাল ছাড়া পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছ থেকে কোনো অর্থসহায়তা গ্রহণ করেনি। নীতি প্রণয়নের স্বাধীনতা অর্জন ও তা বজায় রাখার একটি প্রধান উপায় হলো রপ্তানি খাতকে উৎসাহিত করা। এমনকি যখন নতুন শিল্পকে অভ্যন্তরীণ বাজারে সুরক্ষা দেওয়া হয়, তখনো এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এসব নতুন শিল্পের কোনো কোনোটি রপ্তানি বাজারে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকার প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তৃতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থায়নের প্রধান উৎস ছিল ব্যাংক। এ কারণে পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নের বঙ্কিম পথকে কখনো কখনো ব্যাংকনির্ভর উন্নয়ন হিসেবে দেখানো হয়। সাম্প্রতিক কালে ভিয়েতনাম অর্থনৈতিক ও মানবীয় উন্নয়নের জন্য একই কৌশল অবলম্বন করে সাফল্য অর্জন করছে।

দক্ষিণ এশীয় সাফল্যের গল্প থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর অনেক কিছু শেখার আছে। ব্যাংকিং খাতে সীমাবদ্ধ থেকে আমি বলতে চাইব যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর তথাকথিত বিশ্বজনীন ব্যাংকিং মডেল বাতিল করে দেওয়া উচিত, যা

গ্রহণ করতে তাদের প্ররোচিত করা হয়েছে কিংবা অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি ফিন্যান্স কোম্পানির চাপের মুখে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে; বরং সরকারি সমর্থনপুষ্ট ও সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন ব্যাংকিং খাত থাকা উচিত, যা যেকোনো সীমা লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে কোনো ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। স্টক মার্কেট পরিচালনার দায়িত্ব ব্যাংকের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। টেকসই অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের পথে অগ্রগামী প্রতিটি রাষ্ট্রের উচিত Glass-Steagall Act-এর মতো একটি আইন পাস করা।[৫] ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে পর্যাপ্ত ব্যাংকিং সুবিধাসহ সচেতনভাবে উৎসাহিত করা এই কৌশলের অংশ হওয়া উচিত।

পাওস্ট (২০১৪) যেমন গুরুত্বসহকারে দেখিয়েছেন, পূর্ব এশিয়ার বাইরের উন্নয়শীল রাষ্ট্রগুলোয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত অনেক কম বিকশিত, কম সক্রিয় এবং লাল ফিতা, ত্রুটিপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা, অর্থায়নের অভাব ও অন্যান্য কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। উপরিউক্ত একটি মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, অনিয়ন্ত্রিত অর্থায়নের অরাজকতার ফলে ২০০৭ সালের পরের বছরগুলোতে সারা পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক ও ফিন্যান্স কোম্পানিগুলোর দেউলিয়া হতে দেখা গেছে। যেমন যুক্তরাজ্যে নর্দান রক, রয়্যাল ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড ও লয়ডস ব্যাংক—সবাই দেউলিয়া হয়েছে এবং জনগণের বিশাল পরিমাণ অর্থ গচ্ছা দিয়ে ব্রিটিশ ট্রেজারি কর্তৃক উদ্ধার পেয়েছে।

নৈতিক ব্যাংকিংয়ের জন্য একদিকে যেমন ব্যাংকারের অবাধ ক্ষমতা (discretion) প্রয়োগের সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন; অন্যদিকে সম্পদ আহরণ, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসার—যেমন স্টক মার্কেট ক্যাসিনোতে লগ্নি করা— এ ক্ষেত্রে ব্যাংকারের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধও থাকা প্রয়োজন। এই বিধিনিষেধ প্রয়োগ করতে হবে যথার্থভাবে গঠিত সরকারি কর্তৃপক্ষ, বিশেষত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় দ্বারা, যারা একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের নজরদারিতে থেকে কাজ করবে। নৈতিক ব্যাংকিংয়ের জন্য প্রয়োজন Glass-Steagall বা ১৯৪৭ সালের পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় পরিচালিত ব্যবস্থার অনুসরণ করে বিকেন্দ্রীকৃত সম্পর্কসূচক ব্যাংকিং এবং ব্যাংক ও স্টক মার্কেটের মধ্যে সুস্পষ্ট পৃথ্ককরণ।

উপসংহার : ব্যাংকিং নৈতিকতাকে একটি নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ করতে হবে

আমাদের সময়ের একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ-দার্শনিক অমর্ত্য সেন নৈতিকতা ও অর্থনীতি নিয়ে বিস্তৃত লেখালেখি করেছেন। নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে কোনো কর্মোদ্যোগের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কর্তব্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (deontological

reasoning) ও পরিণামবাদী যৌক্তিকতার (consequentialist justifications) মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য নিরূপণ করেছেন (দেখুন, সেন ২০০৯, অধ্যায় ৭-১০)। প্রথমটির সবচেয়ে সহজ উদাহারণ হচ্ছে ইমানুয়েল কান্টের ('categorical imperative') 'নিঃশর্ত বা চরম অত্যাবশ্যকতা' (তোমাকে এটা করতে হবে। কারণ, এটা তোমার কর্তব্য) কিংবা ভারতীয় মহাকাব্য 'মহাভারতে' কৃষ্ণের সেই যুক্তি, অর্জুনের অবশ্যই কৌরভদের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত। কারণ একজন 'ক্ষত্রিয় রাজপুত্র হিসেবে কৌরভদের কাছ থেকে রাজ্য উদ্ধার করা তার কর্তব্য, যদিও সে-যুদ্ধে তার প্রিয়জনের প্রাণসংহার হতে পারে। পরিণামবাদীরা সঠিক কর্মের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে অবিসংবাদিত কর্তব্য সম্পাদনের পরিণাম নিরূপণ করেন। সেন সম্পূর্ণভাবে পরিণামবাদী অবস্থানের পক্ষে তার মূল্যায়ন করেছেন।

আমিও বিশ্বাস করি, মানবীয় কর্মকাণ্ডের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে পরিণামবাদে আস্থা রাখাই উত্তম পন্থা। তবে আমি সেই অবস্থান কিছুটা পুনর্বিন্যাস করতে চাই। প্রথমত, আমি প্রশ্ন তুলতে চাই কর্তব্যবাদীদের কর্তব্যের উৎস কী। এ রকম ঐশী প্রত্যাদেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত একটি কাব্যভাষায় তুলে এনেছেন লর্ড টেনিসন তাঁর 'Charge of the Light Brigade' কবিতায় :

সাংঘাতিক ভুল করেছে কেউ একজন
কিন্তু জবাব দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই
হেতু নির্ণয় করারও নেই উপায়
শুধুই কর্তব্য পালন, নয় মৃত্যু।

বিদেশের মাটিতে একটি সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক অপরিণামদর্শী কমান্ডারের ভুলে লাইট ব্রিগেডের সেই ছয় শ সেনাকে মৃত্যু উপত্যকায় ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। কেন সেখানে মৃত্যুবরণ করা তাদের কর্তব্য ছিল? চার্লস ব্যারন দ্য মন্টেস্কুর (২০১২) পেন্স নং ৭৪১-এ চিত্রিত একটি প্রত্যাদেশ আমি উত্থাপন করব, যা ব্যাংকিং ও অন্য অনেক কাজের নৈতিকতা মূল্যায়নের একটি যথাযথপ্রায় দিকনির্দেশনা হতে পারে :

> 'যদি আমি এমন কিছু জানি যা আমার জন্য উপকারী এবং আমার পরিবারের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে আমি আমার মন থেকে তা মুছে ফেলব। যদি আমি এমন কিছু জানি যা আমার পরিবারের জন্য উপকারী কিন্তু দেশের জন্য নয়, আমি তা ভুলে যেতে চাইব। যদি আমি এমন কিছু জানি যা আমার দেশের জন্য উপকারী এবং ইউরোপের জন্য ক্ষতিকর কিংবা ইউরোপের জন্য উপকারী কিন্তু মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর, আমি এটাকে অপরাধ বলে গণ্য করব।'

যদি আমরা এই উপদেশে কান দিই, তবে দেখব যে যখন আমরা বাছবিচারহীনভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও ফিন্যান্সসংক্রান্ত নীতিমালা প্রয়োগ করছি, যা শুধু বৈষম্য বৃদ্ধি করছে এবং একটি জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশকে নাকচ

করে দিচ্ছে; তখন বিভিন্ন প্রতিরূপে 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলগত প্রোগ্রাম' (পিআরএসপি) পরিচালনা করাই যথেষ্ট নয়। নব্য ধ্রুপদি অর্থনীতি অধিকাংশ রাষ্ট্রের নীতি-পরামর্শকদের আদর্শ মানসিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতি একজন প্র্যাকটিশনারকে কাঠামোগত কার্যকারণ সম্পর্কে অন্ধ করে দেয়। আমি যদি নতুন শব্দগুচ্ছ প্রবর্তন করে বলি তাহলে বলতে হয়, এটা তাকে কাঠামোগত নৈতিকতার ব্যাপারেও অন্ধ করে দেয়। দ্বিতীয় ব্যাপারটার সমাধানের জন্য একজন নীতিনির্ধারককে এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, তিনি যে সমাজ নিয়ে কাজ করছেন, তার কিছু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য আছে, যা ব্যাষ্টিক পর্যায়ের কোনো সংখ্যক পিআরএসপি পদক্ষেপ দিয়ে প্রতিকার করা যাবে না। পৃথিবী এখন অচেতন নাজি জল্লাদ আইখম্যানে ভরে গেছে। যারা মনে করে, তারা শুধু তাদের কর্তব্যকর্ম করছে। এই উপলব্ধি তাদের নেই যে এর মাধ্যমে তারা গণদারিদ্র্য সৃষ্টি করছে এবং কোনো না কোনো ধরনের সন্ত্রাসী যুদ্ধের বীজ বপন করছে। নুরুল মতিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নৈতিক ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য প্রয়োজন আইখম্যানীয় আচরণের মানদণ্ডকে উড়িয়ে দেওয়া। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই মৌলিক ও প্রক্রিয়াগত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার (এমন ব্যবস্থা নয়, যেটা টাকা দিয়ে কেনা যায়) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো থাকা প্রয়োজন, যাতে কোনো নীতিমান ব্যাংকারকে শহিদ হতে বাধ্য না হতে হয়।

তথ্যসূত্র :

১. জমিসংক্রান্ত অসংখ্য অধিকারের পণ্যায়ন (commoditizing) এবং সম্পত্তি হিসেবে জমির ওপর একচেটিয়া অধিকার আরোপ করার মধ্যে পার্থক্যের জন্য দেখুন বাগচি ২০১০, 'ভূমিকা' এবং বাগচি ২০১০ [১৯৯২]। আবাদের জন্য ছাড়া জমি প্রধানত ইউরোপিয়ানদের দেওয়া হতো, ব্রিটিশরা কখনোই সাধারণ কৃষক-আবাদকৃত করের আওতাধীন জমির সাধারণ অধিকার কাউকে দিত না।

২. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আদালতগুলোর স্বেচ্ছাচারমূলক রায়ের জীবন্ত বর্ণনার জন্য দেখুন, চারুচন্দ্র দত্তের আত্মজীবনী। তিনি ১৮৯৯ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং বোম্বে প্রেসিডেন্সির একজন জেলা জজ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন : দত্ত (১৯৬৬)।

৩. বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা যা আসলে ২০০৭ সালে শুরু হয়েছে, তার কারণ সম্পর্কে আলোচনা এবং বেইল আউট কার্যক্রমের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর জনতহবিল থেকে কী পরিমাণ খরচ গুনতে হয়েছে, তা এই নিবন্ধের আওতার বাইরে। যুক্তরাজ্যের প্রেক্ষাপটে এসব বিষয় বিশ্লেষণের জন্য দেখুন (এফএসএ ২০০৯ এবং হার্বস্ট ২০১৩)।

৪. ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে হলেও অফিশিয়াল অর্থনৈতিক কৌশলের দিক থেকে সিঙ্গাপুর দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুচ্ছের মধ্যেই পড়ে।

৫. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পোন্নত দেশগুলো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় অধিক সম্পদ ব্যয় করেছে এবং ফলে সর্বজনীন বা প্রায় সর্বজনীন সাক্ষরতা,

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক গ্র্যাজুয়েট, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির উচ্চ হার, নিম্ন জন্মহার অর্জন করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahsan, Manzoor. 2002. 'Reforming rural credit : Experience under the Fazlul Haq ministry in Bengal'. Pp.170-185 in Bagchi 2002.

Baas, Timo and Mechthild Schrooten. 2005. *Relationship Banking and SMEs A Theoritical Analysis*, Dissertation paper Series A No. 470, Tokiyo: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University.

Bagchi, Amiya k. 1987. *The Evolution of the State Bank of India: The Roots 106-176, Parts I and II*, New Delhi: Oxford University Press.

Bagchi, Amiya k. 1997a. *Economic Theory and Economic Organizations 1: a critique of the Angli-American theory of firm structure*, Occational Paper No. 165, Center for Studies in Social Sciences, Calcutta.

Bagchi, Amiya k.1997b. *The Evolution of the State bank of India, Volume2, The Era of the Presidency Banks 1887-1920*, New Delhi: Sage.

Bagchi, Amiya k. 2002[1981] *Merchants and Colonialism*, Occasional Paper No.38, Center for Studies in Social Sciences, Calcutta: reprinted, pp.17-70, Bagchi, Amiya k.: *Capital and Labour re-defined: India and the Third World*, New Delhi: Tulika.

Bagchi, Amiya k. ed. 2002. *Money & Credit in Indian History from Early Mediaval Times*, New Delhi: Oxford University Press.

Bagchi, Amiya k. and Subhanil Banerjee. 2005. How strong are the arguments for bank mergers? *Economic and Political Weekly*, XL 12) 1181-1189.

Besanko, David and Anjan V. Thakor. 2004. *Relationship banking, deposit insurance and portfolio choice*, (URL:http://128.118.178.162/eps/fin/papers/0411/0411046.pdf, accessed on 25.9.14)

Boot ,Arnoud W. A. 2000. Relationship banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, vol.9: 7–25.

Datta, Charuchandra. 1996. *Purono kotha*, *Dwitya Khanda* (in Bangla), Calcutta: Bisva Bharati Grantan Bibhag.

Deccan Riots Commisson. 1876. *Report of the Committee on the Riots in Poona and Ahmedanagar, 1875*. Bombay: Government Central Press.

Demir, Firat. 2006. *Macroeconomic uncertainty, private investment and financialization of real sectors in emerging markets: Evidence from Argentina, Mexico and Turkey* (URL:http://www.ou.edu/cas/econ/wppd/macrouncertainty%20fd.pdf.accessedon 11.10.14)

Epstein, Gerald A, and Arjun Jayadev. 2000. 'The rise of rentier incomes in OECD countries: financialization, central bank policy and labour solidarity', pp.46-74 in G. Epstein. Ed. *Financialization and the World economy*, Cheltenham, UK: Edward Elgar.

FSA. 2009. *The Turner review: a regulatory response to the global financial crisis*, London: March.

Greenspan, Alan (2007). *The Age of Turbulence: Adventures in a New World*, London: Allen Lane the Penguin Press.

Herbst, Moria. 2013. The bank bailout cost US taxpayers nothing? Think again, *The Guardian,* 20 may.

Herrigel, Gray. 1996. *Industrial Constructions: the sources of German industrial power*, Cambridge: Cambridge University Press.

Hippachg- Schneider, Ute, Martina Krause and Christian Woll. 2007. *Vocational education and training in Germany: short description*, Cedefop Panorama series; 138, Luxembourg: Office for Official Publications of the Eropean Communities.

Holz, Michael. 2013. *Main characteristics and competitive strengths of German Mittelstand companies*, paper presented at ISTUD Business School & Mediobanca Workshop 'II Quarto capitalism: modelli di sviluppo aziendale e strategie', Bavena (Italy), 24 May.

Jain, L. C. 1929. *Indeginious Banking in India*, London: Macmillan.

Jhonson, Simon. 2009. A quiet coup, *The Atlantic Monthly*, 1 May.

Kloff, Drik H.A. 1979, 'A study of land transfers in Mau tahsil, District Jhansi', pp.53-85 in K. N.Choudhuri Nd Clive Dewey. Eds. *Economy and Society: Essays in Indian economic and social History*, New Delhi: Oxford University Press.

Lamoreaux, Noami R. 1986, Banks, Kinship and economic Development: The New England case, *The Journal of Economic History*, 46(3): 647-667.

Lillia, Mark. 2013. Arendt and Eichmann, *New York Review of Books*, 21 November.

Lohmar, Brigitte and Thomas Eckhardt. Eds. 2013. *The Education System in the federal republic of Germany 2011/12*, Bonn: Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and

Cultural Affairs of the Länder in The Federal Republic of Germany, (URL:http://www.kmk.org/fileadmin/doc/Dokumentation/Bildungswesen_en_pdfs/secondary.pdf,accesseson 11.10.14).

Montesquieu, Charles, Baronde. 2012. My Thoughts, translated from the French, Online Library of Liberty (URL:http://oll., libertyfund.org/title/2534,accessed on 12.10.14)

Orhangazi, Özgür. 2008. Financialization and capital accumulation of the non-financial corporate sector: A theoritical and empirical investigation on the US economy: 1973-2003, *Cambridge Journal of Economics*, vol.32: 863-886, doi:10.1093/cje/ben009.

Paust, Sebatian. 2014. The german Mittelstand – a model for Asia's emerging economies? 20 June (URL http//www.asiapathways-adbi.org/2014/06/the-german-mittelstan-model-for-asis-emerging-economies/, accessed on 5.9.14)

Rakoff, Jed S. 2014. The financial crisis: Why have no high-level executives been prosecuted?', and 'Reply', *The New York Review of Books*, 9 January and 3 April.

Ray, Mamata. 2004. *Path-dependence in the Lending Behaviour of banks with Special reference to the madras Presidency*, Unpublished PhD thesis, University of Calcutta.

Sanyal, M. K. 2004. *Peasant paddy Production, Indebtness and Dispossession: a study of Bengal districts (1901-41)*, New Delhi: Manak Punblications.

Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*, London: Allen Lane the Penguin Press.

Shleifer, Anderi. 2000. *Inefficient Markets: An Introduction to Behavioural Finance*, Oxford: Oxford University Press.

Sleigh, J. H. 1898. Letter to *The Times of India*, 17 November, asd cited in Bagchi 1997b, pp.44-45.

UN ESCSAP. 2014. *Asia and the Pacific: A Story of Transformation and resurgence: Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 1947-2014*, New York: United Nations (Sales No.E.14.II.f.6).

Wang, Audrey. 2010. Small business make big contribution, *Taiwan Today*, II May (URL: http//www.taiwantoday.tw/fp.asp?Item=127151&CtNode=427, accessed on 11.10.14).



সংকটের দুষ্টচক্রে ছিটমহলের মানুষ

একটি বিনিময়-উত্তর পর্যালোচনা

মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ২০১৫ সাল ছিল নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক স্থলসীমা চুক্তিটি সুদীর্ঘ ৪১ বছর পর ভারতের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন (ratification) লাভ করে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সীমান্ত সমস্যা নিরসন ও ছিটমহল বিনিময়ের মতো বিষয়গুলো ৪১ বছর ধরে ওই অনুসমর্থনের অপেক্ষায় ছিল। বলাবাহুল্য, ছিটমহলে অবরুদ্ধ মানুষদের মুক্তির দাবিতে উভয় দেশে গড়ে ওঠা জনমতের চাপে ছিটমহল বিনিময়কে সামনে রেখেই স্থলসীমা চুক্তি ভারতীয় পার্লামেন্টে অনুসমর্থিত হয়। অবশেষে ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হয়। ফলে প্রায় ৫২ হাজার 'ছিটের লোক'-এর জীবন থেকে ৬৮ বছরের অবরুদ্ধতার অবসান ঘটেছে। মিলেছে রাষ্ট্র ও নাগরিক পরিচয়। মিলেছে জীবনের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা। কিন্তু ছিটমহল বিনিময় হলেও সাবেক ছিটমহলবাসীর জীবন-জীবিকায় রাষ্ট্রহীন সাত দশকের পুঞ্জীভূত কিছু সমস্যার যেমন সমাধান হয়নি, অন্যদিকে ছিটমহল বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় নতুন করে আরও কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে উভয় দেশের বিলুপ্ত ছিটমহলের মানুষদের অনেকেই এখনো নানামুখী সংকটের মুখে। সবচেয়ে বড় কথা কিছু মানুষ এখনো নাগরিকত্বই পায়নি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিলুপ্ত ছিটমহলের মানুষদের জীবন-জীবিকার কিছু সমস্যা ও সংকটকেই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু করা হলো।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

ছিটমহল বিনিময়, বিলুপ্ত ছিটমহলের মানুষ, 'নেই-মানুষ', ভারতে প্রত্যাগমনকারী, 'ছিটমহল শিবির', সংকট, নাগরিকত্ব, শিক্ষা সনদ, জমির মালিকানা, পুনর্বাসন।

ভূমিকা

নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সর্বদাই 'বন্ধুত্বপূর্ণ' থেকেছে। এই দুই দেশের মধ্যে কখনো বড় রকমের কোনো সীমান্ত সংঘর্ষও ঘটেনি। তবুও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক সীমান্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এর মূল কারণ সম্ভবত অবিচ্ছেদ্য এলাকার ওপর দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া র‍্যাডক্লিফ সীমানায় ভারতের বিপজ্জনক কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নির্বিচারে বাংলাদেশি মানুষ হত্যা। কেবল সীমান্ত পারাপারকারীদেরই হত্যা করা হয়নি, হত্যা করা হয়েছে সীমান্তবর্তী কৃষিখেতে কর্মরত অনেক কৃষককেও। বিএসএফের নির্যাতন থেকে বাদ যায়নি শিশু-কিশোরও। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মানুষের ওপর বিএসএফের নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড প্রায় নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ভারতের নদী আগ্রাসনের কারণে এক ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে বাংলাদেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চল। শুকিয়ে যাচ্ছে 'নদীমাতৃক' বাংলাদেশের সব নদ-নদী। একটি দেশ যখন তার ভাটিতে অবস্থিত আরেকটি প্রতিবেশী দেশকে যৌথ (আন্তর্জাতিক) নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে মরুকরণের দিকে ঠেলে দেয় তখন ওই দুই দেশের সম্পর্ক কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ, কতটা প্রতিবেশীসুলভ তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয় বৈকি। তদুপরি ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক আদালতে ভারত-বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। অবিলম্বে তিস্তার পানির ন্যায্য বণ্টনের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক আরও অনেক বেশি দৃঢ় করা সম্ভব।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ২০১৫ সাল ছিল নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক স্থলসীমা চুক্তিটি সুদীর্ঘ ৪১ বছর পর ভারতের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন লাভ করে। বলাবাহুল্য, ছিটমহলে অবরুদ্ধ মানুষদের মুক্তির দাবিতে উভয় দেশে গড়ে ওঠা জনমতের চাপে ছিটমহল বিনিময়কে সামনে রেখেই স্থলসীমা চুক্তি ভারতীয় পার্লামেন্টে অনুসমর্থিত হয়। ২০১৫ সালের ৬ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকালীন ভারত-বাংলাদেশ শীর্ষ বৈঠকে চুয়াত্তরের স্থলসীমা চুক্তি ও ছিটমহল বিনিময় বিষয়ক ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত প্রটোকলের অধীনে ছিটমহল বিনিময় কার্যকরের সিদ্ধান্ত হয় এবং ২০১৫ সালের ৩১ জুলাইকে 'অ্যাপয়েন্টেড ডে' বা নিরূপিত দিন হিসেবে ধার্য করা হয়। ওই দিন মধ্যরাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ১৭ হাজার ১৬০ দশমিক ৬৩ একর আয়তনের ভারতীয় ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশের ভূখণ্ডে

পরিণত হয়। অপরপক্ষে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ৭ হাজার ১১০ দশমিক ২ একর আয়তনের ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল ভারতের ভূখণ্ডে পরিণত হয়। ফলে প্রায় ৫২ হাজার 'ছিটের লোক'-এর জীবন থেকে ৬৮ বছরের অবরুদ্ধতার অবসান ঘটেছে। মিলেছে রাষ্ট্র ও নাগরিক পরিচয়। মিলেছে জীবনের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা। কিন্তু ছিটমহল বিনিময় হলেও সাবেক ছিটমহলবাসীর জীবন-জীবিকায় রাষ্ট্রহীন সাত দশকের পুঞ্জীভূত কিছু সমস্যার যেমন সমাধান হয়নি, অন্যদিকে ছিটমহল বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় নতুন করে আরও কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে উভয় দেশের বিলুপ্ত ছিটমহলের মানুষদের অনেকেই এখনো নানামুখী সংকটের মুখে। সবচেয়ে বড় কথা কিছু মানুষ এখনো নাগরিকত্বই পায়নি।

যারা এখন সত্যিকারের 'নেই-মানুষ'

ছিটমহল বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় উভয় দেশের ছিটমহলের মানুষদের দুই দেশের যেকোনো একটির নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের জুলাই মাসে ছিটমহলগুলোতে যৌথভাবে পরিচালিত জনগণনার সময় যাঁরা তালিকাবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওই সময় থেকে ছিটমহল বিনিময়ের দিন পর্যন্ত যেসব শিশু ছিটমহলগুলোতে জন্মগ্রহণ করেছিল কেবল তারাই সেই সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু উভয় দেশের ছিটমহলের যেসব মানুষ মূলত জীবিকার প্রয়োজনে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করার কারণে সেই সময়ে ছিটমহলে উপস্থিত হতে পারেনি, তারা সেই জনগণনা থেকে বাদ পড়ে যায়। অনেকে জনগণনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর খবর পেয়েছেন। যা-ই হোক, ছিটমহল বিনিময় কার্যকর করার আগে ২০১৫ সালে আরেকটি চূড়ান্ত জরিপ হলেও ২০১১ সালের জনগণনায় নানা কারণে বাদ পড়া মানুষদের আর তালিকাবদ্ধ করা হয়নি। এমতাবস্থায় অনেকে আর তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার কোনো চেষ্টাও করেনি। আবার অনেকে নিজেদের তালিকাভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে অনেক ধরনা দিয়েও সফল হননি। ফলে নানা অনিবার্য কারণে যাঁরা ২০১১ সালের জনগণনা থেকে বাদ পড়েছিলেন তাঁরা চূড়ান্তভাবে উভয় দেশের নাগরিকত্ব থেকেই বঞ্চিত হলেন। বাংলাদেশে এদের অবস্থান আছে কি না, সে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। তবে ভারতের কোনো কোনো স্থানে এঁদের বসবাসের যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ আছে (কেইস ১)। তাঁরা এখন কোনো দেশেরই নাগরিক নন। সত্যিকার অর্থেই তাঁরা এখন 'নেই-মানুষ'-এ পরিণত হয়েছেন। জীবিত থেকেও দুই দেশের কোথাও তাঁরা নেই। তাদের সঠিক সংখ্যাও কারও জানা নেই।

কেইস ১

ভারতীয় ছিটমহল থেকে ছিন্নমূল দিল্লির বস্তিবাসী তসলিমরা এখন কোন দেশের নাগরিক?[১]

তসলিম শেখ। পেশায় রিকশাচালক। বসবাস দিল্লির ওখলার যোগবাই এক্সটেনশনের বস্তিতে। ৩০ বছর আগে কোচবিহারের ছিটমহল (বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ) ছেড়ে পেটের ধান্ধায় চলে এসেছিলেন দিল্লিতে। তারপর থেকে দিল্লিতেই আছেন। বিয়ে করেছেন। হয়েছে সন্তানও। উভয় দেশের ছিটমহলগুলোতে ২০১১ সালে যখন জনগণনা হয়েছিল তখন রুটি-রোজগার ছেড়ে ছিটমহলে গিয়ে হাজির হতে পারেননি। তা ছাড়া তারা চাইলেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ভারতীয় কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ছিটমহলে গিয়ে হাজির হওয়াটা সহজ ছিল না। যেতে হতো ফেলানীর মতো মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে।[২] কিন্তু ছিটমহল বিনিময়ের পর তাঁর জন্মভিটা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছে। তারা এখন বুঝতে পেরেছেন যে ভবিষ্যতে চাইলেও আর ফিরে যেতে পারবেন না নিজের জন্মভিটায়। তসলিমের মতো আরও অনেকে আছেন যাঁরা সেই জনগণনার খবরটুকুও পাননি। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে শুনেছেন। তাই নিজের পরিচয় ঠিক কী, কোন দেশের বাসিন্দা তাঁরা, তা ভেবে কূল পাচ্ছেন না দিল্লির বস্তিবাসী তসলিম, রিয়াজ বা মহম্মদ আসগরেরা। ভারত না বাংলাদেশ, কোন দেশের নাগরিক তাঁরা—এই নিয়ে সংশয়ের মধ্যে এখন তাঁরা কোনোভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন দিল্লির পরিচয়কেই। দীর্ঘদিন দিল্লিতে থাকার ফলে আধার কার্ড (ভারতের জাতীয় পরিচয়পত্র) বা ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছেন অনেকেই। সেটাই আপাতত তাঁদের ভরসা। তবে তাতেও অবশ্য পুলিশের জুলুম কিছু কমেনি। মাঝেমধ্যেই দিল্লি পুলিশের 'বাংলাদেশি সেল' আচমকা হানা দেয় যোগবাই বস্তিতে। ওই বস্তির আরেক বাসিন্দা নিয়াজ বলেন, 'আমাদের আধার কার্ড আছে। বাচ্চারা যারা এখানে জন্মেছে তাদের জন্মসনদও রয়েছে। তবু পুলিশ আমাদের বাংলাদেশি বলে হুজ্জুতি চালায়। স্থানীয় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচয়পত্র দেখানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। কোথা থেকে কীভাবে তা জোগাড় করব কিছুই বুঝতে পারছি না।'

পেটের দায়ে ছিটমহলের বাইরে যাওয়ার দোষেই আজ তাঁদের এই পরিণতি। তাই এ নিয়ে তেমন কোনো অভিযোগও নেই। এই হতভাগ্য মানুষগুলোর কেউ হয়তো 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে পুলিশের হাতে আটক হয়ে সারা জীবন জেলে কাটাবে, কেউ হয়তো 'পুশ ইন' হয়ে বাংলাদেশে আসবে। আবার কেউ হয়তো পুলিশের তাড়া খেয়ে এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে ভেসে বেড়াবে। যত দিন গায়ে-গতরে শক্তি আছে তত দিন কোনো না কোনো কাজ করে পেটের অন্ন জোগাতে পারবে। এভাবে ভাসতে ভাসতে একদিন শেষ হয়ে যাবে জীবনতরি! কেউ তাদের খবর রাখবে না। কারও বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগও নেই। কিন্তু যারা ছিটমহলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেও নাগরিকত্বই পেল না, তাদের কী দোষ?

ছিটমহলে থেকেও যারা নাগরিকত্ব পেল না

ছিটমহল বিনিময়ের লক্ষ্যে ২০১১ সালে উভয় দেশের ছিটমহলগুলোতে জনগণনা হয়েছিল। সে সময় যারা তালিকাভুক্ত হয়েছিল, ২০১৫ সালের চূড়ান্ত সমীক্ষায় কেবল তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ফলে বিবিধ কারণে যারা ২০১১ সালের তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল তারা এখনো নাগরিকত্বহীন রয়ে গেল। ৬৮ বছর পর বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোর প্রায় সবাই যখন নাগরিকত্ব পেল তখন অল্পসংখ্যক মানুষ যারা আবারও নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হলো তাদের মানসিক অবস্থার বয়ান দেওয়া সত্যি অসম্ভব। তবে উদাহরণ হিসেবে কোনো কোনো পরিবারকে উপস্থাপন করা যায়। যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া সাবেক ছিটমহল দাসিয়ারছড়ার বাসিন্দা মো. নবীর উদ্দিনসহ তাঁর পরিবারের ৮ জন ২০১১ সালের জনগণনা থেকে বাদ পড়েন। এ বিষয়ে পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসনের উচ্চপর্যায় থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আছে। কিন্তু এই হতভাগ্য মানুষেরা ঠিক কবে তাদের নাগরিকত্ব পাবে তা কেউ জানে না। অবশ্য বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ও ছিটমহল আন্দোলনের নেতারা তাদের বাড়ির হোল্ডিং নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন। তাই তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎসংযোগও দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকায়ও তাদের নাম উঠেছে। তবু জাতীয় পরিচয়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত তাদের দুশ্চিন্তা কাটবে না। তবে বাংলাদেশে যেহেতু 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী' সংক্রান্ত কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নেই, তাই এই ব্যক্তিরা অন্তত পুলিশি হয়রানির শিকার হবে না তা বলা যায়। কিন্তু ভারতের ছিটমহলে যারা এখনো নাগরিকত্ব পেল না তাদের কী হবে?

ভারতের সাবেক বাংলাদেশি ছিটমহল দক্ষিণ মশালডাঙার দশটি পরিবারের প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ এখনো ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। ২০১১ সালের জনগণনায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ না হওয়ার কারণেই তারা এই সংকটের মুখোমুখি। অথচ ২০১৫ সালে যখন সমীক্ষা হয়েছিল তখনই এই মানুষগুলো তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার আরজি করেছিল। কিন্তু ২০১১ সালের তালিকায় নাম ছিল না বলে প্রশাসন জেনেশুনেই এই মানুষগুলোকে চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক আবেদন-নিবেদন করে এখনো কোনো লাভ হয়নি। ছিটমহল বিনিময়ের পর ওই মানুষগুলোর বিপদ বরং বেড়ে গেছে। কারণ এখন তো আর ছিটমহল নেই যে তারা ছিটমহলের মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে। সেই মানুষগুলোর ভাষা যেহেতু 'বাংলা' তাই সত্যিকার অর্থেই তাদের আতঙ্কের যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতে 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' বিষয়টি একটি বড় রাজনৈতিক ইস্যু। তাই

বাংলাভাষী যে কেউ ভারতের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে না পারলে তাকে 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করার চেষ্ট করা হতে পারে অথবা 'অবৈধ অনুপ্রবেশের' অভিযোগে আটক করা হতে পারে। হতে পারে জেল-জরিমানা। ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া দক্ষিণ মশালডাঙা ছিটমহলের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত মোহাম্মদ তালেব আলী (৬০/২০১৬) এ প্রসঙ্গে বলেন,

> '২০১১ সালে সার্ভে হলো। আমার পরিবারের ৬ জন লোক। সমস্ত লিখে দিলাম। ২০১৫ সালে পুনরায় সার্ভে করার জন্য যখন লোক আসল, তখন তাদের কাছে থাকা ২০১১ সালের তালিকায় দেখলাম আমাদের নাম নেই। সব ছিটমহলের মানুষের নামের তালিকা খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম যে আমার ঘরসহ পরপর দশ ঘরের কোনো নাম ওই তালিকায় নেই। সামনে আছে, পিছে আছে, মাঝখান থেকে আমাদের দশ ঘরের নাম নেই। দক্ষিণ মশালডাঙার মাঝখানের এই দশটি বাড়ির মানুষের নাম ক্যামনে বাদ পড়ে তা এখনো বুঝে উঠতে পারলাম না। আমরা পূর্বপুরুষ থেকেই এই ছিটমহলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেছি। এত বছর পর, এত আন্দোলন-সংগ্রাম করবার পর সবাই যখন নাগরিকত্ব পাইল তখন আমরা বাদ পড়লাম! এই চিন্তায় তখন আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। আমাকে কোচবিহার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তিন দিন হাসপাতালে ছিলাম। তিন দিনে হাসপাতালের বিল হয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। সুস্থ হয়ে আসার পর নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত, ডিএম, এসডিওসহ অনেকের কাছে গেলাম। বহু জায়গায় দরখাস্ত করা হইল, বাদ পড়া দশ ঘরের নাম দেওয়া হইল। খালি কইল হবে হবে। আজ পর্যন্ত হইল না। আজ পর্যন্ত আমার আধার কার্ড হইল না, ভোটার কার্ড হইল না। কিছুই হইল না আমার!'

উল্লেখ্য, এই বিষয়টি নিয়েও শুরু হয়েছে নির্মম ভোটের রাজনীতি। ছিটমহল বিনিময়ের পর ছিটমহল বিনিময় আন্দোলনের শেষ দিককার এক নেতা (যিনি ছিটমহলের বাসিন্দা ছিলেন না) পশ্চিমবঙ্গের ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ছিটমহলের কিছু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। কিন্তু ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার গঠন করে। ফলে স্থানীয় সরকারের সব প্রতিষ্ঠান তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে। এমতাবস্থায় ছিটমহলের কিছু মানুষ বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা ছিটমহলের মানুষদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মনে করছে। যাঁরা এখনো নাগরিকত্ব পাননি তাঁরাও স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীনদের সহযোগিতা পাচ্ছেন না বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কারণেই। তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্তরা এই মানুষগুলোকে ভোটার কার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিজেপির ভোট বাড়িয়ে দিতে আগ্রহী নয় বলেই মাঠ গবেষণায় জানা যায়। এমতাবস্থায় আদৌ তাঁরা নাগরিকত্ব পাবেন কি না, পেলেও কবে পাবেন তা নিয়ে ওই মানুষগুলো ভীষণভাবে শঙ্কিত।

শিক্ষাসনদ-সংক্রান্ত সংকট

ছিটমহল বিনিময়ের পর শিক্ষার সুযোগসংক্রান্ত সংকট কেটে গেলেও আগের শিক্ষাসনদ নিয়ে এক অভূতপূর্ব সংকটে পড়েছে বিলুপ্ত ছিটমহলের মানুষেরা। ছিটমহলের অধিবাসীরা কখনোই শিক্ষার অধিকার পায়নি। কোনো ছিটমহলেই কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে ছিটমহলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য স্বাগতিক দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যেতে হতো। কিন্তু ছিটমহলের পরিচয়ে সেসব স্কুলে তারা ভর্তি হতে পারত না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির একটাই উপায় ছিল। আর তা হলো প্রকৃত পিতা-মাতার পরিচয় গোপন করে স্বাগতিক দেশের কাউকে পিতা-মাতা পরিচয় দেওয়া। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ছিটমহলের মানুষেরা এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বড় ধরনের কোনো ঝামেলা ছাড়াই তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে পারত। মানবিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশে এই বিষয়টি 'ওপেন সিক্রেট'-এ পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ বিষয়টি সবাই জানত কিন্তু কেউ বাধা দিত না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত ছিটমহলের মানুষদের জন্য বিষয়টি সহজ ছিল না। কারণ অনেক বছর আগে থেকেই ভারতে স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে আধার কার্ডের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে আধার কার্ডের আবশ্যকতার পাশাপাশি সেখানে 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' ইস্যু থাকায় ছিটমহলের মানুষদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ভারতের যেসব নাগরিক তাঁদের পরিচয় ব্যবহার করতে দিতেন, তাঁদের জন্যও কাজটি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিটমহলের মানুষদের এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বড় অঙ্কের অর্থ দিতে হতো। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে অন্যকে নিজ সন্তানের পিতা-মাতা পরিচয় দিয়ে সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে হতো। এই ছিল ছিটমহলের মানুষদের বাস্তবতা। পশ্চিমবঙ্গে ছিটমহলের আশপাশের গ্রামগুলোতে এই পরিচয় প্রদানের বিষয়টি প্রায় ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল। ছিটমহল বিনিময়ের পর তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে এখন আর কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ছিটমহল বিনিময়ের আগে যারা প্রকৃত মাতা-পিতার পরিবর্তে অন্য মানুষকে মাতা-পিতা পরিচয় দিয়ে শিক্ষাসনদ অর্জন করেছে, তাদের ভাগ্যে এখন কী ঘটবে?

উভয় দেশের বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে অনেক শিক্ষার্থী আছে, যারা অন্য মানুষকে পিতা-মাতা পরিচয় দিয়ে স্কুল পাস করে বর্তমানে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, তাদের আগের শিক্ষাসনদ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক অভূতপূর্ব সংকট। কারণ ওই সব শিক্ষাসনদে নকল পিতা-মাতার নাম লিপিবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার বিলুপ্ত ছিটমহল ছোট গাড়লঝোড়া-২-এর অধিবাসী বাচ্চু মিয়ার ছেলে বাসার বাদল বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১২ সালে দাখিল পরীক্ষা

পাস করে পরবর্তী সময়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস করেছেন। এখন তাঁর ইচ্ছা প্রকৌশল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করা। কিন্তু তাঁর শিক্ষাসনদে তাঁর জন্মদাতা মাতা-পিতার নাম নেই। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত দাখিল সার্টিফিকেট ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটে বাবার নাম লেখা আছে জাহাঙ্গীর আলম। কারণ জাহাঙ্গীর আলম নামক বাংলাদেশি এক নাগরিককে পিতা পরিচয় দিয়েই বাসার বাদলকে ভর্তি করা হয়েছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না তাঁর। ছিটমহল বিনিময় হওয়ার ফলে বর্তমানে বাসার বাদল ও তাঁর মাতা-পিতা এখন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তাঁদের প্রকৃত নাম-পরিচয় সব জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই বাসার বাদল আর নিজেকে জনৈক জাহাঙ্গীর আলমের পুত্র হিসেবে পরিচয় দিতে পারবেন না। অথচ তাঁর শিক্ষাসনদে পিতা হিসেবে জনৈক জাহাঙ্গীর আলমের নাম লিপিবদ্ধ। এমতাবস্থায় বাসার বাদলের বিশেষ করে সরকারি চাকরি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত পুলিশ ভেরিফিকেশনে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ও শিক্ষাসনদের পরিচয় হুবহু না মিললে চাকরি মিলবে না। ছিটমহল বিনিময়ের পর এখন এই জটিল সংকটে পতিত হয়েছেন বাসার বাদল ও তাঁর পরিবার। সরকারি চাকরি পাওয়ার অনিশ্চয়তা ছাড়াও যে প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি তা হলো, বাসার বাদলকে কেন সারা জীবন মিথ্যা পরিচয় বহন করতে হবে? বাসার বাদল কেন তাঁর শিক্ষাসনদে জন্মদাতা মাতা-পিতার নাম লিপিবদ্ধ করতে পারবেন না?

দুই বাংলার বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোর এমন অনেক শিক্ষার্থী এখন আতঙ্কে আছেন। নানা প্রশ্ন তাঁদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে—তাঁদের ওই সব শিক্ষাসনদ এখন গৃহীত হবে তো? পরিস্থিতির শিকার হয়ে তাঁরা যে মিথ্যা পরিচয়ে এত দিন পড়ালেখা করেছেন সরকার তা সংশোধন করার সুযোগ দেবে তো? ওই সব শিক্ষাসনদ নিয়ে চাকরি পাওয়া যাবে তো? তাঁরা তাঁদের জন্মদাতা মাতা-পিতার নাম তাঁদের কষ্টার্জিত শিক্ষাসনদে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ পাবেন তো? ভারতের সাবেক বাংলাদেশি ছিটমহল দক্ষিণ মশালডাঙার স্নাতক অধ্যয়নরত আজিবর শেখ বলেন,

> নাগরিকত্ব পাওয়ার পরেও আমরা এখন এমন অবস্থায় আছি যে নিজের প্রকৃত বাবা-মাকে বাবা-মা হিসেবে পরিচয় দিতে চাইলে আমাদের শিক্ষাসনদের আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

ওই সব শিক্ষার্থীর আগের শিক্ষাসনদগুলোতে মাতা-পিতার নাম সংশোধনের সুযোগ দিলে শিক্ষাসনদের পাশাপাশি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও সব অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। সর্বোপরি ওই মানুষগুলোকে সারা জীবন মিথ্যা পিতা-মাতার পরিচয় বয়ে বেড়াতে হবে না। অনতিবিলম্বে তাঁদের সেই সুযোগ দেওয়া কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়?

জমির মালিকানা নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

বিনিময়ের পর ছিটমহলের মানুষেরা তাদের জমির মালিকানা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। কারণ তাদের কারও কাছেই ভোগদখলকৃত জমির কোনো দলিলপত্র নেই। জমির মালিকানা-সংক্রান্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা উভয় দেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া সাবেক ছিটমহলগুলোতে মোটামুটিভাবে একই ধরনের। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ভূমিসংক্রান্ত সব রেকর্ড ও নথিপত্র বিনিময়ের লক্ষ্যে প্রশাসনিক পর্যায়ে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে পুরোনো কিছু দলিলপত্র বিনিময় হলেও উভয় পক্ষই পরস্পরকে জানিয়ে দেয় যে ছিটমহলের জমির ব্যক্তিমালিকানা-সংক্রান্ত কোনো নথিপত্র সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ ৬৮ বছরে ছিটমহলের ভূমিসংক্রান্ত সরকারি নথিপত্র যেমন নষ্ট হয়ে গেছে, তেমনি ছিটমহলের মানুষদের ব্যক্তিগত দলিলপত্রও নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে ছিটমহলের জমির মালিকানা নির্ধারণের একমাত্র উপায় ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে। ভূমি অধিদপ্তর কর্তৃক ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে রেকর্ড করার কথা থাকলেও এখনো তার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

ছিটমহল বিনিময়ের অব্যবহিত পরেই উভয় দেশের ছিটমহলগুলোতে জমির মালিকানা নিয়ে হাঙ্গামা শুরু হয়। ছিটমহলের বাইরের স্থানীয় প্রভাবশালীরা ছিটমহলের জমি জবরদখল করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া সাবেক ছিটমহলগুলোতে জমি নিয়ে বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবরও গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হয়। জমিসংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণের জন্যই মূলত বাংলাদেশের সাবেক ছিটমহলগুলোতে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। দাসিয়ারছড়া ছিটমহলের এক যুবক বলেন,

> গরু মরলে শকুনেরা যেমন কাড়াকাড়ি করে, বিনিময়ের পর ছিটের জমি নিয়েও তা-ই হয়েছে।

এমতাবস্থায় স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরেজমিন পরিদর্শন করে ভোগদখলের ভিত্তিতে আপাতত স্থিতাবস্থা বজায় রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।[৩] কিন্তু দীর্ঘ সাত দশকের বঞ্চনা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালীরা ছিটমহলের অসহায় মানুষদের জমিজমা জবরদখল করেছে কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। শুধু দখলি স্বত্বের ভিত্তিতে জমির মালিকানা নির্ধারণের ফলে ছিটমহলের বাইরের মানুষের মালিকানায় চলে যাচ্ছে ছিটমহলের জমির একটি বড় অংশ। অপরপক্ষে ভূমিহীন থেকে যাচ্ছে ছিটমহলের অনেক মানুষ। কারণ স্থানীয় প্রভাবশালীরা ছিটমহলের অনেক জমি ভোগদখল করছেন। ছিটমহলের বাসিন্দারা প্রায় সাত দশক সকল প্রকার প্রশাসনিক ও আইনি সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। এমতাবস্থায় তাদের জমিজমা জবরদখল হওয়া অস্বাভাবিক

ছিল না। ভূমি জরিপের মাধ্যমে এ ধরনের অভিযোগও খতিয়ে দেখা দরকার ছিল, যা করা হয়নি।

ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া ৫১টি ছিটমহলের প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরিবারও তাদের জমির মালিকানা নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। সেখানেও ভূমি প্রশাসন কর্তৃক ভূমি জরিপ হওয়ার কথা। কিন্তু এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। মাঠপর্যায়ে গবেষণার সময় স্থানীয় প্রশাসনের এক কর্মচারীকে দক্ষিণ মশালডাঙার জমির মালিকানাসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। তিনি স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে কোন দাগে কতটুকু জমি এবং তা কার দখলে সে সংক্রান্ত তথ্য সাদা কগজে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু ভূমি জরিপসংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোনো ফরম ব্যবহার করা হয়নি। জমি পরিমাপ করা বা সীমানা চিহ্নিত করার কোনো সরঞ্জামও তাঁর কাছে ছিল না।

দক্ষিণ মশালডাঙার জমির মালিকেরা এ ধরনের জরিপে সন্তুষ্ট তো ননই, বরং তাঁরা শঙ্কিত। অনেকেই এ ধরনের জরিপের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না বলে তাতে সহযোগিতাও করছেন না। যখন ছিটমহল ছিল তখন সেখানে সরকারের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। ফলে ছিটমহলের মানুষেরা তাদের নিজেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী জমি কেনাবেচা ও ভোগদখল করত। কিন্তু ছিটমহলগুলো এখন ভারতের অংশ হওয়ায় জমির প্রকৃত মালিকানা সরকারের হাতে চলে গেছে। ফলে এখন সরকার যাকে জমির মালিকানা বুঝিয়ে দেবে সেই ব্যক্তিই জমির মালিক হবে। ছিটমহল বিনিময়ের পর স্থানীয় প্রভাবশালীদের অনেকেই ছিটমহলের জমির ওপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছে। কয়েকটি ছিটমহলে জমি দখলের ছকও তৈরি হয়েছে।[৪] তাই বিলুপ্ত ছিটমহলের মানুষেরা এত দিন যে জমিটুকু আগলে রাখতে পেরেছিল এখন তা পারবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে আছে। যত দিন পর্যন্ত সরকার তাদের জমির মালিকানা বুঝিয়ে না দেবে তত দিন পর্যন্ত তাদের শঙ্কা কাটবে না। তাই ছিটমহল বিনিময়ের ফলে কী পেলেন—এমন প্রশ্নের উত্তর আসে এভাবে,

> যেমন ছিলাম তেমনই আছি। জমিগুলো নিয়ে বরং অনিশ্চয়তা বেড়েছে।[৫]

বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রত্যাগমনকারীদের জীবনে সংকটের নতুন অধ্যায়

ছিটমহল বিনিময়ের সময় বাংলাদেশের সাবেক ভারতীয় ছিটমহলগুলো থেকে যে ৯৭৯ জন মানুষ ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছে, তাদের একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করেছে যে তারা ভারতে গিয়ে ভুল করেছে কি না। অথচ নাগরিকত্ব নিয়ে সে দেশে প্রবেশের সময় সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। অনেক স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য

সরকার উভয়ের পক্ষ থেকে। এটাই হয়তো দক্ষিণ এশিয়ার বিস্মৃতির সংস্কৃতি। কোনো কিছু নিয়ে যখন জোয়ার ওঠে তখন অনেক প্রতিশ্রুতি আসে, অনেক শুভেচ্ছাবাণী আসে। কিন্তু জোয়ার থেমে গেলে সবাই সবকিছু ভুলে যায়। ছিটমহল বিনিময়ের আগে-পরে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা মানুষদের পুনর্বাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। নগদ টাকা, পাকা বাড়ি, কর্মসংস্থান, ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের সুনিশ্চিত ব্যবস্থাসহ নানা লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ওই সব প্রতিশ্রুতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েই অনেকে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন তাদের অভিযোগ, ছিটমহল বিনিময়ের আগে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যেসব আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, গত দেড় বছরে তার কোনো কিছুই তারা পায়নি।

অস্থায়ী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন

কোচবিহারের দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়িতে তিনটি অস্থায়ী 'ছিটমহল শিবির' করে, ছোট ছোট টিনের চালাঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে যে অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছে সাবেক ছিটমহলে তারা তার চেয়ে অনেক ভালো ছিল বলে অনেকে দাবি করে। পশ্চিমবঙ্গেও কোচবিহার জেলার দিনহাটার কৃষিমেলা ছিটমহল শিবিরে গিয়ে জানা যায়, ১৪×১২ ফুট আয়তনের যেসব টিনের চালাঘরে তাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে তা তাদের গরম বা শীত কোনোটি থেকেই সুরক্ষা দেয় না। গরমকালে ওই সব ঘরে টিকা যায় না। বিদ্যুৎসংযোগও দেওয়া হয়নি। বৈদ্যুতিক পাখাবিহীন ওই চালাঘরগুলোতে গরমকালে গাদাগাদি করে বসবাস করা কতটা কষ্টদায়ক তা সহজেই অনুমান করা যায়। উল্লেখ্য, গাছপালার প্রাকৃতিক ছায়াও নেই সেখানে। গত শীত মৌসুমে শীতের প্রচণ্ডতায় এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয় দিনহাটা ক্যাম্পে। ক্যাম্পের তিনটি স্থানে সবার জন্য রয়েছে কয়েকটি গণল্যাট্রিন। আছে কয়েকটি গণটিউবওয়েল, যেখান থেকে সবাই খাওয়ার পানি সংগ্রহ করে। সার্বিক বিবেচনায় রীতিমতো মানবেতর জীবন যাপনই করতে হচ্ছে তাদের।

তাদের যে পরিমাণ রেশন দেওয়া হয় তা দিয়ে কোনো পরিবারেরই খাদ্যচাহিদা পূরণ হয় না। অন্যদিকে কারোরই রোজগারের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। তাই বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়ার সময় গবাদিপশু, জিনিসপত্র ইত্যাদি বিক্রি করে যেটুকু টাকাপয়সা হাতে করে নিয়ে যেতে পেরেছিল, তা খরচ করেই এত দিন সংসার চালিয়েছে। এখন হাতের টাকাপয়সাও শেষ হয়ে গেছে। তাই আগামী দিনগুলোতে কীভাবে পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ চালাবে তা নিয়ে শঙ্কার মধ্যে

আছে ছিটমহল শিবিরে বসবাসকারী মানুষেরা। প্রত্যেক পরিবার থেকে অন্তত একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনো তার কোনো কিছু হয়নি। প্রতি পরিবারকে একটি করে ১০০ দিনের (বছরে) কর্মসংস্থান কার্ড দেওয়া হয়েছে মাত্র। পরিবারের সদস্যসংখ্যা যা-ই হোক, পরিবারপ্রতি কার্ড একটাই। ওই কার্ডের অধীনে দিনপ্রতি কাজের বিনিময়ে ১৭৪ টাকা পাওয়া যায়। পূর্বতন ভারতীয় ছিটমহল দহলা খাগড়াবাড়ী থেকে যাওয়া হলদিবাড়ি শিবিরে বসবাসকারী লক্ষ্মীবর্মণ বলেন,

> ওখানে সাজানো সংসার নষ্ট করে দিয়ে চলে এলাম। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কিছুই তো পেলাম না এখন পর্যন্ত। সরকার যদি কিছু না দিতে পারে তাহলে ফেরত পাঠিয়ে দিক আমাদের।[৬]

লক্ষ্মীবর্মণের কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় হলদিবাড়ী শিবিরের হরি বর্মণ, সন্তোষ রায় এবং দিনহাটা শিবিরের মুহম্মদ উমর ফারুক, কাচুয়া বর্মণ এবং আরও অনেকের সুরে। তাঁদের একই কথা, ভারত সরকার যতি প্রতিশ্রুতি পালন না করতে পারে তাহলে যেন ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশে। কিন্তু তাঁদের তো এত দিনে বুঝে ফেলার কথা যে, জাতিরাষ্ট্রের কুৎসিত চরিত্র তাঁদের আর সেই সুযোগ দেবে না।

স্থায়ী পুনর্বাসনের অগ্রগতি নেই

বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া সাবেক ছিটমহলের মানুষদের স্থায়ী পুনর্বাসনের যে পরিকল্পনা ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল গত প্রায় দুই বছরেও তা বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ সর্বাধিক দুই বছরের জন্যই ওই মানুষগুলোকে অস্থায়ী শিবিরে রাখার কথা ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে চারতলা বিল্ডিং নির্মাণ করে এক একটি বিল্ডিং-এ ১৬টি করে পরিবারকে একসঙ্গে আবাসনের ব্যবস্থা করার কথা ছিল।[৭] স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সংকটের কথা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। আসলে সমস্যাটি জমির নয়, সমস্যাটি রাজনৈতিক। পশ্চিমবঙ্গের বিগত বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করে টাটা কোম্পানিকে দেওয়ার উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেই প্রথমবারের মতো ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্র সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার। একই কারণে তিনি ছিটমহল বিনিময়ের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে রাজ্যের এক ইঞ্চি জায়গাও তিনি বাংলাদেশকে ছাড়বেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জমিতত্ত্বের কারণেই তাঁর সরকারের পক্ষে জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সাবেক ছিটমহলগুলো থেকে যাওয়া মাত্র ৯৭৯ জন মানুষকে

পুনর্বাসনের জন্য জমি অধিগ্রহণের দরকার আছে বলেও মনে হয় না। স্থানীয়ভাবে সরকারের খাসজমি খুঁজে বের করেই তাদের পুনর্বাসন করা সম্ভব বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। বিভিন্ন ব্যক্তিও ভারতে যাওয়া মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য জমি দান করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। ভারতে প্রত্যাগমনকারীদের পুনর্বাসনের জন্য ভারতের সাবেক বাংলাদেশি ছিটমহলের ১৬১ জন ব্যক্তি ১৫.৭ একর জমি নিঃশর্তে দান করার ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৮] তাদের জমি গ্রহণেরও কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অর্থাৎ তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন বিষয়ের এখনো কোনো অগ্রগতি হয়নি।

শেষ কথা

বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া ছিটমহলগুলোতে দ্রুতগতিতে যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে তা সত্যি প্রশংসার দাবিদার। এখন বাংলাদেশ সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত বিলুপ্ত ছিটমহলের মানুষদের কর্মসংস্থানের প্রতি। বিশেষ করে যেসব শিক্ষিত যুবক অভূতপূর্ব এক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা উচিত। অন্যথায় প্রায় সাত দশক রাষ্ট্রহীন থাকা ওই মানুষগুলোর প্রতি সুবিচার করা যাবে না। বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোর ঘরে ঘরে বিদ্যুতায়ন, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র ও তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্র থেকে স্থানীয় প্রশাসন পর্যন্ত যে আন্তরিক তৎপরতা দেখা গেছে তা অনেকের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া ছিটমহলগুলোর মানুষেরা ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ড পেয়েছেন মাত্র। সেগুলোতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। আর সত্যিকার অর্থেই সংকটের এক নতুন অধ্যায়ে পতিত হয়েছে ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া সাবেক ছিটমহলের মানুষেরা। যে অস্থায়ী শিবিরগুলোতে তাদের রাখা হয়েছে, স্থানীয়দের কাছে সেগুলো ইতিমধ্যেই 'ছিটমহল শিবির' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অর্থাৎ 'ছিটমহল' পরিচয়টি যেন তাদের জীবন থেকে ঘোচার নয়। এক প্রকার তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা 'ছিটমহল শিবির' নামক খাঁচায় বন্দী, ইতিমধ্যেই 'রেশনভোগী' হিসেবে নিন্দনীয়ভাবে পরিচিত সেই মানুষগুলোকে উৎসুক অনেকেই দেখতে যায়। কবে তাদের এই খাঁচায় বন্দী জীবন শেষ হবে, কবে তাদের পরিচয় থেকে 'ছিটমহল' শব্দটি দূর হবে, কবে তাদের নিজেদের স্বাভাবিক ঘরবাড়ি হবে—এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর তাদের কারও জানা নেই। ভারতের কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যকার বিরোধ

রাজপথ থেকে গলি পর্যন্ত দৃশ্যমান। এমতাবস্থায়, এই মানুষদের সার্বিক পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যে সমন্বিত উদ্যোগ দরকার তার কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই। উপরন্তু তাদের পাল্টাপাল্টি ভোটের রাজনীতির শিকার ওই মানুষেরা। প্রতিশ্রুত পুনর্বাসনের অর্থ নিয়ে ইতিমধ্যেই দুর্নীতি ও রাজনীতি উভয়ই শুরু হয়ে গেছে, যা আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত থাকাটাই স্বাভাবিক। আর তার মধ্য দিয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিত ওই মানুষগুলোর দুর্ভোগ ও বঞ্চনা আরও দীর্ঘায়িত হবে—এমনটাই আশঙ্কা, যদিও তা কাম্য নয়।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

১. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৬ আগস্ট, ২০১৫ থেকে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত।

২. **ফেলানী ট্র্যাজেডি :** ১৫ বছর বয়সের একটি মেয়ে। নাম ফেলানী। সে তার বাবার সাথে 'অবৈধ'ভাবে ভারতের নয়াদিল্লি পাড়ি জমিয়েছিল সেখানকার ইটভাটায় কাজ করার জন্য। সেখানে কয়েক মাস কাজ করার পর, বাবা নুরু মিয়া মেয়ের জন্য একটি বিবাহ ঠিক করেন। বিবাহ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে মেয়েকে নিয়ে নুরু মিয়া দেশে ফিরছিলেন। ২০১১ সালের ১৭ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে বাবা ও মেয়ে বাংলাদেশের ফুলবাড়ী উপজেলার 'কিতাবের কুঠি অনন্তপুর' সীমান্ত দিয়ে একটি বাঁশের মই ব্যবহার করে ভারতের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিলেন। নুরু মিয়া প্রথমে বেড়া পার হন। কিন্তু ফেলানী মই বেয়ে বেড়া ডিঙানোর সময় সীমান্তবেড়ার কাঁটাতারের সঙ্গে তাঁর পরনের কাপড় আটকে যায়। ফলে সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। তার চিৎকার শুনে টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় নুরু মিয়াকে তাঁর প্রিয় কন্যার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে নীরবে। এই হত্যাকাণ্ডের পর ফেলানীর মৃতদেহ দীর্ঘ সময় ধরে সেই কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলছিল!

৩. সাক্ষাৎকার, নবী নেওয়াজ, উপকমিশনার (ভূমি), ফুলবাড়ী, লালমনিরহাট।

৪. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

৬. 'ভারতে এসে কি ভুল করলাম?' *বিবিসি বাংলা*, কলকাতা, ১ আগস্ট ২০১৬।

৭. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ জুন, ২০১৫।

৮. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১০ জুন, ২০১৫।



বিশ্বায়ন : বিতর্কিত এক ভুবন

বদরুল আলম খান

There are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen **—Lenin**

সারসংক্ষেপ

'বিশ্বায়ন—এক বিতর্কিত ভুবন' নামে এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হলো বিশ্বব্যাপী সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছে, তার চরিত্র বিশ্লেষণ করা। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই যোগাযোগ নানা মাত্রায় গড়ে উঠলেও সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার পতনের পর থেকে সেটি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই যোগাযোগে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্র, বহুজাতিক করপোরেশন এবং আমেরিকার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ওয়াশিংটন সমঝোতার (Washington Consensus) সঙ্গে যুক্ত চারটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রসারে যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাশক্তিগত ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখতে তাদের বিশেষ অবদান রয়েছে। বিশ্বায়নের নামে মানুষ, রাষ্ট্র, সমাজ ও জাতিকে একীভূত করে বিশ্ব পুঁজি নতুন নতুন ক্ষমতাকাঠামোর জন্ম দিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে পুঁজির ক্ষমতাবলয়ে পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কেবল অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হচ্ছে তা-ই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে সামাজিক অস্থিরতা, আত্মপরিচয়ের সংকট, ধর্মীয় উগ্রপন্থার অসীম বিস্তার, স্থানীয় সংস্কৃতির উচ্ছেদ। বিশ্বায়নের অনুষঙ্গ হিসেবে এগুলোর ওপর আলোকপাত করা এ প্রবন্ধের আরও একটি উদ্দেশ্য।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বিশ্বায়ন, আত্মপরিচয়ের সংকট, ওয়াশিংটন সমঝোতা, আন্তর্জাতিক পুঁজি, সংস্কৃতির উচ্ছেদ, ক্ষমতাকাঠামো, নিও লিবারেল অর্থনীতি, টার্বো ক্যাপিটালিজম (Turbo Capitalism), ক্যাপিটালিজম অব নাথিং, মৃদু সর্বত্যাগবাদী (Gentle Nihilism) মনোভাব।

ভূমিকা

বেশ কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী আমরা এক অদ্ভুত প্রবাহ লক্ষ করছি। সেই প্রবাহ মহাপ্রলয়ের মতো দেশ, অঞ্চল, জাতি ও রাষ্ট্রকে গ্রাস করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিগত বিশ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করে এই প্রবাহকে দেখার সুযোগ পেয়েছি খুব কাছ থেকে। চোখের সামনেই দেখতে পেয়েছি 'ডাউন আন্ডার' নামে পরিচিত এই দেশের সবচেয়ে জনবসতিপূর্ণ ওই শহর বিগত দুই দশকের মধ্যে কীভাবে বদলে গেল। যে নিভৃত আঞ্চলিকতা তার গায়ে এককালে সেঁটে ছিল, সেই জীবনকে ঝেড়ে ফেলে সে আবির্ভূত হচ্ছে নতুন এক রূপে। তার কপালে বিশ্ব শহরের তিলক। নানা বর্ণ, জাতি, আকার ও প্রকৃতির মানুষ এখানে বাস করে। এমনকি আয়তনে ক্ষুদ্র, দরিদ্র এবং বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বের পরিমাপে নগণ্য হয়েও টুকরো টুকরো বাংলাদেশ এই শহরেরই আনাচকানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। স্বদেশের স্বাগতিক এই উপস্থিতি এককালে দুষ্প্রাপ্য থাকলেও আজ পরিস্থিতি বদলে গেছে। দেশীয় রকমারি দ্রব্যের সঙ্গে এখানকার সুপারমার্কেটে হোঁচট খাওয়াটা আজ বলা চলে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পোশাকশিল্পের সঙ্গে ইলিশ, মুগ, মসুর, সরিষার তেল, দেশে তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, চানাচুর, মসলার অভাব নেই। দৈনন্দিন জীবনের রকমারি অপরিহার্য দ্রব্যগুলোও আজ প্রবাসী বাঙালির হাতের পূর্ণ নাগালে। এই শহরের আনাচকানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো আরও গজিয়ে উঠেছে বাঙালি রেস্তোরাঁ, দোকানপাট। ট্যাক্সি ভ্রমণে বাংলাদেশি ড্রাইভারের সাক্ষাৎও বিরল নয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও রয়েছে বাঙালির সরব উপস্থিতি। হাজার হাজার স্বদেশি শিক্ষার্থী এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া করে। আর উপরিপাওনা হিসেবে বাংলাদেশকে জানেন, চেনেন বা তার দৈনন্দিন জীবনের খোঁজখবর রাখেন, এমন অস্ট্রেলীয় নাগরিকের সংখ্যাও যৎসামান্য নয়। বস্তুত সে সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমাদের ইদানীংকালীন সাফল্যের কল্যাণে।

এই চিত্রপটের উল্টো আরও একটি দিক আছে। রোমাঞ্চের দিক থেকে সেটি কম গুরুত্বের নয়। কথাটি তো কোনো অত্যুক্তি নয় যে বাংলাদেশে বসে বিদেশের অভাববোধ আজ বড় একটা হয় না। রাজধানী ঢাকা শহরের বিলাসী সুপারমার্কেট তার সাক্ষাৎ প্রমাণ। সেখানে বিদেশি দ্রব্যের প্রচণ্ড প্রতাপে বাংলাদেশের ঘরকনে, গিন্নি এবং আপামর বাঙালির হৃদয় ক্রমাগত সিক্ত হচ্ছে। পরিমাণগত দিক থেকে এই আসক্তির প্রতাপ এতই গভীর যে দূর অতীতের ব্রিটিশ বা পাকিস্তানি আমলের অধীনস্থ মানসিকতাকেও মলিন করে দেয়। যে আনুগত্য পুরোনো ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতি এককালে আমরা দেখিয়েছি, এই নতুন আনুগত্য তার চেয়েও ভয়ংকর, যেহেতু এবার তার প্রভাববলয়ে যারা অন্তর্ভুক্ত তারা সাধারণ মধ্যবিত্তের

বিশাল এক বাহিনী—কেবল সৌভাগ্যবান এবং মুষ্টিমেয় বিত্তবান শ্রেণি নয়। আরও রয়েছে মূল্যবান, বিলাসী এবং এককালে নাগালের বাইরে থাকা দ্রব্যের বিপুল ভান্ডার। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এদের অনেকে এতই পরাক্রমশালী যে পশ্চিমা বিশ্বের বিত্তশালীদের দলে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। ইন্দ্রিয়সুখ নিবারণের যাবতীয় উপাদানে ভরপুর এসব বিদেশি ভান্ডার এদের জন্য আজ উন্মুক্ত। ম্যাকডোনাল্ডস, কেএফসি, পিৎজা হাট—আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতার নির্ভুল সব প্রতীক বাংলার মাটিতে বেসাতি বসিয়ে বিদেশের খণ্ড খণ্ড কিন্তু নিঃসন্দেহে ঘনীভূত উপস্থিতিকে নিশ্চিত করছে। বিদেশি পণ্যের বাঙালীকরণের সাম্প্রতিক এই ধারা অনেকটা অজান্তেই স্থান করে নিচ্ছে আমাদের মানসিকতায়। ইংরেজি শিক্ষার বাধাহীন বিস্তার, বিদেশি স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার তীব্র বাসনা, পোশাক-পরিচ্ছদে বিদেশি ছাপ, বাংলা কথোপকথনে ইংরেজি শব্দের উদার প্রয়োগ, উচ্চারণভঙ্গিমায় ইংরেজির দ্বারস্থ হওয়া—এসবই বাঙালির সমষ্টিবদ্ধ জীবনে যোগ করছে নতুন মাত্রা। ফলে কোনটি স্বদেশ আর কোনটি বিদেশ, কাকে দেশপ্রেম বলব আর কার গলায় ঝুলিয়ে দেব দেশত্যাগী 'বিশ্বাসঘাতক'-এর সংজ্ঞা, সেই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বে আজ জর্জরিত হচ্ছি আমরা সবাই।

কেবল সিডনি বা ঢাকা শহরকেই বা বলি কেন। প্রবণতাটি যে সীমিত বা স্থানীয় গণ্ডি পেরিয়ে আজ বিশ্বপ্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর প্রতিটি শহর, দেশ, জাতি কোনো না কোনোভাবে এই অবিশ্বাস্য দ্বিমুখী প্রবণতায় প্রভাবিত হচ্ছে। আর সে কারণে এককালের সনাতনী রূপকে আগলে রাখা সম্ভব হচ্ছে না কারও পক্ষে। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বদলে যাচ্ছে। এত কিছু ঘটে চলেছে অথচ প্রবণতাটি কেন জানি আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে তেমন আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়নি। কেন হয়নি তার সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা থাকলে সান্ত্বনার ব্যাপার ছিল। কিন্তু যেসব বিজ্ঞান থেকে আমরা জ্ঞান লাভ করি, তারা এ ক্ষেত্রে কেন কোনো সহায়ক ইতিবাচক ভূমিকা রাখল না, সে প্রশ্ন গুরুত্বের বিচারে সামান্য নয়। সমাজবিজ্ঞানের কথা ধরা যায়। বহুদিন ধরে তাঁরা স্থানীয় সমাজ নিয়ে আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে, নিজেরা ভেবেছেন। জোর দিয়েছেন স্থানীয় সমাজের মূল্যবোধের ওপর। তত্ত্ব গড়েছেন কীভাবে সমাজকে স্থিতিশীল রাখা যায়। কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সমাজদেহে যেসব পরিবর্তন অন্তঃস্রোতের মতো বয়ে চলেছে তার কোনো খবর রাখা হয়নি। ওই একই অভিযোগ রয়েছে নৃবিজ্ঞানী সমাজের প্রতি। তারাও খণ্ডিতভাবে জাতি, রাষ্ট্র বা স্থানীয়তার ওপর জোর দিতে গিয়ে স্থানীয় জীবন, সংস্কৃতি ও ভাষার বৈচিত্র্যের মধ্যে জ্ঞানচর্চাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে—বৈশ্বিক প্রভাবকে অনেকটা উপেক্ষা করে। সব মিলিয়ে বিশ্বায়ন শব্দটি আমাদের ধ্যানে

কখনো গবেষণাযোগ্য বিষয় হিসেবে স্থান করে নেয়নি। তবে আশার কথা, বিষয়টি ধীরে ধীরে আমাদের নজরে আসতে শুরু করেছে। হতে পারে বাংলাদেশ যেভাবে বিশ্বায়ন-প্রবাহে ভেসে চলছে, সেটি আজ কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। বিশ্বায়ন তো কেবল পোশাকশিল্পসহ সীমিত কিছু অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডেই দৃশ্যমান নয়। তার প্রভাব আজ লক্ষ করছি নানা ক্ষেত্রে। সেই প্রভাবে আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের আদর্শের জগৎ, আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষ্টির বলয়—জীবনের আরও নানা দিক। ফলে বিশ্বায়নকে উপেক্ষা করার দিন শেষ। প্রয়োজন তাকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া।

বিশ্বায়নকেন্দ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। একটি তার শুরু নিয়ে। অনেকে মনে করেন যে সেটি অতি সাম্প্রতিক সময় থেকে ধরা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বলতে তাঁরা বোঝেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন থেকে। যেসব কারণে বিশ্বায়ন আজ এত গতিশীল, সেগুলো ওই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের সময় থেকে লক্ষ করা গেছে। বস্তুত ওই সময় থেকে পৃথিবী অনেক বেশি উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। নানা দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবাধ বাণিজ্য এবং পণ্য চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যোগাযোগব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন এসে দূর হয়েছে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা। ফলে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় পৃথিবীর রূপ আজ অনেক বেশি খোলামেলা। বিশ্বায়নের কৃতিত্ব সে কারণে যদি কাউকে দিতে হয় তাহলে সেটি ওই ১৯৯১ সালকে। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে অযৌক্তিক বলছি না। কিন্তু একেবারে সাম্প্রতিক সময় থেকে তাকে দেখা আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে না। সমাজবিজ্ঞানের প্রখ্যাত তাত্ত্বিক সি রাইট মিলস কী লিখেছিলেন সেটি তো আমরা জানি। যেকোনো সামাজিক ইস্যুকে তিনি বিশ্লেষণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন চারটি দিকের প্রতি মনোযোগী হয়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্যাকে দেখা ছিল তার মধ্যে প্রধান। সে কারণে বিশ্বায়নের ভ্রূণ যদি খুঁজতে হয়, তাহলে ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করা ঠিক হবে। সেই ভ্রূণ গভীর অতীতে নিহিত। যত সীমিত আকারেই হোক না কেন, আরও গভীর অতীতে গিয়ে তাকে বুঝতে হবে।

এ তো গেল পদ্ধতিগত দিক। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে বিশ্বায়নের কাঠামোগত দিককে। অনেকে ভাবেন বিশ্বায়ন মানেই আমেরিকাকরণ। সেভাবে বিশ্বায়নকে বলা হয় ম্যাকডোনাল্ডকরণ, কোকাকোলাকরণ বা হলিউডকরণ। মেনে নিচ্ছি আমেরিকার অবদান মুখ্য। কিন্তু তাই বলে অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের কোনো ভূমিকা নেই, সেটি ভাবা ভুল। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশ নানাভাবে বিশ্বায়নকে এগিয়ে নিয়েছে। বস্তুত কার অবদান কতটুকু সেটি নির্ভর করেছে ওই সব দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের মাত্রার ওপর। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে

কে কার থেকে কতটুকু এগিয়ে ছিল। হয়তোবা এই কারণে বিশ্বায়নের সুফল সব দেশ বা অঞ্চল সমানভাবে ভোগ করেনি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ দুর্বল দেশকে শোষণ করেছে। বিশ্বায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে তারাই রেখেছে সবচেয়ে বড় ভূমিকা। যারা বিশ্বায়নের কড়া সমর্থক, তারা অসাম্যের এই অন্তর্নিহিত দিকটি উপেক্ষা করে থাকেন। বিশ্বপুঁজির বিরুদ্ধে সমালোচনাকে বেশ সুচতুরভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষেও অসাম্যের চিত্রটি বুঝে ওঠা কঠিন। কারণ পুঁজি এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন আজ জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। একই পণ্যের বিভিন্ন অংশ উৎপাদিত হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। ফলে শোষণের দায়ভার কার ওপর পড়বে তা নিয়ে দ্বিধা আছে। শোষণকে হয় পুরোপুরি অস্বীকার করা হচ্ছে অথবা তার দায়ভার কে নেবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়া যাচ্ছে না। এই অসমতার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি কয়েকটি পর্যায়ে—আঞ্চলিক, আন্তদেশীয় ও অন্তর্দেশীয়। ফলে ক্ষমতা ও সম্পদের অসম বিতরণের এই দিকটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। উদ্ভূত এই অসাম্যের সঙ্গে আরও যোগ হচ্ছে আমাদের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ধর্ম, দীর্ঘদিন ধরে লালিত এবং ধারণ করা মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের জগৎ। সংকটের কালো মেঘ এগুলোকেও আচ্ছন্ন করছে। ফলে বিশ্বায়নের প্রভাবকে দেখতে হবে বহুমাত্রিক, বহুস্তরবিশিষ্ট, বহুকেন্দ্রিক এবং বৈষম্যপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে।

বিশ্বায়নের অন্য দিক হচ্ছে কঠোর শ্রেণিবিভক্তি। ওই শ্রেণিবিভক্তির কারণে ক্ষমতা ও সম্পদের ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে প্রবল অসমতা। তা নিয়ে মানুষের মনে ক্ষোভ আছে। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশের নির্ভরযোগ্য এবং সৎ বাহক খুঁজে পাওয়া কঠিন। পশ্চিমা বিশ্বে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উত্থান, দেশকেন্দ্রিক ভাবনা এবং জনসন্তুষ্টিপ্রবণ রাজনীতির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার একটি কারণ এই বিশ্বায়নবিরোধী অনুভূতি। ব্রেক্সিট একটি উদাহরণ হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান অথবা সার্বিকভাবে ডানপন্থী রাজনীতির নবায়িত প্রভাব আমাদের হতভম্ব করলেও তাকে বিশ্বায়নবিরোধী উচ্ছ্বাস হিসেবেই ভাবতে হয়। সংঘাত কেবল উত্তর ও দক্ষিণের (ধনী দেশ ও গরিব দেশ) মধ্যে সীমাবদ্ধ—এ ভাবনাকে বাদ দিতে হবে। প্রতিটি দেশে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশ্বায়নবিরোধী অনুভূতি আগামী দিনগুলোতে কীভাবে প্রকাশ পাবে তার সঠিক চিত্র তুলে ধরা কঠিন। কিন্তু বিষয়টি যেন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।

বিশ্বায়ন আসলে কী?

বিশ্বায়নকে বোঝা যতটা সহজ মনে হয় ততটা সহজ না। একটি সমস্যা হচ্ছে আমরা নানা পেশার মানুষ। নানা দিক থেকে বিশ্বায়নকে দেখি। তবে সহজ একটি

সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করা যায়। বিশ্বায়নকে বলতে পারি স্থান ও কালের সংকোচন (রবার্টসন ১৯৯৬ : ৯)। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল অবশ্য এই সংজ্ঞায় সন্তুষ্ট হবে না। তারা বলবে, 'এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পণ্য, সেবা ও পুঁজিবাজারের একাঙ্গীকরণ ঘটায়। এই একাঙ্গীকরণ কয়েক দশক ধরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য ও মুদ্রা চলাচলের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল—সে প্রত্যন্ত আর কেন্দ্রীয় হোক, এই একাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে' (হেল্ড, ২০০৪ : ২৫)। প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড হেল্ড বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দিয়েছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি বলছেন, বিশ্বায়ন হচ্ছে দূরের জনগোষ্ঠী একে অপরের সঙ্গে যেভাবে সংযুক্ত হয়েছে, যেভাবে নানা প্রতিষ্ঠান সেই সংযোগকে সফল করে তুলছে, যে ধরনের পরিবর্তন ওই সংগঠনগুলোতে লক্ষ করা যাচ্ছে এবং যেভাবে গোটা বিশ্বে ক্ষমতার বিশেষ ধরন ছড়িয়ে পড়ছে তারই একটি চিত্র মাত্র (হেল্ড, ২০০৪ : ১)। হেল্ড স্বভাবতই জোর দিচ্ছেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর, ক্ষমতাকাঠামোর ওপর। সেই প্রক্রিয়ায় এমন একধরনের বিশ্বরাজনীতি গড়ে উঠছে, যেখানে নাগরিক হিসেবে আমাদের আনুগত্য রাষ্ট্রের চেয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রতি অনেক বেশি। রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংকুচিত হচ্ছে। তার পাশাপাশি নাগরিক সমাজ নানাভাবে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

এই দুই সংজ্ঞাকে মিলিয়ে দেখলে বিশ্বায়নের সার্বিক চিত্র আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেটি বস্তুত পুরোনো পুঁজিবাদের এক নতুন স্তরমাত্র, তাতে সন্দেহ নেই। প্রায় ১৫০ বছর আগে কার্ল মার্ক্স এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'প্রতিটি দেশে বুর্জোয়া শ্রেণির মূল লক্ষ্য বিশ্ববাজারের শোষণ। সেই উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া শ্রেণি উৎপাদন এবং পণ্য ভোগকে সর্বজনীন করে গড়ে তুলতে চায়। একটিমাত্র দেশে উৎপাদন যে ধরনের সনাতনী চাহিদা পূরণ করত তার বদলে নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা পুঁজিবাদের দেহের মধ্যে রয়ে গেছে। স্বনির্ভরতা এবং দেশীয় বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আমরা লক্ষ করি নানা ধরনের লেনদেন এবং বিশ্বজনীন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা' (মার্ক্স ও এঙ্গেলস, ২০০৭ : ১৯)। বিশ্বায়নের এই চরিত্র এবং তার অন্তর্নিহিত প্রবণতা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান যখন ক্ষমতায় এলেন তখন আরও তীব্র হলো। বাজারের হাতে তিনি সবকিছু ছেড়ে দিলেন। জর্জ বুশও অর্থনীতিকে বাজারভিত্তিক নিও লিবারেল ধারায় নিয়ে বিশ্বায়নকে বেগবান করলেন। নিজের প্রভাব এবং অর্থনৈতিক পেশিশক্তি ব্যবহার করে উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশকেও এই ধাঁচের সমাজ গড়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। তাতে সহায়তা করল বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক

মুদ্রা তহবিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা। এরই নাম দেওয়া হলো কাঠামোগত অ্যাডজাস্টমেন্ট। ওই নাম ব্যবহার করে বহুজাতিক করপোরেশনগুলো অবাধ বিনিয়োগের সুযোগ পেল দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

ওয়াল্লেস্টাইন নামে একজন আমেরিকান তাত্ত্বিক বিশ্বায়নের এই দিকটি লক্ষ করেছিলেন। তাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বেশ ভালো করেই বুঝেছিলেন কীভাবে পুঁজি একদিকে যেমন একক/অভিন্ন বিশ্ব অর্থনীতির জন্ম দিচ্ছে, অন্যদিকে সব ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে ধ্বংস করছে। সেই পথে পুঁজিবাদকে তিনটি পর্যায় পার হতে হয়েছে। সেগুলোর প্রতিটিকে তিনি 'ব্যবস্থা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি ছিল ক্ষুদ্র (মিনি) ব্যবস্থা। মিনি বলার কারণ ওই ব্যবস্থা অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সেই ব্যবস্থা আজ কোথাও টিকে নেই। পরবর্তী সময়ে সেটি নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে জন্ম নিল বড় আকারের সাম্রাজ্যের। তৃতীয় ব্যবস্থা যখন জন্ম নিল তখন পুঁজিবাদ বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হতে চলেছে। সেখানে পণ্য আমদানি-রপ্তানি প্রথম পর্যায়ে প্রাধান্য পেলেও পরবর্তী সময়ে পণ্য উৎপাদন ওই অর্থনীতিতে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। লাভের আশায় পণ্য উৎপাদন করা এবং সেগুলো বাজারজাত করা—এভাবে জন্ম নেয় বাজারকেন্দ্রিক বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বেশ ভঙ্গুর ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জন্ম নিলেও তাদের মধ্যে লক্ষ করা গেছে প্রবল প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় মাত্র একটি ব্যবস্থা টিকে গেল। সেটি ইউরোপীয় পুঁজিবাদ। তার জন্মকালকে বিশেষজ্ঞরা ১৪৫০ সাল থেকে ধরেন। ওই সময় পর্তুগাল ও স্পেন ধীরে ধীরে নৌপথে বাণিজ্যের বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করে (ভাস্কো দা গামা ভারতের পথে এবং কলম্বাস আমেরিকায়)। ওই নৌযোগাযোগের সুযোগ নিয়ে পুঁজি শান্ত ও তৃপ্ত না থেকে অক্টোপাসের মতো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সে কারণে কোনো রাখঢাক না করে বিশ্বায়নকে অনেকে ম্যানিক ক্যাপিটালিজম (manic capitalism), টার্বো ক্যাপিটালিজম (turbo capitalism) অথবা সুপরা টেরিটরিয়াল ক্যাপিটালিজম (supra territorial capitalism) বলে সম্বোধন করছেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোর বাইরে না রেখে এই পুঁজিবাদ তার উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে না। ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে বাধা এবং নানা আইন পাস করে রাষ্ট্র নানাভাবে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেও পুঁজি সরকার প্রণীত এসব নিয়মশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হয়ে এক উন্মুক্ত সীমান্তবিহীন বিশ্ব অর্থনীতির জন্ম দিতে চায় (deterritorialisation)। এই প্রক্রিয়াকে আমরা নাম দিয়েছি বিশ্বায়ন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন, যারা দেশের মালিক, তারাই দেশের নীতি তৈরি করবে। মালিক বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন বণিকশ্রেণি এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিককে। সে অর্থে আজকের বিশ্বায়নের

চালিকাশক্তি হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং বহুজাতিক করপোরেশন। বহুজাতিক করপোরেশনের উদাহরণ হতে পারে কোকাকোলা, ম্যাকডোনাল্ড, কেএফসি, ওয়ালমার্ট, শেল, বিপি, সিটি ব্যাংক, ম্যানহাটন চ্যাসিজ ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পোরস ইত্যাদি নানা সংস্থা। এরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী। এদের অনেকেই দেশীয় অর্থনীতি থেকেও বড়। আমেরিকার কোম্পানি ওয়ালমার্টের বাৎসরিক আয় দেশ ধরে হিসাব করলে ষষ্ঠ স্থানে। তার আগে আছে কেবল আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, জাপান। এই বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বিশ্ব পুঁজিবাদী শ্রেণি বলতে পারি। তারা এমন এক পণ্য সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, যেটি কঞ্জুমারিজম বা পণ্য ভোগবাদী সংস্কৃতি নামে পরিচিত। এই সংস্কৃতির মূল বাহক টেলিভিশন ও মিডিয়া। এক হিসাব থেকে জানা যায়, ১৬ বছরের যেকোনো আমেরিকান যুবক ৩ লাখ টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পরিচিত হবে ওই স্বল্প জীবনকালে। বিশ্ব পুঁজি এভাবে ভোগবাদী সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে গোটা বিশ্বে।

বিশ্বায়নের আর একটি শক্তি হচ্ছে শক্তিশালী রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিছু দেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির একটি কাঠামো নির্মাণ করে দিয়েছিল। সেই কাঠামোর মধ্যে আছে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক। ইতিমধ্যে যে বাজারসভ্যতা গড়ে উঠেছে এরা তাকে লালন করে। এমনভাবে তারা তাদের নীতিমালা গঠন করে যেন বিশ্ব পুঁজি তার দ্বারা উপকৃত হয়। আরও রয়েছে কিছু সংগঠন যেগুলো রাষ্ট্রপুঞ্জের সহায়তায় গড়ে উঠেছে। তাদের দায়িত্ব শান্তিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন করা। সেই সঙ্গে আছে বৈশ্বিক সিভিল সমাজ, যার মধ্যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বা গ্রিনপিস, আন্তর্জাতিক কমিউনিটি অব জাস্টিস, সাহায্য বিতরণের বহুবিধ বেসরকারি সংগঠন। এভাবে বিশ্বায়নের একটি দীর্ঘ ও জটিল কাঠামো গড়ে উঠেছে। মাকড়সার জালের মতো সেটি সব দেশ, সমাজ ও জনপদকে যুক্ত করে তার শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে।

আদি বিশ্বায়ন

তবে বিশ্বায়নের মূল ভিত পুঁজিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার শেকড় রয়ে গেছে অতীতে। সেই বিশ্বায়নকে আধুনিক অর্থে বিশ্বায়ন না বলে বলতে পারি আরখাইক (Archaic) বিশ্বায়ন। অর্থনীতি ও রাজনীতির বাইরে যেসব বহুমুখী আদান-প্রদান হয়ে থাকে যেমন সাংস্কৃতিক, জ্ঞানসম্পর্কিত, ধর্মীয়, ধর্মান্তঃকরণ সেগুলো এককালে বিশ্বায়নের প্রকৃত শক্তি ছিল। সেই যুগ ছিল রোমাঞ্চকর এক যুগ। গ্রিক, রোমান সভ্যতা ওই যুগেরই কীর্তি, যার ওপর ভর করে আমাদের

আধুনিক জীবন গড়ে উঠেছে। নীল নদের কূল ঘেঁষে ফারাওদের সাম্রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে আমরা মিসরীয় সভ্যতার কথা বলি। সিন্ধু নদ ও গঙ্গার ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা সভ্যতা আমাদের আকুল করে। মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন বা পারস্য সাম্রাজ্য এই প্রাচীন যুগের ছকের বাইরে নয়। বাইরে নয় সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা বা অন্যান্য সভ্যতা। এসব সভ্যতা বিশাল মহিরুহের মতো পণ্ডিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সমাগমে ভরপুর ছিল। ভরপুর ছিল যুদ্ধবিগ্রহে, দূরের বাণিজ্য পথে নানা পণ্যের আদান-প্রদানে। যাদের চিন্তাধারা এ সময় সমাজকে আন্দোলিত করে গেছে তাদের মধ্যে রয়েছে চীনের পণ্ডিত কনফুসিয়াস। রয়েছে ভারতবর্ষের মহান রচনা রামায়ণ এবং মহাভারত—গ্রিক উপাখ্যান *ইলিয়াড, ওডিসি*। তাদের রচিত সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ নানাভাবে নানা পথে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও তাদের বাণী সমাজ ও মানুষকে প্রভাবিত করে গেছে। আর কী অদ্ভুতভাবেই না তারা ছিল একে অপরের সদৃশ। গ্রিক পণ্ডিত হোমার, সক্রেটিস, প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতবর্ষে গড়ে ওঠা সমসাময়িক চিন্তার কি কোনো সাদৃশ্য নেই? রামায়ণ-মহাভারতের মতো পৌরাণিক গ্রন্থে যে আদর্শ সমাজের কথা, মানুষের মঙ্গলভাবনার উপদেশ আছে, সেই ভাবনার সঙ্গে কি সাদৃশ্য দেখি না হোমার, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের?

যেসব ধর্মবিশ্বাস ওই সময় জন্ম নিয়েছিল তাদের বাণীর মধ্যেও ছিল অভিন্ন দিক। পারস্যের জরাস্ত্রিয়ান (Zoroastrian) ধর্ম, চীনের মেজি (Mozi 400BC) বা খ্রিষ্টধর্ম তার প্রমাণ হতে পারে। এই ধর্মের প্রতিটিই ভালোবাসার কথা বলে গেছে। মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে বিবেচনা করেছে (যদিও ভারতের জৈন ধর্মের কথা ভিন্ন)। ইহুদি ধর্মের মতো নৈতিক নিয়মকানুনের কথা বলেছে বাকি অন্যান্য ধর্ম। হয়তো কিছুটা ভিন্ন ভাষায় ওই একই কথা বলতে চেয়েছে বৌদ্ধধর্ম বা ইসলাম ধর্ম। অহিংসা এবং বাহুল্যকে পরিহার করার উপদেশ রয়েছে জরাস্ত্রিয়ান ধর্মে। সেখানেও বিশুদ্ধ চিন্তা, কর্ম ও কথোপকথনে সঠিক ভাষা ব্যবহারের ওপর রয়েছে বিশেষ জোর। কনফুসিয়ান ধর্মও এই স্রোতোধারারই অংশ। সেখানেও রয়েছে নৈতিক বিশুদ্ধতার বাণী। ফলে সব ধর্মে ভিন্নতা থাকলেও বিভেদকে নয়, মানবজাতির অদৃশ্য ঐক্যকে প্রাধান্য দিতে দেখি।

ঐক্যের কথা যদি বলি তাহলে তার ব্যাপ্তি কিন্তু আরও প্রশস্ত। ঐক্যের দিক থেকে দেখলে মিল পাওয়া যাবে বৌদ্ধধর্মের সাথে গ্রিক স্তোইকদের। হেলেনীয় সভ্যতায় জেন নামে যে বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন, তিনিই এই স্তোইক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্তোইকরা উপদেশ দিয়ে গেছেন সংযমী হতে। সংযমের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার এই উপদেশবাণীর সঙ্গে প্লেটোর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সাধারণ মানুষের চরিত্রে প্লেটো

কামনার বিশেষ প্রভাব লক্ষ করেছিলেন, যেটি এলিট এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণত অনুপস্থিত থাকে। সে কারণে রাষ্ট্রের মঙ্গলভাবনা ভেবে তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপর শাসনভার ন্যস্ত করা অপরিহার্য মনে করেছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ বছরের দিকে চীনে গড়ে ওঠা আইনবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও এই দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখি। প্রাচীন প্রতিটি সভ্যতার চিন্তাজগতের মধ্যে এই সাদৃশ্য ও অভিন্নতা অভূতপূর্ব। সেদিক থেকে ভাবলে বিশ্বায়নের শুরুকে প্রাচীন যুগ থেকে ধরাটা যুক্তিসিদ্ধ। কীভাবে সেই অভিন্ন চিন্তাপ্রবাহ জন্ম নিল আর কীভাবেই বা মনীষীরা একই চিন্তার কক্ষপথ পরিভ্রমণ করলেন, সেটি রীতিমতো বিস্ময়কর হতে পারে। কিন্তু ওই বিস্ময়কে সাময়িকভাবে সংযত রেখে আমরা বলতে পারি, প্রাচীন ওই আদি জ্ঞানকাঠামোই সেই আধ্যাত্মিক ভিত (Spiritual foundation), যার ওপর ভর করে এবং নানা আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে সীমিত আকারে হলেও জন্ম নিয়েছিল পরস্পর-সম্পর্কিত আজকের আধুনিক জীবনের প্রাথমিক ভিত।

মধ্যযুগে (খ্রিষ্টাব্দ ৪৭৬ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যবর্তী সময়) ইউরোপ এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গোটা ইউরোপে রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামাজিক ক্ষেত্রে স্থবিরতা দেখা দেয়। অর্থনৈতিকভাবে খণ্ডিত এবং বিভক্ত হয়ে সেখানে সামন্তবাদী উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা বলতে আমরা বুঝি কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। এর ফলে মানুষের জীবন আঞ্চলিক পরিবেশের মধ্যে সীমিত হয়ে আসে। সে সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল না কোনো গতি। তার সঙ্গে আরও যোগ হয়েছিল রাজাদের মধ্যে প্রবল বিরোধ। ইউরোপ তার নিজের গণ্ডির মধ্যে এমনভাবে সেঁটে ছিল যে বাকি বিশ্ব সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। অনেকের ধারণায় সভ্যতার বিকাশে এই যুগের অবদান যথেষ্ট নয়। কিন্তু সেটি সঠিক নয়। প্রাচীন সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে মধ্যযুগের অবদান কিন্তু কম নয়। প্রাচীন সমাজ মূলত গড়ে উঠেছিল দাসশ্রমের ওপর ভিত্তি করে। সেখানে দাসদের কোনো অধিকার ছিল না। দাস ছিল দাস-মালিকের সম্পত্তি। যেসব ভবন এবং নিদর্শনকে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে আমরা জানি—যেমন মিসরের পিরামিড, গ্রিসের আক্রোপলিস, রোমের স্থাপত্য—সেগুলো দাসের শ্রমে নির্মিত হয়েছিল। অথচ অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে তারা ছিল বঞ্চিত ও নিপীড়িত। মধ্যযুগে খ্রিষ্টধর্মের অনুশাসনে নানা ধরনের বাধা থাকলেও ওই ধর্ম কিন্তু মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। আরও রয়েছে শ্রমকে বিনা পয়সায় ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা। পবিত্র বাইবেলের সেন্ট ম্যাথিউতে লেখা আছে শ্রমকে মূল্য দিয়ে কেনার কথা।

এর সঙ্গে যোগ করতে পারি অন্য আরও কিছু অগ্রগতির দিক, বিশ্বায়নে যার গুরুত্ব অপরিসীম। আজ যেভাবে আমরা লিখি সেটি আমরা পেয়েছি মধ্যযুগ

থেকে। আমাদের আইনি ব্যবস্থা মধ্যযুগ থেকে ধার করা। রেনেসাঁ বা আধুনিক যুগ নিয়ে আমাদের যে গর্ব তা-ও শূন্যের ওপরে গড়ে ওঠেনি। তার প্রাথমিক ভিত মধ্যযুগই তৈরি করে দিয়েছিল। বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশেও মধ্যযুগের ছিল বিশেষ অবদান। প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রিষ্টাব্দ ১১ শতাব্দীর দিকে—একটি ইতালির শহর বলোনিয়ায়, অন্যটি ফ্রান্সের প্যারিসে। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিষয়ে জ্ঞান দান করা হতো তার মধ্যে আইন, ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং লিবারেল আর্ট ছিল প্রধান। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। ছিল তর্ক এবং আলোচনার সুযোগ। ব্যাংকিং ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে এই মধ্যযুগে। বিশেষ করে বিল অব এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিট ব্যাংকিং এবং বন্ড ব্যবস্থা। এই বন্ড প্রথা ফ্লুরেন্স শহরে দুটি পাবলিক ফান্ডকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে—একটিকে বলা হতো মন্তে ফান্ড (Monte Delle Doti) এবং অন্যটি ডাওরি ফান্ড (Dowry Fund)। বিশ্বব্যাপী তার মূল্য কী ছিল সেটি বলাই বাহুল্য। বই প্রকাশনা এবং ইলাস্ট্রেশন ব্যবহার করার রীতি আমরা প্রথমে লক্ষ করি মধ্যযুগে। আর প্রেম? প্লেটোনিক প্রেম বলতে যা বোঝায়, যেখানে ইরোটিক প্রেমের সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেমের মিলন রয়েছে—সেটিও তো গড়ে ওঠে মধ্যযুগে। যান্ত্রিক ঘড়ি এবং কম্পাসের আবিষ্কার হয়েছে মধ্যযুগে—ইউরোপে ও চীনে—যুগপৎভাবে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানেরও কোনো অভাব মধ্যযুগে ছিল না। ওই জ্ঞান ছাড়া মধ্যযুগের গোথিক স্টাইলের গির্জা বা দালানকোঠা, যা কিনা সভ্যতার গৌরব এবং মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ—নির্মাণ করা যেত কি? যদি বলি ম্যাগনাকার্টা (১২১৫ সালে প্রথম এই চার্টার লেখা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিবছর এটি নবায়ন করা হতো) সেটি লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে মধ্যযুগ। ম্যাগনাকার্টার মূল কথা শাসকের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। পোপ গ্রেগরির সময় থেকে (খ্রিষ্টাব্দ ৫৯০-৬০৪) চার্চ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে দ্বিকেন্দ্রিক ক্ষমতাকাঠামো গড়ে ওঠে। তাতে করে কারও পক্ষে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ম্যাগনাকার্টার উদ্দেশ্য ছিল সেটিই। সেদিক থেকে ভাবলে খ্রিষ্টধর্মই ম্যাগনাকার্টার জন্ম দিয়েছিল, যদিও পরোক্ষভাবে।

যদি ভাবি পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রাণশক্তির কথা, সেখানেও কিন্তু মধ্যযুগের ভূমিকা রয়েছে। অনেকের মতে, নুরসিয়ার বেনেডিক্ট (St Benedict of Nursia, ৪৮০-৫৪৩) মন্তেকাসিনোতে যে আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন সেখানে যেসব নীতি শিক্ষা দেওয়া হতো তার মধ্যে সংযমী হওয়া এবং অলসতাকে ঘৃণা করার সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। একধরনের লিখিত কর্মপ্রথা দিয়ে আশ্রমের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো। তার মধ্যে অন্যতম ছিল অলসতাকে আত্মার শত্রু হিসেবে দেখা। তিনি আশ্রমের সবাইকে বাধ্য করতেন কায়িক ও মানসিক শ্রমে। চিন্তার এই

বিশেষ ধরনটি ম্যাক্স ওয়েবারের প্রোটেস্ট্যান্ট এথিকের অন্যতম স্তম্ভ বলে মনে করা হয়। আধুনিক দর্শনের বিকাশেও মধ্যযুগের অবদান রয়েছে। দার্শনিক অগাস্টিন (St Augustine), বথিয়াস (Boethius), থমাস আকিউনাসের (Thomas Aquinas) লেখা এবং জ্ঞান সেকালের দার্শনিক জ্ঞানের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কৃষির ক্ষেত্রেও বিশেষ অগ্রগতি দেখিয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপ। নতুন ধরনের লাঙল এবং ঘাড় দিয়ে লাঙল টেনে নেওয়ার সুবিধার্থে ঘোড়ার জন্য কলার উদ্ভাবন করে ইউরোপ কৃষিতে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। সম্রাট সারলেমনের সময়ে লেখার পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন এবং দুই শব্দের মধ্যে খালি জায়গা রাখার প্রচলন তাঁর সময়েই ঘটে। মধ্যযুগ বিশ্বায়নে কোনো অবদানই রেখে যায়নি বা রাখলেও সীমিত ছিল, সে দাবি অনেকটা অযৌক্তিক বলেই মনে হয়।

তবে মধ্যযুগে এশিয়াই ছিল বিশ্বায়নের কেন্দ্রবিন্দু। এশিয়া কৃষিভিত্তিক অঞ্চল ছিল, সে কথা মানছি। কিন্তু তার পাশাপাশি সেখানে গড়ে উঠেছিল আরও এক জীবন, যে জীবন সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক শিল্প-সাহিত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে বিপুল অগ্রগতি অর্জন করে। তার প্রমাণ মিলবে ভারতবর্ষ, চীন ও তুরস্কের ইতিহাসে। ভারত, চীন ও তুরস্ককে নিয়ে গড়ে ওঠে বিশাল কেন্দ্রীভূত তিনটি সাম্রাজ্য—মোগল সাম্রাজ্য, মিং বংশের শাসন এবং অটোমান সুলতানদের শাসন। সভ্যতার এই তিন কেন্দ্র মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল বহু দূর। তারাই ছিল সে কালের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক শক্তির ধারক। তারাই শক্তিধর এবং উন্নত সমাজ গড়ে তুলে ১৪০০ সালের পর থেকে এশিয়াকে বিশ্বায়নের অগ্রবাহিনীতে পরিণত করে। ভৌগোলিকভাবে তিনটি বিচ্ছিন্ন বিন্দুর মতো দেখালেও নিজ এলাকায় প্রতাপের সঙ্গে শাসন করে তারা বহু জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে আন্তদেশীয় সম্পর্ককে তারাই নিয়েছিল নতুন পর্যায়ে। যে প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ আরও ঘনীভূত হয়েছিল তার মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তার, আমলাতন্ত্রের বিকাশ এবং বাণিজ্যের বিস্তার ছিল প্রধান। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এশীয় সাম্রাজ্যগুলো তাদের এই গৌরবময় জীবনের সমাপ্তি টানে। তারা নিজেদের পতনকে রুখতে পারেনি। পারেনি ঘুরে দাঁড়াতে। নতজানু হতে হয়েছে ইউরোপের কাছে। গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়ে পরাধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়েছে, যদিও ইউরোপের সমকক্ষ হওয়ার সব পূর্বশর্ত তাদের ছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অঙ্কুরে অঙ্কুরে বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই শক্তি ১৬০০ সালের শুরু থেকে পরবর্তী ৫০০ বছর গোটা বিশ্বের ওপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবে।

মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে উঠে এসে ইউরোপ আরও শক্তিমত্ত হয়ে সারা বিশ্বে প্রমাণ করবে তার শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষ করে নৌশক্তির ওপর ভর করে।

আধুনিক বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের মূল শক্তি পুঁজিবাদ। প্রথম ধাপে পুঁজিবাদ বণিক পুঁজির মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ওই পুঁজির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা ছিল ভাস্কো দা গামা বা ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নৌ-অভিযান। মধ্যযুগ শেষ হওয়ার কিছু আগে ইউরোপের সমুদ্রবর্তী এলাকায় ধীরে হলেও শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা এবং বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। ভেনিস, জেনোয়া, কায়রো, কনস্টান্টিনোপলের মতো বেশ কিছু বন্দর-শহরে নানা ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতা লক্ষ করা যায়। ধীরে ধীরে সেগুলো বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। আফ্রিকার আন্তসাহারা বাণিজ্য পথ দিয়ে ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর এবং ভারতীয় মহাসাগরের পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্যে বাণিজ্য যোগাযোগ থাকলেও ১৫ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশ্ব বাণিজ্য পরিমাণগত এবং স্থানগতভাবে সংকুচিত হতে থাকে। দীর্ঘ সমুদ্র ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অভাব এর প্রধান কারণ। বাণিজ্যের দিক থেকে ভাবলে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার পৃথিবীকে একেবারে বদলে দিয়েছিল। তার নৌ-অভিযান দুই ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রথম পরিবর্তন, গোটা দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল স্পেন ও পর্তুগালের দখলে আসে। ১৫১৯ সালে করটেজ মেক্সিকোতে অবতরণ করার পর স্থানীয় অ্যাজটেকদের পরাজিত করে ওই অঞ্চলের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করে। ১০ বছর পর ফ্রান্সিস্কো পিজারো পেরু জয় করে। মেক্সিকো ও পেরুকে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্রে আনার কারণ ছিল স্বর্ণ। দীর্ঘ সময় ধরে প্রচুর স্বর্ণ মজুত ছিল সেখানকার মন্দিরগুলোতে। ওই অঞ্চলের মানুষ তাদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় স্বর্ণ ব্যবহার করত। স্বর্ণ ও রুপার চালান স্পেনকে পাল্টে দেয়। এই স্বর্ণভান্ডার একপর্যায়ে শেষ হলো বটে। কিন্তু তার জায়গায় এল রুপা। স্পেনীয়রা যখন দক্ষিণ আমেরিকার রুপা নিয়ে চীনে আসে তখন থেকে চীন ইউরোপ সম্পর্কে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়। চীনের মিং সাম্রাজ্যে রুপা ছিল সব ধরনের বিনিময়ের মাধ্যম। রুপার প্রচুর চাহিদা থাকায় আন্দিসে (দক্ষিণ আমেরিকায়) রুপার খনিসংলগ্ন শহরগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পতোসি (Potosi) নামের এক শহর কয়েক দশকের মধ্যে লন্ডনের চেয়েও বড় শহরে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বেশি পরিমাণে রুপা আমদানি হওয়ায় চীনা অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। একই সঙ্গে সামাজিক অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। একে মিং সাম্রাজ্যের পতনের একটি প্রধান কারণ হিসেবে অনেকে ভাবেন। প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চীন থেকে মেক্সিকোতে

সিল্ক, চিনামাটির তৈরি দ্রব্য রপ্তানি শুরু হয়। চীনের ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল আলু, মিষ্টি আলু ও ভুট্টা। আমেরিকা থেকে আসা এই তিন ধরনের খাদ্যশস্য চীনের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল। এসব শস্য যেকোনো মাটিতে হতো। সে কারণে অনুর্বর অঞ্চলে সেগুলো চাষ করে চীনের চেহারা বদলে গিয়েছিল (মান, ২০১১)।

দ্বিতীয় পরিবর্তন এসেছিল পণ্য-বাণিজ্যে। কলম্বাসের পর থেকে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুণ। ১৪৯২ সালে কলম্বাস যখন আমেরিকা পাড়ি দেন তখন চীন ও ইউরোপের মধ্যে তেমন যোগাযোগ ছিল না। অথচ এর এক শ বছর পর গোটা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেল। স্পেনের জাহাজ চীনা বন্দরে নোঙর করার সুযোগ পেল। দক্ষিণ আমেরিকার খনিতে আফ্রিকান দাসের শ্রমে খনন করা রুপা এল চীনে। স্পেনের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা চীন থেকে আমদানি করল সিল্ক। ধনী ব্যক্তিরা মাদ্রিদ, মক্কা বা ম্যানিলাতে বসে অভ্যস্ত হলো আমেরিকায় উৎপাদিত তামাকের স্বাদে। একপর্যায়ে মিষ্টি আলু চীনে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটাল। ইউরোপ থেকে পেরুতে আনা পাখির মল সেখানকার জমির উর্বরতা বাড়াল। ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশা আমেরিকায় গিয়ে ধ্বংস করল বহু জীবন। ইউরোপের সঙ্গে এই বিনিময় সম্পর্ক ছিল আরও গভীর। ইউরোপ থেকে পাঠানো জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও মাইক্রোব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমেরিকা থেকে তামাক, আলু এবং টার্কি পাখি ইউরোপে এসে সেখানকার খাদ্যাভ্যাস এবং কৃষিকে বদলে দেয়। ইউরোপ থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হয় ঘোড়া, গম এবং গুটিবসন্ত, কেঁচোসহ আরও অনেক পোকামাকড়। ওই কেঁচো আমেরিকার জঙ্গলকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। কেঁচো অনেক উদ্ভিদ বা গাছের বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং পাখিদের খাবার হিসেবে কাজ করে। মোট কথা পোকামাকড়ে ভর্তি বাগান বা জঙ্গল পোকাহীন জঙ্গলের থেকে ভিন্ন। এই আন্তমহাদেশীয় যোগাযোগ এবং বিনিময়কে কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জ বলা হয়। এই বিনিময়ের ফলে যোগাযোগ উন্নীত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার অপকারিতার দিককে উপেক্ষা করা যায় না। লাখ লাখ আমেরিকান আদিবাসীর মৃত্যু হয়েছিল নানা অজানা রোগে। ওই রোগ ইউরোপীয়রা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, যার সম্পর্কে স্থানীয় মানুষেরা কিছুই জানত না। জানত না কীভাবে ওই রোগব্যাধির চিকিৎসা করতে হয়। এভাবে বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া এগিয়ে গেল আরও এক ধাপ। এ পর্যায়ে যে চারটি দেশ বিশেষ ভূমিকা রাখে তারা হলো স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড ও ইংল্যান্ড। বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও নানাভাবে পৃথিবীকে প্রভাবিত করে গেছে।

তবে যে দেশ বিশ্বায়নকে আধুনিক ধাপে পৌঁছে দিল সে দেশটি হচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকার ওই সাফল্য এসেছে তার প্রভূত রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও

অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিয়ে। কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়ে অন্য সব দেশকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল এবং বিশ্বায়নকে পৌঁছে দিল নতুন যুগে সে রীতিমতো কল্পকাহিনির মতো শোনাতে পারে। তবে সেই কাহিনির শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে করাই ভালো। ওই যুদ্ধের ধাক্কাটা ছিল সত্যিই প্রবল, এমনই প্রবল যে গোটা ইউরোপ পরিণত হয়েছিল এক বিশাল ধ্বংসস্তূপে। ওই ধ্বংসলীলা থেকে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। আমেরিকার উত্থানের সেই বিস্ময়কর ঘটনা কীভাবে ঘটল তার বর্ণনা আমরা পাই স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডেভিড কেনেডির বক্তব্য থেকে। ২০০১ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন সেখানকার লা ট্রোব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার নাম ছিল 'রাইজ টু পাওয়ার'। সেই বক্তৃতায় ১৯৪০ সালের আমেরিকাকে তিনি দরিদ্র একটি দেশ হিসেবে বিচার করেছেন। পরিসংখ্যান সেকালে আজকের মতো উন্নত ও সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু যে হিসাব সে সময় হাতে আসত তাতে আমেরিকাকে আর্থসামাজিক দিক থেকে ধনশালী কোনো দেশ বলা যাবে না। বেকারত্বের হার সেখানে ছিল ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ। ৪৫ শতাংশ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। আফ্রো আমেরিকান জনগণের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাদের ৯৫ শতাংশই বেকার। হতাশাব্যঞ্জক এই অবস্থা থেকে আমেরিকা কীভাবে শক্তিশালী দেশে পরিণত হলো? ডেভিড কেনেডির মতে, আমেরিকার ভাগ্য বদলে দিয়েছিল যুদ্ধের সময়ে নেওয়া প্রশাসনিক দুটি কৌশল।

ওই দুই কৌশলের একটির ওপর আলোচনা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার আগে যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির একটি তুলনামূলক হিসাব তুলে ধরা যাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের সাড়ে তিন লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। তার মধ্যে এক লাখ ছিল বেসামরিক। যুগোস্লাভিয়ার ২০ লাখ মৃতের মধ্যে ১০ লাখ ছিল বেসামরিক। জাপানের ৩০ লাখের মধ্যে ১০ লাখ ছিল বেসামরিক। পোল্যান্ডের ৮০ লাখের মধ্যে ৬০ লাখ ছিল বেসামরিক। জার্মানির ৬৫ লাখের মধ্যে ১০ লাখ বেসামরিক। সোভিয়েত ইউনিয়নের ২ কোটি ৪০ লাখের মধ্যে ১ কোটি ৬০ লাখ বেসামরিক। যুদ্ধে আমেরিকার ক্ষয়ক্ষতি কী ছিল? সেটি দেখাতে গিয়ে কেনেডি বলছেন, যে চার লাখ পাঁচ হাজার চার শ মানুষ মারা গিয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ছয়জন ছিল বেসামরিক। এর অর্থ হচ্ছে, যুদ্ধে আমেরিকার বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি ছিল না বললেই চলে। জনসম্পদের দিক থেকে বিচার করলে এর তাৎপর্য কিন্তু অত্যন্ত গভীর। ইউরোপের ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অনেক দূরে থাকায় যুদ্ধের তাপ তার গায়ে সেভাবে লাগেনি যেভাবে লেগেছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশের গায়ে। সে কারণে যুদ্ধ সত্ত্বেও তার অর্থনীতি বড় ধরনের সংকট

থেকে বেঁচে গেল। এমনকি দেখা গেল সে সময় তার অর্থনীতি পেছনে যায়নি, বরং এগিয়েছে সামনে ১৫ শতাংশ হারে। এই অর্জন সম্ভব হয়েছিল বিশেষ একটি কৌশলের কারণে। ১৯৪২ সালের ৬ অক্টোবর ডোনাল্ড নেলসন নামের একজন উচ্চপদস্থ আমলা যে সিদ্ধান্ত নেন সেটি ইতিহাসে ৯০ ডিভিশন গ্যাম্বল নামে পরিচিত। যুদ্ধের সময়ে ওয়ার প্রোডাকশন বোর্ডের প্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল অর্থনীতিকে শান্তিকালীন থেকে যুদ্ধের সময়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলা। তার অর্থ হচ্ছে, তাকে একদিকে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী রাখার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে, আবার জনগণের জীবনযাত্রার মান যেন কোনো রকম পরিবর্তন না হয় সেটিও দেখতে হবে। প্রাথমিকভাবে তিনি এবং তাঁর কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২১৫ ডিভিশন গড়ে তোলার। ওই সংখ্যাকে সঠিক ভাবা হলেও পরবর্তী সময়ে তিনি তা বাতিল করে মাত্র ৯০ ডিভিশন গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেন। এর ফলে ১২৫ ডিভিশনের সমতুল্য অতিমাত্রায় কর্মদক্ষ মানুষ যুদ্ধে না গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে বেসামরিক উৎপাদনে যোগ দেওয়ার সুযোগ পায়। সামরিক ডিভিশনের সংখ্যা কমানো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হলেও ওই সিদ্ধান্তই কিন্তু আমেরিকার অর্থনীতিতে বয়ে এনেছিল বিপুল সুফল। অন্য দেশের মতো জনসম্পদের সংকটে না পড়ে মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে আমেরিকা বেরিয়ে এসেছিল গায়ে প্রায় কোনো দাগ না নিয়ে। সে সময়ের ইংল্যান্ড বা রাশিয়ার জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে আমেরিকার জীবনমানের তুলনা করলে সেটি বোঝা যায়। তাতে দেখা যায়, ওই দুই দেশে জীবনযাত্রার মান নেমে গিয়েছিল ৩০ শতাংশ। আমেরিকার শক্তিশালী অর্থনীতির আরও কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে উদ্ধার করেছিল নিজের অর্থনৈতিক শক্তির কারণে। সে নিজে তার অর্থনৈতিক এবং ভূকৌশলগত স্বার্থের দিকে তাকিয়েছে সে কথা সত্যি। তার পুঁজি এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইউরোপের বাজারের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ যেন পায় এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে আসে, সেটি ভাবতে আমেরিকা ভোলেনি। বিশ্ব পরাশক্তিতে পরিণত হয়ে গোটা বিশ্বকে তার অর্থনীতির আওতায় এনে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগে গুণগত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ওই বিশেষ কৌশলকে সাধুবাদ জানাতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকায় অর্থনীতি-সংক্রান্ত এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সেই নীতির মূল প্রবণতাটি ছিল আমেরিকার অর্থনীতিকে রাজনীতি এবং বৈদেশিক নীতির সঙ্গে যুক্ত করা। সংযোগটি পুঁজিবাদী দেশে আগে বড় একটা দেখা যায়নি। ব্রিটেন যেমন ল্যাসে ফেয়ার (laissez fair) নীতির আওতায় বাজার এবং অর্থনীতিকে যত দূর সম্ভব রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রেখে এসেছে। কিন্তু

তার ঠিক উল্টোটা দেখা গেল আমেরিকার ক্ষেত্রে। অত্যন্ত সচেতনভাবে আমেরিকার নেতারা রাষ্ট্রকে অর্থনীতির সহায়ক হিসেবে গড়ে তুলল। সেই সুযোগটি তখনকার ইউরোপই আমেরিকার জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল। যুদ্ধের পর জাপান, জার্মানি, স্পেন বা ইতালির মতো দেশ পৃথিবীর কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। সেটি তাদের অনুসৃত মানবতাবিরোধী ফ্যাসিবাদী আদর্শের কারণে। ওই আদর্শ দিয়ে এই দেশগুলো বিশ্ব কর্তৃত্বের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু যুদ্ধে তাদের পরাজয় ওই আদর্শের পরাজয় হিসেবে প্রমাণিত হলো। ওই নৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রীয় পুঁজি ইউরোপীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলো। প্রথমে প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় আমেরিকা তার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। জাপান তার হাতের মুঠোয় চলে আসে অতি সহজে। সে সময় জাপানের অর্থনীতিকে চাঙা করতে আমেরিকা এগিয়ে এসেছিল ভূকৌশলগত কারণে। জাপানের শাসনতন্ত্রও লেখা হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসিতে। এরপর ইউরোপ। পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে প্রচুর বিনিয়োগ করে আমেরিকা তার প্রভাববলয় সৃষ্টি করে। ওই মার্শাল প্ল্যানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে। ১৯৫০ ও ১৯৭০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একমাত্র সামরিক সাহায্য হিসেবে আমেরিকা ইউরোপকে দিয়েছিল দুই ট্রিলিয়ন ডলার (শেফা ২০০৯: ২)। অস্ট্রেলিয়া তার এককালের বিশ্বস্ত রক্ষাকর্তা ব্রিটেনের বদলে বন্ধু হিসেবে বেছে নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। কোরিয়া, চীন, মালয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি এলাকায় নানা যুদ্ধে অংশ নিয়ে এবং সেখানকার অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করে আমেরিকা বিশ্বব্যাপী নিবিড় এক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। এই নেটওয়ার্কে আরও অন্তর্ভুক্ত হয় নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। এভাবে আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়া—এই তিনটি পুঁজিবাদী অঞ্চলকে একই বৃত্তে এনে বিশাল ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে আরও যুক্ত হয় সামরিক ও দেশীয় গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নতুন প্রচার বিভাগ, বুদ্ধিজীবিদের নানা প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়া নেটওয়ার্ক।

আরও একটি কৌশল আমেরিকা নিয়েছিল। সেই কৌশলের উদ্দেশ্য ছিল নানা ধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর তার একচেটিয়া ক্ষমতা এবং প্রভাব নিশ্চিত করা। সামরিক ক্ষেত্রেও তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থান অর্জনে এ দেশ প্রচুর বিনিয়োগ করে। গড়ে তোলে উদারনৈতিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামো। তার সাংস্কৃতিক-আদর্শিক আধিপত্যের দিকটি ঠিক রাখতেও আমেরিকা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবে দেশটি তার ক্ষমতার

বিচ্ছুরণ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেয়, যে ক্ষমতা আজ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে নানাভাবে, নানা ক্ষেত্রে।

অর্থনীতি বা করপোরেশনের গল্প

শক্তিশালী দেশ হতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন হয় অর্থনীতিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানো। আন্তরাষ্ট্রীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, বাধা অতিক্রম করে কীভাবে পণ্যের বাজার অবারিত এবং অবাধ করে দেশীয় বাজারের সীমাবদ্ধতা উতরে গোটা বিশ্বে পণ্য ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সে প্রশ্নের মীমাংসা ভালো করেই করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বে অর্থনীতির তিনটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে—আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান। আমেরিকা তার অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে জাপান এবং ইউরোপের অর্থনীতিকে চাঙা করেছিল বিনা কারণে বলা যাবে না। চাঙা করতে অবশ্য তাকে ব্যবহার করতে হয়েছিল যাকে বলে একদিকে 'গাজর অন্যদিকে লাঠি'। ইউরোপ ও জাপানে আমদানিকৃত পণ্যের (মার্কিন পণ্য এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) ওপর আমেরিকা বেশি ট্যারিফ আরোপের নির্দেশ দেয়। এতে করে ইউরোপীয় পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মার্কিন কোম্পানিগুলো এই সুযোগ নিয়ে ইউরোপে বিপুলভাবে বিনিয়োগ শুরু করে। মুদ্রার বিনিময়ের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হার দিয়ে আমেরিকা ইউরোপীয় এবং জাপানি পণ্যকে মার্কিন বাজারে সহজলভ্য করার সুযোগ করে দেয়। ফলে দেখা গেল ১৯৭১ সালে মার্কিন বাণিজ্যে প্রায় ২.৩ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে (শেফা ২০০৯ : ৩)। এই ঘাটতি কমাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই দফায় ডলারের অবমূল্যায়ন করে। একটি ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আদেশে। অন্যটি ১৯৮৫ সালে জি ৫-এর (পরবর্তী সময়ে জি ৭) বৈঠকে, যাকে বলা হয় প্লাজা চুক্তি (শেফা ২০০৯ : ৪৪)। ডলারের অবমূল্যায়ন মার্কিন অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল। প্রথমত, ইউরোপ ও জাপান থেকে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ হলো আমেরিকার অর্থনীতিতে। সেই সঙ্গে আমেরিকায় সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়ায় ইউরোপ ও জাপানের পুঁজি আমেরিকার ট্রেজারি বন্ড কিনতে উৎসাহী হলো। তবে ডলারের অবমূল্যায়ন প্রথমে আঘাত করে জাপানি অর্থনীতিকে। জাপানি ইয়েনের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় তার অর্থনীতিতে প্রচুর অর্থের সমাগম হয়। পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এমনভাবে যে অনেকে তখন বলত একমাত্র টোকিও শহরের জমির মূল্য গোটা আমেরিকার জমির মূল্যের চেয়ে বেশি (শেফা ২০০৯ : ২২)। অর্থনীতিতে এর ফলে যে বুদ্‌বুদ তৈরি হয় সেটি ৯০ দশকের দিকে ফেটে পড়ে। জাপানি অর্থনীতিতে দেখা দেয় মন্দা। ইউরোপের অর্থনীতিও যে ভালো ছিল তা নয়। তার কারণ যদিও ভিন্ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর জার্মানির একত্রীকরণে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনে যে খরচ হয়েছিল সেটি

ওই মন্দার প্রধান কারণ বলে ধরা হয়। ইউরোপ ও জাপানের এই দুর্ভোগের সুযোগ নিয়ে আমেরিকান করপোরেশনগুলো তাদের প্রভাবকে নিশ্চিত করে।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং গোটা বিশ্বকে তার বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করার ইতিহাস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। ইউরোপের মতো আমেরিকায় পুঁজিবাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিযোগিতা দিয়ে (যাকে ফ্রি মার্কেট বলি)। সেই প্রতিযোগিতা ছিল রক্তাক্ত। তার ফল হিসেবে মাঝেমধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেমে গেছে। অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে মন্দা। সেই ধরনের মন্দা আমরা লক্ষ করেছি ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ বা ১৮৯৩ সাল থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। অর্থনীতির সংকোচনের কারণে ১৮৭৫ সালের দিকে আমেরিকায় প্রায় ৪৭০০০ কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে আন্তকোম্পানি প্রতিযোগিতাও হয়েছিল তীব্র। আন্তপ্রতিযোগিতা, ব্যবসায় ভাটা, লাভের পরিমাণ কমে আসার মতো অর্থনৈতিক দুর্যোগের সমাধান হিসেবে আমেরিকায় সে সময় জন্ম নেয় কারটেল (Cartel)। কারটেলের মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিযোগী কোম্পানিগুলোর মধ্যে একধরনের অলিখিত চুক্তি সই করে নিজেদের মধ্যে বাজার ভাগ করে নেওয়া। সেই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনো কোম্পানি যেন এককভাবে পণ্যের মূল্য হ্রাস করে বাজারের ওপর একক আধিপত্য সৃষ্টি করতে না পারে। এর ফলে আমেরিকায় এ সময় জন্ম নেয় নানা ধরনের বাণিজ্যিক অ্যাসোসিয়েশন। এরাই পরিণত হয় কারটেলে। তবে কারটেল খুব যে কার্যকর ছিল তা না। দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভাবলে কারটেল প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারটেলের অধীনে মূল্য নিয়ন্ত্রণে যেহেতু কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, সেহেতু তার কার্যকারিতা একপর্যায়ে কমে আসে এবং জন্ম নেয় ট্রাস্টের। ট্রাস্টের অধীনে প্রতিযোগী মালিকেরা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ছেড়ে দিত ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে। সেই মূল্য সব কোম্পানির জন্য বাধ্যবাধকতামূলক ছিল। তবে ১৮৯০ সালের দিকে ট্রাস্টের এই অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইন পাস করা হয়। তাকে শেরম্যান অ্যান্টি ট্রাস্ট আইন (Sherman Anti-Trust Law) বলা হয়ে থাকে। এতে ট্রাস্টকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এর প্রত্যুত্তরে শিল্পপতিরা হোল্ডিং কোম্পানি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এরা অন্য কোম্পানি কিনতে পারত। এই ধরনের হোল্ডিং কোম্পানির মধ্যে অন্যতম ছিল জেনারেল মোটরস। অর্থনীতির প্রধান সেক্টর হিসেবে এসব কোম্পানির আওতায় একপর্যায়ে চলে এল ব্যাংকিং, শিল্প উৎপাদন, মাংস প্রক্রিয়াকরণ, তেল পরিশোধন শিল্প, রেললাইন এবং ইস্পাত শিল্প। গড়ে উঠল বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান।

হিসাবটা মিলিয়ে নিলেই বুঝি কী দ্রুততার সঙ্গে সেখানে করপোরেশনভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬৫ সাল) আমেরিকায় ৪০০ জন মিলিয়নিয়ার ছিলেন। ১৮৯২ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৪০৭২। ১৯০৬ সালে ছয়টি রেল কোম্পানি দেশের ৯৫ শতাংশ রেললাইনের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিভিন্ন কোম্পানি এ সময় থেকে একত্র হতে থাকে। এটি লক্ষ করা গেল ১৮৯৭ সালের দিকে। ১৮৯৭ সালে এই একত্রীকরণের কারণে বড় কোম্পানির সংখ্যা ৬৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৯৮ সালে দাঁড়াল ৩০৩-এ। সেটি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৯৯ সালে পৌঁছাল ১২০৮-এ। উদাহরণ হিসেবে রকফেলারের নাম উল্লেখ করা যায়। তার নিয়ন্ত্রণে ছিল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি (স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি)। সেটি সম্ভব হয় তেল উত্তোলন এবং পরিবহনব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে, বিতরণে নতুন ব্যবস্থাপনা এনে রকফেলার বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। রকফেলারের দেখাদেখি অ্যালকোহল এবং চিনি বিশোধনে যুক্ত শিল্পেও গড়ে ওঠে ট্রাস্ট। অ্যান্ড্রু কার্নেগি ইস্পাত উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে তার করপোরেশনের সাহায্যে। ফলে অর্থনীতিতে একটির পর একটি ক্ষেত্রে একেকটি করপোরেশন অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অর্থনীতির পুরো দিককে নিয়ন্ত্রণ করল। এভাবে শেষ হলো প্রাথমিক পর্যায়ের মুক্ত প্রতিযোগিতার যুগ। শুরু হলো বৃহৎ আকারের কম্প্রেশনের যুগ। সম্পদ কেন্দ্রীভূতের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল, তাদের ধনসম্পদ অকল্পনীয় দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৬৯ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আমেরিকার শিল্প উৎপাদন ৩ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ বিলিয়নে পৌঁছায়। ১৮৭০ সালে ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ছিল ৬৮০০০ টন। সেটি ১৮৯০, অর্থাৎ ২০ বছরের ব্যবধানে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪.২ মিলিয়ন টনে (ডিজিটাল হিস্ট্রি, পৃ. ১)। এই প্রবৃদ্ধির মূলে ছিল নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার, রেললাইন নির্মাণ, ইলেকট্রিক মোটরের ব্যবহার, অন্তর্দাহ বিস্ফোরণ জাতীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার, রসায়নের ব্যবহারিক প্রয়োগ ইত্যাদি। এই করপোরেশনভিত্তিক পুঁজি গুণগত বিচারে অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন। সেখানে কেবল নতুন ধরনের পণ্যই উৎপাদিত হয় না; নতুন ধরনের ব্যবস্থাপনা, নতুন প্রযুক্তির বিকাশ এবং রাজনীতির সঙ্গে শক্ত যোগসূত্র করপোরেশনগুলোকে রাষ্ট্রের চেয়েও শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে দুর্নীতি বাড়তে থাকে। রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপরও তারা প্রভাব ফেলে। এভাবে আমেরিকায় জন্ম নেয় অলিগোপলির (Oligopoly)। হাতে গোনা কয়েকটি কোম্পানির হাতে আজ সে কারণে গোটা দেশের অর্থনীতি জিম্মি হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, মুষ্টিমেয়ের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবনের ফলে এসব প্রতিষ্ঠান এত বড় আকার ধারণ করেছে যে রাষ্ট্র

আজ তাদের কাছে অনেকটা নতজানু হয়ে আছে। করপোরেশনের ওপর খবরদারি করার কোনো সাহস তাদের নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নব্বইয়ের দশক থেকে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে। সেটি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। সেটি শুরু হয়েছিল তুমুল প্রতিযোগিতা দিয়ে, যে প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ করেছিলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এবার এই প্রতিযোগিতা দেখা দিল নানা ধরনের টেক কোম্পানির মধ্যে। সিলিকন ভ্যালি নামে পরিচিত জায়গাটি এর ফলে পরিণত হয় অনেকটা যুদ্ধক্ষেত্রে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও প্রতিযোগিতা কমে এল। বহু কোম্পানি প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে বিদায় নিল। জন্ম নিল গুগল, ফেসবুক, মাইক্রোসফট, আমাজনের মতো মেগাকোম্পানির। এই বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এদের সম্পদের পরিমাণ আকাশচুম্বী। এরা উৎপাদন করে আমেরিকার বাইরে গিয়ে—চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা বা মেক্সিকোর মতো দেশে, যেখানে শ্রমশক্তি সস্তা। সে কারণে লাভের পরিমাণও বেশি। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত আইন এসব দেশে হালকা থাকায় পরিবেশদূষণ করলেও কোম্পানি পার পেয়ে যেতে পারে। ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা সুবিধা। কর্মচারীর সংখ্যাও কমে গেছে। অ্যাপেল কোম্পানির ২০১৪ সালের আয় অনুযায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৮২.৯ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু তার কর্মচারীর সংখ্যা ৯২ হাজার। এ টিঅ্যান্ডটির আয় ওই একই সালে দাঁড়িয়েছিল ১৩১.৬ বিলিয়ন ডলারে। সেখানে কাজ করেন আড়াই লাখ কর্মচারী। ভেরিজন নামের আরও একটি কোম্পানি আছে। তার আয় ছিল ১২৭.১ বিলিয়ন ডলার। কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৭৮ হাজার। অন্যান্য বড় বড় করপোরেশনের ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। তাদের মধ্যে ইয়াহু, সিসকো, হিউইট প্যাকার্ড, গুগল, আইবিএম, মাইক্রোসফট, ওরাকল, ফেসবুক ইত্যাদি এমন সব পণ্য নিয়ে আজ হাজির হচ্ছে, যা আমাদের জীবনকে সহজ করে দিলেও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কাছে গোটা বিশ্ব নতজানু হয়ে আছে। এদের হাতে রয়েছে লবি করার বিশাল বাহিনী। শুধু ব্রাসেলস শহরেই রয়েছে তিরিশ হাজার লবিস্ট, যারা এসব কোম্পানির স্বার্থ দেখাশোনা করে (*দ্য ইকোনমিস্ট*, ২০১৬)। এভাবে তারা অর্জন করেছে এমনই শক্তি যে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে প্রায় অকল্পনীয়। পৃথিবীর ১০০টি সবচেয়ে বড় অর্থনীতিকে যদি ধরা হয় তাহলে তার মধ্যে ৫১টি হচ্ছে এসব বড় করপোরেশন। বাদবাকি ৪৯টি হচ্ছে দেশ (শাহ, ২০১৭ :২)।

আজ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। সবচেয়ে বড় ৫০০ কোম্পানিকে যদি ধরা হয় তাহলে দেখব সেখানে ২২৭টি (অর্থাৎ ৪৫ শতাংশ) কোম্পানি আমেরিকান, ১৪১টি ইউরোপীয়, ৯২টি এশিয়ার।

বস্তুত এই তিনটি অঞ্চল মিলে বহুজাতিক এবং সেই অর্থে বিশ্ব অর্থনীতিকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে (৯১ শতাংশ)। অন্য দেশের দুর্দশাটা বোঝা যায় যখন দেখি ৫০০টি কোম্পানির মধ্যে লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার রয়েছে মাত্র ১১টি (পেট্রাস ও ভেল্টমেয়ার, ২০০৫ : ২৭)। কেবল মেক্সিকো ও ব্রাজিলে বিশ্বমানের কোম্পানি আছে কয়েকটি। আফ্রিকায় একটিও নেই। মধ্যপ্রাচ্যে যে ৬টি আছে তার ৪টিই সৌদি আরবের। আর রাশিয়ার রয়েছে ৭টি। আর যদি সব কোম্পানির হিসাব কষা হয় তাহলে ৭৩ শতাংশ করপোরেশনের জন্মস্থান ইউরোপ ও আমেরিকায়। আরও যদি ঘনিষ্ঠভাবে আমেরিকার আধিপত্য বুঝতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে বড় ১০টির মধ্যে ৮টিই মার্কিন কোম্পানি, ২টি ইউরোপীয়। আর ২০টির মধ্যে ১৫টি আমেরিকান, ৪টি ইউরোপীয় এবং ১টি জাপানি (পেট্রাস ও ভেল্টমেয়ার, ২০০৫ : ২৭)। যেসব ক্ষেত্রে আমেরিকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো হতে পারে শিল্পপ্রতিষ্ঠান (জেনারেল ইলেকট্রিক); তেল ও গ্যাস (এক্সন মবিল); সফটওয়্যার (মাইক্রোসফট); ওষুধ (ফাইজার); ব্যাংক (সিটিকর্প); সুপারমার্কেট (ওয়ালমার্ট); বিমা (আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ) এবং আইটিতে (ইনটেল)। এভাবে ইউরোপীয় ও আমেরিকান পুঁজি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় কোম্পানির সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার (*ফিন্যান্সিয়াল টাইমস*, ২০০৪)। ২০০৩ সালে আমেরিকান কোম্পানিগুলো ইউরোপে বিনিয়োগ করেছিল ৮৭ বিলিয়ন ডলার। ইউরোপীয় কোম্পানিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করেছে ৩৭ বিলিয়ন ডলার। বস্তুত দুই বছরের মধ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হচ্ছে যথাক্রমে ৩১ ও ৪২ শতাংশ। এভাবে অক্টোপাসের মতো আট-দশ বাহু দিয়ে বিশ্বপুঁজি গোটা বিশ্বকে তার গ্রাসের মধ্যে আবদ্ধ করেছে। যেটি আজ দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে আমেরিকার জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার ৪.৭ শতাংশ হলেও তার বাজার বিশ্ববাজারের ৩১ থেকে ৩৫ শতাংশ।

ওয়াশিংটন সমঝোতা (Washington Consensus)

গোটা বিশ্বের ওপর মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন ছিল রাজনীতি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নীতির মধ্যে সমন্বয়। সেটি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইতিমধ্যে তাঁর ১৯৪৭ সালের ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন। একধরনের অনুকূল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার গুরুত্ব ব্রিটেন তার সময়ে বুঝেছিল। সে কারণে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে ব্রিটেন প্রথমে কর্ন আইনের (১৮১৫-১৮৪৬) আওতায় প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সেই ব্যবস্থায় কয়েকটি স্তম্ভ ছিল। প্রথমত, মুক্ত বাণিজ্য। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে লেসে

ফেয়ারের আওতায় অর্থনৈতিক উন্নতি আনা। তৃতীয়ত, স্বর্ণ স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা। স্বর্ণের সঙ্গে প্রতিটি দেশীয় মুদ্রা যুক্ত করে তাদের মূল্য নির্ধারণ করা। চতুর্থত, শ্রমের সহজ বিতরণ নিশ্চিত করা। পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক সম্পত্তি অধিকার। এই পাঁচ স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটেন তার আধিপত্য টিকিয়ে রাখলেও সেই ব্যবস্থা প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভেঙে পড়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বৈশ্বিক নিয়ম গড়ে তোলে, সেখানে দুই ধরনের কৌশল গ্রহণ করা হয়। একদিকে উদারনীতিভিত্তিক বৈশ্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাঠামো নিশ্চিত করা। সেখানে কয়েকটি দিক ছিল গুরুত্বের—তার মধ্যে বহুজাতিভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রথা চালু করা; বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলা; যৌথ নিরাপত্তার উদ্যোগের ওপর জোর দেওয়া; সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক আইন-নিয়ন্ত্রিত কাঠামো গড়ে তোলা। এভাবে আমেরিকা তার তৈরি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে অন্যান্য দেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত ব্রেটন উডস সম্মেলনে। ওই সম্মেলনে বিশ্বশান্তির চিন্তা মাথায় রেখে গড়ে তোলা হয়েছিল ওয়াশিংটন সমঝোতা নামের একটি কাঠামো। এই সমঝোতার মূলনীতি আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে চারটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠানগুলো একে অপরের পরিপূরক। তারা ভবিষ্যৎ বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান বের করার দায়িত্ব লাভ করলেও তারাই আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের মূল হাতিয়ার এবং বিশ্বায়নের প্রধান বাহক।

জাতিসংঘের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর সান ফ্রান্সিসকো শহরে। প্রথম পর্যায়ে ৫১টি দেশ এই সংগঠনে যোগ দেয়। ২০০৬ সালের মধ্যে জাতিরাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯২। প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের দিক হলো ১. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ২. বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে হুমকি যৌথভাবে মোকাবিলা করা। ৩. শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করা। ৪. সুবিচার এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অনুগত থাকা। ৫. সম-অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা। ৬. অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানবিক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা। মানবাধিকার নিশ্চিত করা। বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করা। শান্তি প্রতিষ্ঠায় দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া। এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জাতিসংঘকে ৬টি প্রধান ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। ১. সাধারণ পরিষদ ২. নিরাপত্তা পরিষদ ৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল ৪. ট্রাস্টি কাউন্সিল ৫. আন্তর্জাতিক বিচার কোর্ট ৬. জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েট। জাতিসংঘ একদিকে যেমন বিশ্বায়নের পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তেমনি বিশ্বকে করেছে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্বের অধীন। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের প্রতিটির ওপর ভোটাধিকারবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রশক্তি তাদের প্রভাব নিরঙ্কুশ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রধান সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো অধিকার থাকায় বিশ্বের শক্তিশালী কিছু দেশের প্রভাব ও ক্ষমতা অনেক বেশি। সাধারণ পরিষদে সম-অধিকার থাকলেও তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক না হওয়ায় তার গুরুত্ব তেমন অনুভূত হয় না।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এই সংস্থা গড়ে তোলার কারণ ১৯৩০ সালের মতো অর্থনৈতিক মন্দা ভবিষ্যতে এড়িয়ে যাওয়া। তবে আইএমএফ প্রতিষ্ঠার পেছনে যে কমিশন দায়িত্বে ছিল তার ওপর আমেরিকার ট্রেজারির বিপুল প্রভাব লক্ষ করা গেছে। ট্রেজারির দায়িত্বে যিনি ছিলেন তাঁর নাম হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের হেড কোয়ার্টার ওয়াশিংটন ডিসি এবং নিউইয়র্কে স্থাপন করার পেছনে ওই চাপ বিশেষ কাজে দেয়। এই সংস্থার ওপর দায়িত্ব আসে মার্কিন ডলারকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, আন্তর্জাতিক মুদ্রার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার; বিনিয়োগ স্থায়ী করা; একাধিক উপায়ে ঋণ পরিশোধের নিয়ম রাখা; অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে সদস্যদেশকে সাহায্য করা; জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে জাতিরাষ্ট্রের অনুদান নির্ধারণ করা ইত্যাদি। তবে ব্যালেন্স অব পেমেন্টকে সুষম করার প্রাথমিক যে দায়িত্ব ধার্য হয় সেটি বদলে পরবর্তী সময়ে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনকে মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়। নানা ধরনের শর্ত আরোপ এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার পরামর্শ দিয়ে এসব দেশের ওপর এই সংগঠন আমেরিকার মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব নিশ্চিত করেছে। কাঠামোগত প্রোগ্রাম বলতে অর্থনৈতিক এবং মুদ্রানীতির কাঠামোর মধ্যে দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত দেশগুলোকে টেনে আনা বোঝায়। এসব দেশে ব্যক্তিমালিকানা এবং উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক মডেল অনুসরণের উপদেশ দেওয়া হয়। এর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত মুদ্রা অবমূল্যায়নের উপদেশ, রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুল্কমুক্ত নীতি প্রবর্তন করা, কোটামুক্ত করা, ভর্তুকি উঠিয়ে দেওয়া, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, ভারসাম্য বাজেট প্রণয়ন করা (কর বৃদ্ধি এবং সামাজিক কল্যাণের খাতকে সংকুচিত করা)। এগুলো উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সমান। ভোটের ক্ষেত্রেও তারতম্য রয়েছে। ভোটদানের ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছিল জাতীয় আয়ের ওপর ভিত্তি করে। সেই হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ভোট ৩ লাখ ৭১ হাজার ৭৪৩, অর্থাৎ মোট ভোটের ১৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে নানা ধরনের শর্ত, যার কারণে সুবিধার চেয়ে অনেক

উন্নয়নশীল দেশ অসুবিধার মধ্যে আটকা পড়ে। এই প্রতিষ্ঠানের তদারকির কারণে জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌম বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকে। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটে স্পেন, গ্রিস বা অন্যান্য দেশের অর্থনীতি চাঙা করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্বব্যাংক একধরনের কো-অপারেটিভের মতো কাজ করে। ১৮৫ জন সদস্যের সবাই এক একজন শেয়ারের মালিক। বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রণভার বোর্ড অব গভর্নরের হাতে ন্যস্ত। গভর্নর হলেন প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী। তাঁরা বছরে একবার বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তহবিলের সঙ্গে মিলিত হন। বিশ্বব্যাংক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে সাহায্য করে, ব্যক্তিগত বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। এই লক্ষ্যে প্রায় ১০ হাজার বিশেষজ্ঞ ওয়াশিংটনে প্রতি দেশ থেকে কাজ করে এবং ১০০টির বেশি দেশে তার আঞ্চলিক অফিস আছে। তবে ব্যাংকের উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন হলেও তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন আছে। অনেকে তাকে মার্কিন আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে দেখে। অন্যদিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বাণিজ্য প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদকে উৎসাহিত করে। সরকারি পর্যায়ে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত করা, বাণিজ্য আইনের কাঠামোয় কাজ করা এবং বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি করা এই সংস্থার প্রধান কাজ। বাণিজ্যে কর প্রয়োগ না করে বিশ্ব বাণিজ্যকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গড়ে তোলা হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরিচালনায় সব দেশের অংশগ্রহণ থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ওর ওপর অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি। যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আদালত আছে সেখানে যেকোনো দেশ বাণিজ্য ইস্যু নিয়ে বিচার দাবি করতে পারে। কিন্তু সেই আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

সামরিক শক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যবস্থার ওপর তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব টিকিয়ে রেখেছে বাহুবল দিয়ে। এ ক্ষেত্রে সে সচরাচর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে একলা চলো নীতি অনুসরণ করে। ফলে ব্রেটন উডসের আওতায় যে উদারনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল সেটি প্রায় ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করা হয় নানা যুক্তি দেখিয়ে, নানা দেশের ওপর রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে অথবা হুমকি দেখিয়ে। আমেরিকার পক্ষে একলা চলো নীতি বাস্তবায়ন করা কঠিন নয়। কারণ সমসাময়িক বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাহুবলের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। পৃথিবীর মিলিটারি বাজেট যদি ১ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার হয়, তাহলে সেখানে আমেরিকার অংশ ৩৭ শতাংশ। প্রতিরক্ষা খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরে

৫৯৭ থেকে ৬২০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। অন্য দেশের সঙ্গে এই ব্যয়ের তুলনা করা যায়। চীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর অর্থনীতি হয়েও তার সামরিক বাজেটকে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে রেখেছে। সামরিক বাজেটের দিক থেকে ভাবলে তৃতীয় স্থানে সৌদি আরব। তার বাজেট ৮৭ বিলিয়ন। রাশিয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবলেও সামরিক খাতে তার ব্যয় মাত্র ৬৬ বিলিয়ন ডলার। বাকি দেশগুলোর ক্ষেত্রেও ওই একই চিত্র লক্ষ করা যায়। ইংল্যান্ডের সামরিক বাজেট হচ্ছে ৫৫ বিলিয়ন, ভারতের ৫১ বিলিয়ন, ফ্রান্সের ৫০ বিলিয়ন, জাপানের ৪০ বিলিয়ন এবং জার্মানির ৪০ বিলিয়ন (তথ্য আল-জাজিরা)। তার অর্থ হচ্ছে, সামরিক খাতে আমেরিকার বাজেট চীন, সৌদি আরব, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, ফ্রান্স ও জাপানের সম্মিলিত বাজেটের চেয়েও বেশি (Stockholm International Peace and Research Institute ২০১৬)।

যুক্তরাষ্ট্রের কোনো উপনিবেশ নেই বলে আমরা জানি। কিন্তু সেটি আমেরিকা পুষিয়ে নিয়েছে অন্য দিক থেকে। ৪০টিরও বেশি দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। সেগুলো উপনিবেশের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। ঘাঁটিগুলো আমেরিকার ফরোয়ার্ড ডেপ্লয়মেন্ট হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সেগুলো অঞ্চলভিত্তিক এবং একীভূত কমান্ডের অধীনে। ইউরোপীয় কমান্ডের (EUCOM) অধীনে মোতায়েন আছে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্য। এর হেডকোয়ার্টার জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে। এর অধীনে বেলজিয়ামে আছে ১ হাজার ৩৬০ জন, জার্মানিতে ১৭ হাজার ৫০০, গ্রিসে ৬৩৫, ইতালিতে ১১ হাজার, স্পেনে ২ হাজার ৪৩৩, ব্রিটেনে ১১ হাজার এবং ভূমধ্যসাগরে ১৪ হাজার। প্রশান্ত মহাসাগরীয় (USPACOM) কমান্ডের সদর দপ্তর পার্ল হারবারে। সেখানে রয়েছে আমেরিকার প্যাসিফিক ফ্লিট এবং তৃতীয় নৌবহর। তা ছাড়া সেনা উপস্থিতি রয়েছে হাওয়ায়ে, যার সংখ্যা ২৮ হাজার জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬৬ হাজার, জাপানে ৩৭ হাজার, অস্ট্রেলিয়ায় ১ হাজার ২০০। মধ্যপ্রাচ্য কমান্ডের (USCENCOM) সদর দপ্তর মিসরের সাইনায়ে। মার্কিন সেনাবাহিনীর উপস্থিতি রয়েছে সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে। আমেরিকার দক্ষিণ কমান্ডের (USSOCOM) সদর দপ্তর পানামায়। এর অধীনে হন্ডুরাসে আছে ৫৬ জন সৈন্য, পানামায় ৬ হাজার ২০০ জন। আটলান্টিক কমান্ডের (USLANTCOM) সদর দপ্তর ভার্জিনিয়ার নরফরকে। এর অধীনে কিউবার গুয়ানতানামো বেতে আছে ১ হাজার ৬৪০ জন, আইসল্যান্ডে ২ হাজার ৫০০ জন, আজর দ্বীপপুঞ্জে ৯৭০ জন। এ ছাড়া ভারত মহাসাগরে রয়েছে দিয়েগু গার্সিয়া সামরিক ঘাঁটি। অর্থাৎ এমন কোনো অঞ্চল পৃথিবীতে নেই, যে অঞ্চল মার্কিন কর্তৃত্বের বাইরে। ২০০১ সালের দিকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দেওয়া বিবৃতিতে দেখা যায়, গোটা বিশ্বে আমেরিকার ৭২৫টি সামরিক ঘাঁটি আছে।

লে পানিচ এবং সাম গিন্দিন লক্ষ করেছেন, ১৮৬৯ থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যে আমেরিকান নৌবাহিনী ৫ হাজার ৯৮০টি সামরিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল (পানিচ লিও ও কলিন লেস সম্পা: সোস্যালিস্ট রেজিস্টার ২০০৪: ৩১৩)। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা। আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নিজের অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৫০ সালে পুয়ের্তোরিকোতে স্বাধীনতার দাবিকে নস্যাৎ করা হয় মার্কিন সৈন্য দিয়ে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মার্কিন সৈন্য কোরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। ১৯৫৩ সালে ইরানে নির্বাচিত মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাতে সিআইএ ভূমিকা রাখে। ভিয়েতনামে ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সামরিক হস্তক্ষেপ ইতিহাসে আগ্রাসী নীতির অন্যতম উদাহরণ হয়ে আছে। ১৯৬৪ সালে পানামাতে আমেরিকা সৈন্য পাঠিয়ে পানামা খালের ওপর ওই দেশের সার্বভৌমত্বের দাবি নস্যাৎ করে। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সেই হস্তক্ষেপে ১০ লাখের বেশি কমিউনিস্ট নিহত হয়েছিল। ১৯৬৫-১৯৬৭ সালে ডমিনিকান রিপাবলিক এবং গুয়াতেমালায় আমেরিকা হস্তক্ষেপ করে। কম্বোডিয়ায় ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত আছে মার্কিন সমরনীতি। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নিকারাগুয়ায় হস্তক্ষেপের কথা আমরা জানি। ১৯৮৩-১৯৮৪ সালে গ্রানাডাতে মার্কিন বাহিনী হামলা করে বিপ্লবকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে। ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরাকের পক্ষে মার্কিন বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। ১৯৮৯ সালে পানামায় সরকার উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কয়েক হাজার সেনা পাঠানো হয়। ১৯৯০-৯১ সাল পর্যন্ত ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকা সেনা পাঠায়। ২০০৩ সালে ইরাক দখল করতে দেখি। ২০০১ সালে আফগানিস্তান, ২০১৪ সালে সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি অঞ্চলে সামরিক হস্তক্ষেপ তার সামরিক ইতিহাসের কলঙ্ক হয়ে আছে।

সামরিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কথা ধরা যাক। কারণ সেখানেই তৈরি হচ্ছে সবচেয়ে উন্নততম মারণাস্ত্র। সামরিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রথম ১১টির মধ্যে ৯টি আমেরিকার, ২টি ইউরোপীয়। এই সামরিক শিল্পই কিন্তু ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দা থেকে আমেরিকাকে উদ্ধার করেছিল। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ক্ষমতায় আসার পাঁচ বছর আগে আমেরিকার নিওকনরা (নব্য রক্ষণশীলেরা) 'কমিটি অন দ্য প্রেজেন্ট ডেনজার' নামে একটি কমিটি গঠন করে। ৬১ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ছিলেন প্রধান প্রধান নিওকন, যাঁদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে রিগ্যানের প্রশাসনে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ডোনাল্ড রামসফেল্ড, জর্জ সুলটস, রিচার্ড পারলস, উইলিয়াম ক্রিস্টল, রিচার্ড পাইপ্স উল্লেখযোগ্য (প্রেট্রাস ও ভেল্টমেয়ার, ২০০৫: ১৮৬)। ক্লিনটনের সময় তাঁরা 'প্রজেক্ট ফর অ্যান আমেরিকান সেঞ্চুরি' গঠন করেন। তাঁদের লক্ষ্য

মধ্যপ্রাচ্যের তেলের খনি। কন্ডোলিৎসা রাইস এবং কলিন পাওয়েল তৈরি করেন 'ডিফেন্স গাইডেন্স' প্ল্যানিং, যেখানে আরও জোরেশোরে আমেরিকান নীতি বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়। ইরাক ও আফগানিস্তান দখল করার মূল লক্ষ্য ছিল মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করা এবং রাশিয়ার আশপাশে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আমেরিকার লক্ষ্য হচ্ছে মধ্য এশিয়া দিয়ে তেল এবং গ্যাস পাইপলাইন ভারত মহাসাগরে আনা। এভাবে রাশিয়া ও ইরানকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে আমেরিকার আশা। ন্যাটো নামে যে সামরিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, সেটিও এই সার্বিক মার্কিন প্রভাবিত নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক বিশেষ ধরনের অবকাঠামো গড়ে তুলেছে, যা তার অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। আজকের ইন্টারনেটের বদৌলতে একধরনের সুপার হাইওয়ে গড়ে তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক শক্তি

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এডওয়ার্ড সাইদ কোনো একসময় লিখেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে। কথাটা মিথ্যা নয়। ইতিহাসে দেখেছি সংস্কৃতি এবং আদর্শ এমন একটি জগৎ, যাকে ব্যবহার করে নানা শক্তিধর দেশ তার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার সময়ে সেটি করেছিল। রোমান সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে পারস্য সাম্রাজ্য বা রুশ বা অটোমান সাম্রাজ্য—সবাই তাদের চারপাশে আদর্শের বেষ্টনী গড়ে না তুলে শাসন করেনি বা বিশ্বপ্রভুত্ব টিকিয়ে রাখেনি। যে আদর্শই (টীকা ১) ধরি না কেন, সেখানে নানা ধরনের প্রতীকী শব্দ থাকে। সেগুলো ব্যবহার করা হয় নানা লক্ষ্য নিয়ে। তার মধ্যে অন্য দেশের সংস্কৃতি নিজের সংস্কৃতি থেকে পৃথক করে দেখা একটি। সেই দেখার মধ্যে থাকে উন্নাসিকতা, ঘৃণার ছোঁয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নিজেকে অন্যান্য সব সভ্যতা বা সংস্কৃতি থেকে ভিন্নভাবে তুলে ধরে (Orientalist)। সেই ভিন্নতাকে নানাভাবে মানুষের মনে প্রোথিত করা হয় মিডিয়া বা অন্যান্য মাধ্যমের সহায়তায়। আমেরিকা ব্যতিক্রমী (American exclusiveness) একটি দেশ—এই দাবি করে আমেরিকার জীবনধারাকে সর্বজনীন হিসেবে দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়। তাকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে অন্যান্য সমাজে আমেরিকান স্টাইলে জীবন পরিচালনার উপদেশ থাকে। বিগত বছরগুলোতে আমেরিকা এভাবে সে তার হেজিমনি (টীকা ২) প্রতিষ্ঠা করেছে। গড়ে তুলেছে এমন একটি আদর্শিক কাঠামো, যেখানে অন্য দেশকে নানাভাবে হেয় করা হয়, ভুল তথ্য দিয়ে তাদের ইতিহাসকে বিকৃত করা

হয়। নানা ধরনের শব্দ চয়ন করে নিজের ক্ষমতার আশপাশে এভাবে গড়ে তোলা হয়েছে অদৃশ্য এক প্রতিরক্ষা অঞ্চল।

এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই ধরনের কৌশল গ্রহণ করে। একদিকে তাকে দেখি কঠিন বা দমনমূলক শক্তি প্রয়োগ করতে। সেই কঠিন শক্তির (coercive power) মধ্যে রয়েছে আইন, সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও জেলখানা। প্রতিপক্ষের মনে ত্রাস, ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে তার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জের ঊর্ধ্বে রাখার স্বপ্ন দেখা হয়। সেটি আমরা দেখেছি নানা ক্ষেত্রে—ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, লিবিয়ার মতো দেশে। প্রয়োজনে আমেরিকা অন্য দেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার নামে অন্য দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। আরও রয়েছে নিপীড়ন। সন্ত্রাস দমনের নামে কীভাবে গণহারে আফগানিস্তান বা ইরাক থেকে যুদ্ধবন্দী বা সন্দেহভাজনদের নিয়ে কিউবার গুয়ানতানামো বে নামক স্থানে আটক রাখা হয়েছিল। তবে এরই পাশাপাশি আছে নরম শক্তির প্রয়োগ। নরম শক্তি (persuasive power) বলতে বোঝায় আদর্শ দিয়ে অন্যের মনকে প্রভাবিত করা। সেটি করা হয় নানা উপায়ে—পরিবারকে ব্যবহার করে, চার্চকে দিয়ে নানা কিছু প্রচার করে, শিক্ষা ও মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে। আদর্শগত যুদ্ধটি তো আর এক দিনের ব্যাপার নয়। সে কারণে এটি পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের সহায়তায়। এখানে আমেরিকা কী ধরনের যুদ্ধ পরিচালনা করে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা যায়। পাবলিক ডিপ্লোম্যাসির ওপর মার্কিন উপদেষ্টা কমিশন বলে একটি শাখা আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টে রয়েছে। ওই শাখা থেকে ২০০৫ সালে বলা হয়েছে, আমেরিকা তার প্রভাব বজায় রাখতে কী ধরনের পাবলিক কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই কূটনীতির মূল দিক হচ্ছে তথ্য দিয়ে অথবা কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে বিদেশি নাগরিকদের প্রভাবিত করা। এই কূটনীতির মধ্যে পড়ে প্রচার, সংস্কৃতি, শিক্ষা, তথ্য, নাগরিক আদান-প্রদান। পাবলিক কূটনীতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরে ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। সাংস্কৃতিক কূটনীতিও এর অন্যতম অংশ। তার মধ্যে রয়েছে শিল্প-সংস্কৃতি, মার্কিন সিনেমা, সংগীত, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি আদান-প্রদান, অন্য দেশের সঙ্গে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহযোগিতার নামে মার্কিন জীবনধারা প্রচার করা (ইজাদি, ২০১ পৃ. ১৬)।

এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে কার্যকর। সংস্কৃতি বলতে এখানে উচ্চমানের সংস্কৃতি বলছি না। বলছি প্রাত্যহিক জীবনাভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত যেসব গণভিত্তিক সংস্কৃতি, সেগুলোকে। যেমন খাদ্যাভ্যাস। মার্কিন ধাঁচে যেসব রেস্তোরাঁ বা ফাস্ট ফুডের দোকান চালু আছে, সেগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে মার্কিন প্রভাবকে ছড়িয়ে দেওয়ার। ম্যাকডোনাল্ড, কেএফসি, কোকাকোলার মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান তার উদাহরণ। মিডিয়ার

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখি হলিউড বা ডিজনিল্যান্ডকে। এগুলো উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যিক পর্যায়ে বিতরণ করা হয় তুলনামূলকভাবে কম মূল্যে। ফলে ওই সব দেশ ওই ধরনের সিনেমা তৈরি করে না। এভাবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অনেকে একে দেখে থাকেন ইলেকট্রনিক সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে। ইংরেজি ভাষারও গুরুত্ব রয়েছে। বই প্রকাশ থেকে শুরু করে পাঠ্যসূচি তৈরি করে উন্নয়নশীল দেশের ওপর সেগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়। সাহিত্য ছায়াছবি, ইন্টারনেট, সংগীত ইত্যাদি ধরনের মার্কিন সাংস্কৃতিক পণ্য রপ্তানি করে সাংস্কৃতিক আধিপত্য নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। আজ ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ ছবি ইউরোপে আসে আমেরিকার হলিউড থেকে। সে তুলনায় ইউরোপের নিজস্ব ছবির পরিমাণ মাত্র ৩ শতাংশের বেশি নয়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে হলিউডের ছবির পরিমাণ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত হতে দেখি। এসব ছবিতে আমেরিকার জীবনধারা তুলে ধরা হয় এবং তাকে আদর্শ হিসেবে দেখার তাগিদ থাকে। সাদা অ্যাংলো-সাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কৃতিকে দেখানো হয় সমাজের স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে। ঐতিহাসিক ছবিতে আমেরিকাকে দেখানো হয় বিশ্বসভ্যতার ধারক হিসেবে, যেন বিশ্বকে নানা ধরনের আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব একমাত্র তার। ইরান, রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়াকে শত্রু বানানো হয়। অন্যদিকে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে বড় করে দেখানো হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আমেরিকার মূল্যবোধ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। তার প্রতিফলন লক্ষ করি *এয়ারফোর্স ওয়ান* (১৯৭৭ সালের ছবি), *ইনডিপেনডেন্স ডে* (১৯৯৬), *সেভিং প্রাইভেট রায়ান* (১৯৯৮) ইত্যাদি ছবিতে। এমনকি অন্যান্য দেশের লোকগাথাকে বিকৃত করতে হলিউড দ্বিধা করে না। যেমন ডিজনি মুভি *মুলান* (১৯৯৮)। মিডিয়ার গুরুত্ব অস্বীকার করা কঠিন। সিএনএনের মতো মিডিয়া দর্শকের কাছে সংবাদ পরিবেশন করে আমেরিকার জীবন ও রাজনীতির আলোকে। সেখানে নিরপেক্ষতার আড়ালে পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়। তা ছাড়া এমন সব ইস্যুর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেগুলো অন্য দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। যেমন গে (Gay) অধিকার প্রচার করা। আফ্রিকার মতো দেশে এই ইস্যু অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমেরিকা সাবসাহারার মতো অঞ্চলে ৩৫০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে গে অধিকার প্রচারকাজে। আরও রয়েছে নানা দেশে তার সমর্থক রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক। ইরানের এককালের রেজা শাহ পাহলভি, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন, মিসরের হোসনি মোবারক, পাকিস্তানের জেনারেল মোশাররফ অথবা আফগানিস্তানের হামিদ কারজাই তার কিছু উদাহরণ।

যদি এ সবকিছুকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়, তাহলে দেখি এই বিশাল কাঠামো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতিকে তুলে ধরছে নানাভাবে, নানা

পথে। সেই আগ্রাসী রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নব্য রক্ষণশীল ধারা প্রবর্তন করে। প্রফেসর অ্যান্ড্রু বাকভিচ (বাকভিচ, ২০০৯ : ৩৪) আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে, আমেরিকার বিশ্বনেতৃত্বকে (domination) কল্যাণকর বলে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ আমেরিকার উদ্দেশ্য অন্যের মঙ্গল করা। ধরে নিতে হবে মার্কিন নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের দুর্বলতা (lapse) বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে। সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং তার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা জরুরি হলেও ন্যায়সংগত। অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের লক্ষ্যে আমেরিকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে একাধিক অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক তৎপরতা কার্যকর করা প্রয়োজন। আমেরিকার বহির্দেশীয় কূটনীতি এবং রাজনীতি হবে আক্রমণাত্মক এবং যেকোনো শক্তিকে পরাজিত করা তার একমাত্র লক্ষ্য। এভাবে তার নিজের এক জগৎ তৈরি করে অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও আদর্শের জগৎকে সে নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশ্ব ট্র্যাজেডির কথকতা

বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখানে তার একটি সার্বিক মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি নিয়ে সেটি শুরু করতে চাই। রবিঠাকুর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক সমালোচনায় লিখেছেন, 'মহাভারতের অপেক্ষা মহান ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহণ কালে দ্রৌপদী ও ভিমার্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভিম কর্ণ দ্রৌন এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবদিগের জয় হইল তখনি মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এতো দুঃখ এতো যুদ্ধ এতো রক্তপাতের পর দেখিলেন হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্দমেই সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায় যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৮৯ পৃষ্ঠা ৫)। কথাটা কিন্তু গভীরভাবে সত্য এবং সে সত্য কেবল মহাভারতের চরিত্রের জন্য প্রযোজ্য নয়। বিগত তিন দশক ধরে বিশ্বায়ন অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়ে এসেছে। যোগাযোগব্যবস্থা থেকে শুরু করে বাণিজ্য, অর্থ বিনিয়োগ, যাতায়াত, অভিবাসন—সব ক্ষেত্রে এসেছে গভীর ও বিস্তৃত পরিবর্তন। বহু দরিদ্র দেশ ধনী হয়েছে। ধনী দেশ আরও ধনী হয়েছে। সমাজের দরিদ্র স্তরের মানুষের জীবনে এসেছে প্রাচুর্য। আন্তরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি

পেয়েছে। নানা ধরনের চুক্তি সই করে বিভিন্ন দেশ বাণিজ্য আঁতাত গড়ে তুলেছে। তাতে করে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তবাণিজ্যের সুযোগ। তবে বিশ্ব অর্থনীতির জন্ম হয়েছে বলে যে কথাটি শোনা যায়, সেটি আসলে কয়েকটি প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্লক ছাড়া কিছু না। তার মধ্যে ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যার অভ্যন্তরে গড়ে উঠছে পুঁজিবাদের বিভিন্ন ধরন। এর বাইরে যারা আছে তারা ওই তিন অঞ্চলের চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে পুরোনো ধাঁচের ভূরাজনীতি, যেখানে জাতিস্বার্থ প্রবল গতিতে জন্ম দিচ্ছে যুদ্ধংদেহী মনোভাবের। ফলে মাথাচাড়া দিচ্ছে এক নব্য সাম্রাজ্যবাদ। এ সবকিছুকে বিশ্বায়নের সাফল্য হিসেবে মন্তব্য করলেও এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে ট্র্যাজেডি। আছে সংকট, পতন, ধ্বংসের বীজ। সে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া ট্র্যাজেডির মর্মকথাটি বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক খেটে যায়।

ক্যাপিটালিজম অব নাথিং

বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ায় গতি জোগায় পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এড্রিয়ান উলড্রিজ (উলড্রিজ, ২০১৭) নামে এক ব্রিটিশ পণ্ডিত, আজকের দিনের পুঁজিবাদকে 'ক্যাপিটালিজম অব নাথিং' বলে দাবি করেছেন। অতীত দিনের পুঁজিবাদের মতো তার নানা সাফল্য আছে। কিন্তু তার পাশাপাশি রয়েছে বিপুল মানুষের দুর্ভোগের ইতিহাস, দারিদ্র্যের কঠোরতা, হতাশা, যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতি। এর সঙ্গে নতুন যে উপাদান যুক্ত হয়েছে তা হলো—বড় বড় কোম্পানির হাতে প্রচুর সম্পদ কেন্দ্রীভূত হলেও ওই সব কোম্পানিতে নিয়োজিত শ্রমিক বা কর্মচারীদের সংখ্যা কমছে ক্রমাগত। গুগলের মতো বিশাল কোম্পানির শ্রমশক্তি মাত্র ৫০ হাজার। অথচ অর্থের দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম বড় এক কোম্পানি। এই 'ক্যাপিটালিজম অব নাথিং'-এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর কারণে আমেরিকার মতো বড় অর্থনীতির দেশে মানুষ চাকরি খোয়াচ্ছে, বেকার হচ্ছে। বহু চাকরি চলে যাচ্ছে বিদেশে। ডালাস, টেক্সাসের মতো এককালের বিত্তশালী মুখরিত শহর আজ হয়ে পড়ছে নিঃস্ব। আজ পুঁজির গন্তব্যস্থান দেশের বাইরে, যেখানে শ্রম সস্তা; পরিবেশ রক্ষা আইন প্রবলভাবে অনুসরণ করা হয় না; শুল্কের ক্ষেত্রেও রয়েছে প্রচুর সুবিধা। শ্রমশক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করার ট্রেড ইউনিয়ন নেই। ফলে কোম্পানির মুনাফা অনেক বেশি। দেশের অভ্যন্তরেও ঘটছে এই ধারার প্রয়োগ। মার্কিন কোম্পানি পুঁজি স্থানান্তর করছে দেশের এমন সব অঞ্চলে, যেখানে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার কোনো প্রতিরক্ষা নেই। জেনারেল ইলেকট্রিক নামের কোম্পানি তার পুঁজি এবং ব্যবসা সরিয়ে নিয়েছে মিয়ামিতে। সেখানে শ্রমের জন্য যে মূল্য দিতে হয়, সেটি আগের স্থানের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। ট্রেড ইউনিয়ন অনুপস্থিত। এ ছাড়া

রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বদলে জনপ্রিয় হচ্ছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও রক্ষণশীল নীতি। প্রবণতাটি বিচ্ছিন্ন নয়। গোটা বিশ্বে এটি দৃশ্যমান।

আমেরিকার ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং তার রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটতে দেখি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুটি স্লোগান থেকে, যা কিনা উগ্র জাতীয়তাবাদী—'আবার আমেরিকাকে শক্তিশালী এবং মহান করো' এবং 'আমেরিকানদের জন্য আমেরিকা'। এই স্লোগানের উদ্দেশ্য বিশ্বায়নসৃষ্ট সংকট থেকে আমেরিকাকে উদ্ধার করা। সে সংকট অনেকের ধারণায় প্রজন্মগত, যার শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালের বৈশ্বিক ফিন্যান্স ব্যবস্থার পতন দিয়ে। তার সঙ্গে আরও যোগ হয়েছে উগ্রবাদ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও (ফ্রিডম্যান, *দ্য আটলান্টিক*) এই সংকটের প্রতিফলন দেখছেন অনেকে। বিগত ১৫ বছরে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি সফল হয়নি। উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র থেকে বিরত রাখতে পারেনি। ইরানকে শায়েস্তা করতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব কমেনি (*দ্য আটলান্টিক*, ২০১৬)। ইরাক ও আফগানিস্তানে শান্তি আসেনি। সেখানে প্রগতিশীল, পশ্চিমা ঘেঁষা সরকার এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। জিহাদি শক্তিকে দমাতে পারেনি। আরব বসন্তের পর মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধি পায়নি। পূর্ব ইউরোপে রাশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। পারেনি এশিয়ায় চীনের শক্তিকে খর্ব করতে। ব্যর্থ হয়েছে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিরোধের মীমাংসা করতে। অথচ আমেরিকার প্রতিটি প্রজন্ম বড় হয়েছে মার্কিন সাফল্যকে গ্যারান্টি হিসেবে ধরে নিয়ে।

ফলে বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব এই সংকট থেকে উদ্ধার করা, জাতীয় আত্মপরিচয়কে ঝালিয়ে নেওয়া, নতুন আত্মপরিচয় গড়ে তোলা—বিদ্যমান কাঠামোয় পরিবর্তন এনে নতুন কাঠামো গড়া, ঠিক যেমন বনভূমির বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আগুন ধরাতে হয়, নদীর নাব্যতার জন্য প্রয়োজন হয় বন্যার (*দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট*, ২০১৭)। যে পথ এ ক্ষেত্রে অনুসরণের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তাতে রয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদ, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, মুক্ত বাণিজ্য বিরোধিতা, মুসলিম-বিরোধিতা এবং খ্রিষ্ট-ইহুদি ঐতিহ্যে নতুন আমেরিকা গড়ে তোলা। বিশ্বায়নবিরোধী এই প্রবণতা ইউরোপেও লক্ষ করার মতো। সেখানে তার রূপ যদিও কিছুটা ভিন্ন। আক্রোশটা সেখানে প্রথমে পড়তে দেখি ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বায়নের বড় প্রতীক। দেশের মধ্যকার সীমান্ত বিলোপ করে, একক অর্থনীতি ও মুদ্রাব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার আওতায় দেশের নীতি গড়ে তুলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বসংযোগের প্রকৃত উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। অথচ ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়ল। ফ্রান্স, হল্যান্ডের নানা দেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নবিরোধী তুফান আজ

ঘোরতর আকার ধারণ করছে। উদ্বাস্তু এবং বহিরাগত অভিবাসীর বিরুদ্ধে অবস্থান, তাদের উচ্ছেদ আন্দোলন এবং দেশের তাবৎ সমস্যার জন্য তাদের দায়ী করা বিশ্বায়নবিরোধী প্রবণতার অন্য দিক। মুসলিম জাতিবিদ্বেষের ভূমিকাও কম নয়। ফ্রান্সে বিশ্বায়নবিরোধী রাজনৈতিক নেত্রী ন্যাশনাল ফ্রন্ট পার্টির মেরিন লে পেনের জনপ্রিয়তা বেড়েছে মুসলিম-বিরোধিতার কারণে। নেদারল্যান্ডসে 'পার্টি ফর ফ্রিডমে'র নেতা গিয়ার্ট উইলডার্সের জনপ্রিয়তার মূলে মুসলিম-বিরোধিতা। ইমিগ্রেশন-বিরোধী জার্মান পার্টির নেতা উয়ে জুঙ্গের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে একই কারণে। গ্রিসে 'গোল্ডেন ডন' পার্টির নেতা নিকস মিকালোলিয়াকসের দল তৃতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জার্মানির অতিমাত্রায় কঠোর কৃচ্ছ্রতার উপদেশকে বিরোধিতা করছে। হাঙ্গেরির 'জোবিক পার্টি'র নেতা গাবোর ভেনার জনপ্রিয়তা ইদানীংকালে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুইডেনে 'সুইডিশ ডেমোক্র্যাটস পার্টি'র নেতা জিম্মি একেসনের অভিবাসনবিরোধী, ইউরোপীয় ইউনিয়নবিরোধী নীতি জনপ্রিয়। এভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে বিশ্বায়নবিরোধী নানা শক্তির উত্থান। এই সঙ্গে যোগ হচ্ছে প্রবল সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। একক পৃথিবী এবং বিশ্ব অর্থনীতির ধারণা নাকচ হচ্ছে। অসাম্যের দিক থেকে ভাবলে বিশ্বায়নের কুফল দুই দিক থেকে প্রতিভাত হয়। একদিকে উন্নয়নশীল দেশ এবং পশ্চিমা দেশের মধ্যে দূরত্ব আরও প্রসারিত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রতিটি রাষ্ট্রে কিছু মানুষ অভূতপূর্ব দ্রুততার সঙ্গে সম্পদের মালিক হয়ে বাকি সমাজ থেকে পৃথক হচ্ছে। যে সমাজকে সে পরিত্যাগ করছে সেখানে রয়ে গেছে লাখ লাখ দরিদ্র মানুষ।

সামাজিক বৈষম্য

বিশ্বায়নের কারণে সব দেশ একইভাবে উপকৃত হচ্ছে না। উন্নয়নশীল দেশগুলো অতি উন্নত দেশের সমকক্ষ হওয়া দূরের কথা, উল্টো আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদের ক্ষেত্রে গড়ে উঠছে ভয়ানক অসমতা। দক্ষিণ আমেরিকায় ১৯৯০ সালে ১৮৩ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। সেই সংখ্যা ১৯৯৫ সালে বেড়েছে (এখন দাঁড়িয়েছে ২৩০ মিলিয়ন) (রবিনসন ২০১২ : ২৫)। সেখানে ৫৯ মিলিয়ন মানুষ আজও ক্ষুধার্ত থাকে। ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ১০ লাখের হাতে অর্থ নেই চিকিৎসার সুযোগ নেওয়ার। ১৩ লাখের বিশুদ্ধ পানির ঘাটতি আছে। আর ১৭ লাখের কোনো স্বাস্থ্যকর শৌচাগার নেই (রবিনসন, ২০১২ : ২৫)। পূর্ব এশিয়ার উন্নতি নিয়ে আমরা গর্ব করি। বলি চীনের অগ্রগতির কথা। কোরিয়া থেকে শুরু করে টাইগার অর্থনীতি নামে পরিচিত দেশগুলোর ধনশালী হওয়ার কাহিনি। কিন্তু সেখানে মানুষের গড় আয় পশ্চিমা দেশের গড় আয়ের মাত্র ১৩ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের হিসাবমতে, গত ২০ বছরের মধ্যে যারা দিনে এক

ডলারে জীবন যাপন করত, তাদের সংখ্যা কমলেও ছয় বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ১-২ বিলিয়ন মানুষ ঠিকই ১৯৮৭-১৯৯৮ সালের মতো দিনে এক ডলার দিয়ে জীবন ধারণ করছে (ওয়েড, ২০১২ : ১৮৮)। অসমতা আরও বোঝা যায় ১৯৬০ ও ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ধনী পাঁচটি দেশের মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে দরিদ্র পাঁচটি দেশের মাথাপিছু আয়ের অনুপাত থেকে, যা বৃদ্ধি পেয়েছে আড়াই গুণ। ১৯৩৭ সালে বিশ্বের ১৪৭টি দেশের মধ্যে ১০০টি গত ৩০ বছরে অর্থনৈতিক অবনতির শিকার হয়েছে। ছয় বিলিয়ন জনসাধারণের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন বাস করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। সেখানে তাদের প্রতিদিনের আয় দুই ডলারের বেশি নয়। প্রায় ১-৩ বিলিয়ন মানুষ দিনে মাত্র এক ডলার দিয়ে জীবন যাপন করে।

বিশ্বব্যাংকের অন্য হিসাবে দেখা যায়, এক বিলিয়ন শিশুর প্রতি দুজনের মধ্যে একজন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। ৬৪০ মিলিয়ন মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। ৪০০ মিলিয়ন বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত, ১০-১১ মিলিয়ন প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করে পাঁচ বছরে না পৌঁছাতেই (২৯ হাজার শিশু প্রতিদিনে)। ১৮ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করে যে সংখ্যা সকল মৃত্যুর তিন ভাগের এক ভাগ এবং মৃত্যুর কারণ ক্ষুধা। প্রতিদিন ৫০ হাজার নারী-পুরুষের মৃত্যু হচ্ছে ক্ষুধা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, হাম ও জন্মসংক্রান্ত কারণে। অথচ দরিদ্র দেশগুলোতে ন্যূনতম শিক্ষা ও কল্যাণের পেছনে বছরে ৩০ থেকে ৪০ বিলিয়ন খরচই যথেষ্ট। দুঃখজনকভাবে এই অর্থের জোগান দেওয়া সম্ভব না হলেও চকোলেট এবং চুইংগামের পেছনে কেবল আমেরিকা ব্যয় করছে ২৭ বিলিয়ন, অ্যালকোহলের পেছনে ৭৩ বিলিয়ন, গাড়ির পেছনে ৬০০ বিলিয়ন। ইউরোপের ক্ষেত্রে ওই চিত্র ভিন্ন নয়। সিগারেট ও অ্যালকোহলের পেছনে সেখানে ব্যয় হয় ১৫০ বিলিয়ন, কুকুর-বিড়ালের পেছনে ১৭ বিলিয়ন। আর সামরিক খাতে? সেখানে তো খরচ আকাশচুম্বী। আমেরিকা লকহিড মার্টিন কোম্পানির তৈরি যুদ্ধজাহাজ এফ-৩৫-এর পেছনে ব্যয় হবে ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার (স্যর, ২০১৭)। ওই অর্থ দিয়ে আমেরিকার সব শিক্ষার্থীর শিক্ষা খরচ মেটানো যেত। সব নিম্ন আয়ের মানুষের মেডিকেল বিমা করা যেত অন্তত তিন বছরের জন্য। বিশ্বের চারদিকে চারবার তিন মিটার উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করা যেত (স্যর, ২০১৭)। এরই বিপরীতে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ২২৫ জনের সম্পদের পরিমাণ আজ দাঁড়িয়েছে এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। এই পরিমাণ ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন দরিদ্র মানুষের বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশি। ৪৮টি দেশের জাতীয় আয় পৃথিবীর তিনজন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির সম্মিলিত আয়ের চেয়েও কম। এই অসমতা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আশঙ্কার কথা, সেই অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেবল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে নয়। প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে সম্পদের বিভাজন প্রায় একই হারে বাড়ছে।

রাষ্ট্রের ভূমিকা কমে এসেছে

বিশ্বায়নের কারণে জাতিরাষ্ট্র তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। বিশ্বায়নের মূল দার্শনিক ভিত উদারনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতি, সমাজজীবন এবং রাজনীতিতে উদারনীতির প্রতিফলন নানাভাবে ঘটে। এটি যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংকটকে ঘনীভূত করতে পারে, সেটি আগে কেউ ভাবেনি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিও স্ট্রস (লিও স্ট্রস ১৮৯৯-১৯৭৩) সেটি লক্ষ করেছিলেন। অর্থনীতিতে উদারনীতি ভোগবাদী সমাজের জন্ম দেয়। তার চেয়েও বড় কথা, উদারনীতি সবকিছুকে প্রশ্ন করতে শেখায়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। শাসকশ্রেণির গ্রহণযোগ্যতাকে নিয়ে মানুষ প্রশ্ন করে। ফলে জন্ম নেয় এক জাতীয় নরম সর্বত্যাগবাদী (gentle nihilism) মনোভাবের। সমাজের প্রতিটি দিককে প্রশ্নবোধক করে তোলার যে সংস্কৃতি, তার কারণে আজ জন্ম নিচ্ছে একধরনের আপেক্ষিকতার (relativism)। এর ফলাফল—মূল্যবোধবর্জিত, লক্ষ্যহীন এবং সুখবাদী (hedonistic) এক সমাজ। এই সুখবাদ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তার সংহতি বিনষ্ট করছে। মানুষ স্বার্থপর হচ্ছে। সমাজের বাঁধন ভেঙে পড়ছে। অথচ বিকল্প এমন কোনো আদর্শ নেই, যা কিনা সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র পথ হিসেবে লিও স্ট্রস বলেছেন কল্পকথা সৃষ্টির কথা। এমনভাবে যেন সেগুলোকে মানুষ সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। সেই নীতির প্রতিফলন নানাভাবে লক্ষ করা যায় পশ্চিমা বিশ্বের ইদানীংকালীন রাজনীতিতে। জর্জ বুশের আমলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে লিও স্ট্রসের অনুসারী পল উলফভিচ (ডেপুটি সেক্রেটারি, প্রতিরক্ষা), এলেন কেইস (উপসেক্রেটারি, রাষ্ট্র); উইলিয়াম ক্রিস্টল, আলেন ব্লুম। তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ইরাকবিরোধী প্ল্যাটফর্মে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিল এবং সফলও হয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিতে 'বিকল্প সত্যের' নামে মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রচার করার তোড়জোড় চলছে এবং সেভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে নানা ধারণা। তবে সেটিও কত দিন টিকিয়ে রাখা যাবে, তাতে সন্দেহ আছে।

অন্যদিকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের গুরুত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে নানাভাবে। আগে বহুজাতিক/আন্তর্জাতিক মিটিং এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা মুখ্য ছিল। আজ আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার জাতীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিভিন্ন রেটিং কোম্পানি যেমন 'স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পোরস' রাষ্ট্রের ওপর খবরদারি করে। কোনো রাষ্ট্রের গুরুত্ব কতটুকু তা নির্ণীত হয় সরকারের অর্থ তহবিলের পরিমাণ দিয়ে, অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানার উপস্থিতি কতটুকু সেটি বিচার করে। এই ক্রেডিট বিশ্লেষণ নির্ণয় করে ব্যাংকের

কাছে রাষ্ট্র কতটুকু দায়বদ্ধতা এবং তা পরিশোধ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কতটুকু তার ওপর। ঋণদানকারী সংস্থাগুলো বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির পক্ষে। জাতীয় সরকার ঋণের আশায় এমন সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করতে বাধ্য হয় যেগুলো আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পুঁজির পক্ষে যায়। ওই নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে পুঁজি স্থানান্তরিত হয় সেসব দেশে, যেখানে রেটিং ভালো। *ওয়াশিংটন পোস্ট* প্রকাশিত ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আইএমএফের নীতিমালা কী সেটি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সেই নীতিতে উল্লেখ আছে, যেসব দেশে সমস্যা বিদ্যমান তাদের পেনাল্টি রেটে ঋণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ ৪-৫ এর বেশি হারে। রাষ্ট্রকে প্রমাণ করতে হবে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ মজুত আছে, বিদেশি ব্যাংককে ব্যবসা করার অধিকার নিশ্চিত করবে এবং স্থানীয় ব্যাংককে কিনে নেওয়ার অধিকার রাখবে। ধার গ্রহণকারী রাষ্ট্র দেউলিয়া নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে যে নীতি আমেরিকা ও ইউরোপে প্রযোজ্য। এভাবে অর্থনীতি সম্পৃক্ত হচ্ছে রাজনীতির সঙ্গে। কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক স্থিতিশীলতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং অন্য বহু ফ্যাক্টর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাগুলোর ওপর। তা ছাড়া বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কমছে। জাতীয় নিরাপত্তা, অভিবাসন, মুদ্রা বিনিময়, অর্থ ও বিনিয়োগ, বাণিজ্য, কারখানার উৎপাদন, স্বাস্থ্য এবং ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থানরত প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাচ্ছে অথবা তাদের সিদ্ধান্তকে রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বহুজাতিক করপোরেশনগুলো অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। আন্তর্জাতিক অথবা আঞ্চলিক সংগঠনের সদস্যপদও তার সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করছে। যেসব বাণিজ্য ব্লক যেমন ইসি, নাফটা, অ্যাপেক, সার্ক আছে তারাও খর্ব করছে সরকারের নিয়ন্ত্রণকে। সর্বোপরি বিশ্বায়ন রাষ্ট্রের ভিতকে দুর্বল করে ফেলছে।

আত্মপরিচয়ের সংকট ও ধর্মের উত্থান

উদারনীতির প্রভাব উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর পড়ছে অন্য একভাবে। জাতিরাষ্ট্র যে ধরনের সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান বলতে আত্মপরিচয়ের সংকটকে বোঝায়। আধুনিক জাতিরাষ্ট্র ইউরোপ ও আমেরিকায় গড়ে উঠেছিল আধুনিক জীবনধারা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আশ্রয়ে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ে তখন এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকায় ইউরোপের অনুকরণে জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দুই ধরনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। প্রথমত বহু জাতিরাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল জাতি ধারণাকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করে। প্রকৃত জাতিবোধ সেখানে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে। সে ধরনের চক্রান্তে ভারতবর্ষে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো। সেখানে

জাতিপরিচয় কৃত্রিমভাবে ধর্ম দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। ডুরান্ড লাইন টেনে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভেদরেখা আঁকা হয়েছিল প্রকৃত জাতিপরিচয়কে উপেক্ষা করে। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যে জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয় কৃত্রিম পথে—১৯১৬ সালের শাইকস-পিকট ব্রিটিশ-ফরাসি ষড়যন্ত্রে স্বাক্ষরিত চুক্তির ফল হিসেবে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এসব রাষ্ট্র টিকে ছিল সোভিয়েত অথবা মার্কিন সাহায্য নিয়ে। তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ঢাকা পড়েছিল ঠান্ডাযুদ্ধের দ্বিমুখী সংঘাতের আড়ালে (ককবার্ন, ২০১৬)। সেই পর্দা আজ সরে গেছে। তাদের সংকটও সে কারণে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় সংকট, কয়েক যুগ ধরে জাতীয়তাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতিরাষ্ট্র পরিণত হয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়। গণতন্ত্রের নাম ব্যবহার করে শাসিত হলেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা দেশ শাসন করেছে আইনের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে। শক্তি দিয়ে শাসন করায় বিদ্রোহ দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। সেই স্বৈরাচারী চরিত্র এত দিন ঢাকা পড়ে ছিল দুই পরাশক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের আড়ালে। জাতিরাষ্ট্রের ব্যর্থতার সুযোগে যে নতুন আদর্শের আশ্রয়ে মানুষ সংঘবদ্ধ হতে চায় তার একটি হচ্ছে ধর্ম। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানা দেশে। আধুনিক জীবনের পরিবর্তে সেখানে নতুন জীবন গড়ার তাগিদ লক্ষ করা যায়। পূর্বপুরুষের ইতিহাস, তাদের ঐতিহ্য ধারণ করা; তাদের বীরদের আদর্শকে প্রতিফলিত করা সেখানকার রাজনীতিতে বিশেষ প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ধরনের ধর্মীয় রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের ভূখণ্ড থেকে বের করে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ভারতে বিজেপির উদ্দেশ্য সেটি। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হিন্দু উচ্ছেদ করা। মিয়ানমারে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম রোহিঙ্গাদের উৎখাত করতে চায়। পাকিস্তানে সুন্নিরা মোহাজিরদের উৎখাত করতে আগ্রহী। আফগানিস্তানে হাজারা সম্প্রদায়কে দেশান্তরিত করা সুন্নি সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। শিয়াপ্রধান দেশকে সুন্নিমুক্ত করা, সুন্নিপ্রধান দেশকে শিয়ামুক্ত করা, ইউরোপকে মুসলিমমুক্ত করা এক বৈশ্বিক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। এসব থেকে বোঝা যায়, যে জাতিরাষ্ট্র আধুনিক, গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল, সেই জাতিরাষ্ট্র আজ আদর্শগতভাবে গভীর সংকটে নিমজ্জমান। তার কাঠামো ভেঙে পড়ছে। ধর্মের ভাষা আজকের দিনের সাম্রাজ্যবিরোধী জাতীয়তাবাদভিত্তিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। জাতিরাষ্ট্রের যারা কর্ণধার ছিল তারা স্বৈরাচারী শাসনকে টিকিয়ে রেখেছিল সমাজতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল শক্তিকে পদানত করে। সেটি করতে গিয়ে তারা সে সময় ধর্মীয় শক্তির সঙ্গে আঁতাত করেছিল। আজ ধর্মীয় শক্তি ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী টোনিজ (১৮৮৭-১৯৭১) সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। একটি প্রাক্-আধুনিক সমাজ। তাকে তিনি বলেছিলেন জেমেনসাফট (Gemeinschaft)। আর আধুনিক সমাজকে জেসেলসাফট (Gesellschaft)। প্রথমটিতে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ ও উষ্ণ সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক বন্ধুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অভিন্ন পরস্পর বিশ্বাস বোধ দিয়ে গাঁথা। দ্বিতীয় সম্পর্কটির ধরন অস্থায়ী, হালকা, অগভীর, চুক্তিভিত্তিক এবং স্বার্থের ওপর নির্মিত। বস্তুগত উন্নতির কারণে সমাজে জন্ম নেয় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। বিশ্বায়নের কারণে সেই বিচ্ছিন্নতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত প্রধান পাঁচটি প্রবাহ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলছে। ওই প্রবাহকে আপাদুরাই (আপাদুরাই ১৯৯০ : ৪) নামের একজন নৃবিজ্ঞানী বলছেন স্কেপ। বিশ্বায়নের প্রধান প্রবাহ মানুষকে নিয়ে (Ethnoscapes)। মানুষের স্রোতোধারা এক স্থান থেকে চলেছে অন্য স্থানে। এর মধ্যে আছে ভ্রমণকারী, উদ্বাস্তু, অভিবাসী, অতিথি শ্রমিক আরও আছে অগণিত মানুষ, যারা সার্বক্ষণিকভাবে গতির সঙ্গে বাঁধা। মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হচ্ছে নানা কারণে। গ্রাম থেকে মানুষ স্রোতের মতো ধেয়ে আসছে শহরপানে। উদ্বাস্তুরা চলেছে উন্নত দেশগুলোতে। অতিথি শ্রমিক গ্রাম ছেড়ে বড় শহরের দিকে চলছে। মানবশ্রমের এই স্রোতোধারার মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক পুঁজির চরিত্রগত পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক পুঁজি আজ তার সুবিধামতো স্থানান্তরিত হচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। পুঁজি কোথায় যাবে নির্ভর করছে মুনাফার পরিমাণ কোথায় বেশি তার ওপর। এই অস্থিতিশীল জীবনে মানুষের কল্পনার কোনো স্থায়িত্ব নেই। সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানের যোগাযোগ বিনষ্ট হচ্ছে। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির কারণে বিদেশে বসবাসরতদের পক্ষে স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হচ্ছে, যদিও তার সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির বিচ্ছেদ ঘটে গেছে (cultural deterritorialisation) বহু আগে। এই স্থানান্তরণ থেকে জন্ম নিচ্ছে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যৎ।

সংবাদ ও তথ্যের ক্ষেত্রেও চলছে একই ধারা (Mediascapes)। সেই সঙ্গে আছে আদর্শের প্রবাহ (Ideoscapes)। প্রতিটি প্রবাহ বিশ্ব যোগাযোগকে বাড়িয়ে দিলেও বিশ্বব্যাপী জন্ম দিচ্ছে বিচ্ছেদের। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টেলিভিশন ও ছায়াছবির মাধ্যমে বহু চিত্র মানুষের সামনে হাজির হচ্ছে বটে কিন্তু যে ছবি সৃষ্টি করে সেটি খণ্ডিত বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে (টমলিনসন, ২০১২ :১৪৮)। ইউরোপীয় আদর্শের প্রচার, তার ধারণা ও প্রত্যয় (concepts & images) বিশ্বজনীন হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার ফলে অন্যান্য সমাজে তার ভিত নেই। শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবকিছু তার অভ্যন্তরীণ যুক্তি হারিয়ে ফেলছে (lack of internal logic)। মিডিয়া চলচ্চিত্র যে ধরনের মিথ্যা কল্পিত জীবনের প্রতিফলন

করে (Simulacra) তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে উল্টো ফল পাওয়া যায়। এই অভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য এবং বিচ্ছিন্নতার কারণে মানুষের মধ্যকার যোগাযোগ বাহ্যিকভাবে এগিয়ে গেলেও স্থান (sense of place) সম্পর্কে ধারণার বিলুপ্তি ঘটছে। যে বিশ্বে আজ আমরা বাস করি, সেটি শিকড় বা ভিতবিহীন। ধর্ম এই সংকটকে একজাতীয় উগ্র আদর্শে পরিণত করে সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে।

জাতীয় সংস্কৃতির সামনে এই চ্যালেঞ্জের কারণে মানুষের আত্মপরিচয় কী, তার শিকড় কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন আজ গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। কোনো আশ্রয় না পেয়ে মানুষ ধর্মের আশ্রয় নিচ্ছে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের অতি উগ্র এবং জঙ্গি ধারার আবির্ভাব ঘটছে। ফলে বাজার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকে পৃথিবী যদিও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মানুষ হচ্ছে বিভক্ত। সে কারণে জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় আত্মপরিচয় আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের জন্ম হচ্ছে। মানুষের আত্মপরিচয় কী, তার শিকড় কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন আজ মানুষের জীবনে ভূমিকা রাখছে অনেক বেশি। স্থানীয় সমাজ বৈশ্বিক প্রভাবকে তার সংস্কৃতিতে ব্যবহার করার কারণে মিশ্রণ ঘটছে সংস্কৃতির (Creolisation)। তাতে করে সংকট আরও গভীর হচ্ছে। বিশ্বায়নের এই কুফলগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা আজকের দিনের প্রধান দায়িত্ব। সেই প্রতিরোধ কেবল বিশ্বায়নকে বিরোধিতা করার জন্য নয়। কীভাবে তাকে মানবিক করা যায়, কীভাবে সত্যিকার বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা যায়, সেটিই মুখ্য।

টীকা

১. Ideology is defined as the ways in which the meaning conveyed by symbolic forms serves to establish and sustain relations of power. (Oktar 2001, 320)?

২. In Hall's (1977) word 'Hegemony' exists when a ruling class is able not only to coerce a subordinate class to conform to its interests, but exerts a 'total social authority' over those classes and the social formation as a whole. 'Hegemony' is in operation when the dominant class fractions not only dominate but direct-lead; when they not only possess the power to coerce but actively organise so as to command and win the consent of the subordinated classes to their continuing away. (Hall, Stuart. 1977 'Culture, the Media and the Ideological effect.' In *Mass Communication and Society*. Edited by James Curran and others. 315-348, London : Edward Arnold.

গ্রন্থপঞ্জি

Anderson, Ian & Robert J. Figgins (ed) (2012). *Globalization: Background, Agreements & Current Issues*. NY Nova Science Publishers

Appadurai, A (2012). 'Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy', Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 98-104

Bacevich, A (2009). *American Empire*. Harvard University Press, Harvard

Bardhan, A (2012). 'The Twin Excesses-Financialisation and Globalisation–caused the crush', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 203-205

Bello, W (2012). 'The Global South : The WTO and Deglobalisation', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 490-493

Brawley Mark (2003). *The Politics of Globalisation*. Toronto, Broadview Press

'Breaking down the US defennce budget', *Aljazeera* 28 February 2017

Capling Anna and Richard Higgott (2012). 'The Future of the Multilateral Trade System–What Role for the World Trade Organisation?', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 260-264

Cowen, T (2012) 'Why Hollywood Rules the World, and Whether we should care', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 379-384

Edelman Mark and Anjelique Haugerud (2005). *The Anthropology of Development and Globalisation*. Melbourne : Blakwell Oublishing

Ferguson, N (2007), 'Sinking Globalisation', in Mark Kesselman (ed) *The Politics of Globalisation :* A Reader, Boston : Wadsworth, pp. 50-56

Financial Times, June 9, 2004

Foad Izadi 'US Public Diplomacy : A Theoretical Treatise', In *The Journal of Arts Management, Law and Society*, 2016, Vol 46, NO 1, 13-21

Freedland, J, 'Hail Bush : A new Roman empire', *The Guardian* but taken from *Sydney Morning Herald*, 19 September 2002

Freedman, T (2007). *The World is Flat*, NY : Picador

Gereffi, G (2012), 'The Global Economy : Organisation, Governance, and Development', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester: Blackwell Publishers, 2012, pp. 170-179

Harding, J (2012), 'Counter–Capitalism: Globalisation's Children Strike Back', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester: Blackwell Publishers, 2012, pp. 494-499

Heinberg, R, 'Behold Caesar : George W. Bush & the American Empire', *New Dawn Magazine*, n. 76, January –February 2003

Held, D (2004). *Global Covenant : The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus*. Cambridge: Polity Press.

Held David & Anthony McGrew (2007). *Globalisation Theory : Approaches and Controversies.* Cambridge: Polity Press

Hurrell Andrew & Ngaire Woods (1999). *Inequality, Globalisation and World Politics*. Oxford : Oxford University Press

Ikenbury, G. J. (2007), 'Globalisation as American Hegemony', In David Held & McGrew (ed) *Globalisation Theory: Approaches and Controversies*. Cambridge: Polity Press

Jha Prem Sankar (2006). *The Twilight of the Nation State*. New Delhi, Pluto Publication

Jones Andrew (2006). *Dictionary of Globalisation*. Cambridge: Polity Press

Jones Andrew (2010) Globalisation : Key thinkers, Cambridge Polity Press

Lechner, F (2012), 'Religious Rejection of Globalisation', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 419-424

Mann, C (2011). *1493: Uncovering the New World Columbus Created*. Alfred A. Knopf

Marx K & Frederich Engels (2007), 'The Manifesto of the Communis Party', in Mark Kesselman (ed) *The Politics of Globalisation* : *A Reader*, Boston : Wadsworth, pp. 16-20

Michael T (2017) 'Donald Trump to increase military spending, but how much does the US and the world spend?', *News* 1 March 2017

Mullard, M (2004). *The Politics of Globalisation and Polarisation.* Cheltenham : Edward Elgar

Osterhammel Jurgen & Niels P. Petersson (2003). *Globalisation : A Short History*. Princeton : Princeton University Press

Panitch Leo & Colin Leys (Ed). *Socialist Register 2004 : Global Capitalism and American Capitalism*. Merlin Press, New York

Petras James and Henry Veltmeyer (2005). *Empire with Imperialism : The Globalising Dynamic of Neo-Liberal Capitalism*. Manitoba : Zed Books

Ritzer G (2004), 'An Introduction to McDonaldization', In Ritzer (ed) *The McDonaldization of Society*: A Reader, Thousand Oaks : Pine Forse Press, pp. 4-24

Robertson R (1996). *Globalisation: Social Theory and Global Culture*. London: Sage Publications

Robertson, R (2012), 'Globalisaiton as a problem', Lechner Frank & John Boli (ed). *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester: Blackwell Publishers, 2012, pp. 88-94

Robinson, W (2012), 'Globalisation: Nine Theses on Our Epoch', In Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 22-27

Rodrik, D (2012), 'Has Globalisation gone too far?', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 231-236

Roy, O (2012), 'Globalised Islam: The Search for a New Ummah', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 396-400

Schotte (2005). *Globalisation : A critical introduction*. NY : Palgrave McMillan

Scholte J. A (2000) Globalisation A Critical Introduction, London MacMillian

Shah, A., 'The Rise of Corporation,' *Global Issues*, 2017

Sklair L (2012), 'Sociology of the Global System', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 57-63

Slaughter, Ann- Marie (2012), 'A new World Order', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 265-270

Soar, Daniel (2017). 'The Most Expensive Weapon Ever Built,' *London Review of Books* Vol. 39, No 7, 30 March 2017.

Stiglitz, J (2007), 'Globalisation's Discontent', in Mark Kesselman (ed) *The Politics of Globalisation* : A Reader, Boston : Wadsworth, pp.86-95

Strange, S (2012), 'The Declining Authority of States,' in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 219-225

The Economist 17 September 2017 (The Superstar Company : A Giant Problem).

Tilly, C (1990). *Coercion, Capital and European States AD 1990 – 1992*. Oxford: Blackwell

Thussu, D (2012), 'Mapping Global Media Flow and Contra-flow', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 352-357

Tomlinson, J (2012), 'Cultural Imperialism', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 343-351

Urry J (2003). *Global Complexity*. Cambridge Polity Press

Vreeland, J (2012), 'The International Monetary Fund', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester : Blackwell Publishers, 2012, pp. 253- 259

Wade, R. (2007), 'Globalisation and its Limits', in Mark Kesselman (ed) *The Politics of Globalisation* : A Reader, Boston : Wadsworth, pp. 37-49

Wade, R. (2012), 'Is Globalisation reducing Poverty and Inequality?', in Lechner Frank & John Boli (ed) *The Globalisation Reader*, -4th ed, Chicester: Blackwell Publishers, 2012, pp. 187-193

Woff, M. (2007), 'Why globalization Works', in Mark Kesselman (ed) *The Politics of Globalisation* : A Reader, Boston : Wadsworth, pp.74-85

Wooldridge, A (2017) *ABC Radio National*, Australia, 29 January 2017 'The Guilded Age'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড প্রবন্ধ, কলিকাতা শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড মার্চ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫

বই আলোচনা

বিশ্বায়ন কীভাবে কার্যকর হবে?

প্রতীক বর্ধন

মেকিং গ্লোবালাইজেশন ওয়ার্ক—জোসেফ ই স্টিগলিৎস, নরটন পেপারব্যাক ২০০৭

সম্ভবত, গত দুই দশকে সারা পৃথিবীতে বিশ্বায়ন শব্দটিই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু গত এক বছরেরও কম সময়ে ব্রেক্সিট এবং মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একজন জনতুষ্টিবাদী ব্যক্তির নির্বাচিত হওয়ার পর বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়ে গেছে। অন্যভাবে বললে, বিশ্বায়নের কারণেই এই দুটি যুগান্তকারী ব্যাপার ঘটেছে। প্রথমত, ব্রিটেন বিশ্বায়নের 'কুপ্রভাব' থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, ট্রাম্পের মতো একজন খাপছাড়া ধনকুবের বিশ্বায়নবিরোধী স্লোগান দিয়ে বিশ্বায়নের নেতৃত্বদানকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। এতকাল শুধু গরিব দেশগুলো বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিল, এখন তাদের সঙ্গে ধনী দেশগুলোও যুক্ত হলো। বাস্তবতা হলো, বিশ্বায়নবিরোধী সবচেয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া এখন সেখানেই দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কেন এমন হলো, কথা ছিল, বিশ্বায়নের বদৌলতে সবারই উন্নয়ন হবে। এটি মূলত অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন নিয়ে লিখিত। ঠিক এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ ই স্টিগলিৎস *মেকিং গ্লোবালাইজেশন ওয়ার্ক* নামের বইটি লিখেছেন। স্টিগলিৎস ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজার্সের চেয়ারম্যান এবং ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝতে পারেন, বিশ্বায়ন নিয়ে মানুষের মধ্যে এত অসন্তোষ কেন। হোয়াইট হাউস ও বিশ্বব্যাংকের একদম কেন্দ্রে বসে তিনি দেখেছেন, কীভাবে নীতি প্রণীত হয়।

ফলে বিশ্বব্যাংক ছাড়ার পর তিনি প্রথমে *গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্টস* নামে একটি বই লেখেন। সেই বইয়ে তিনি আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিশ্বায়নের কারণে যত মানুষের উপকৃত হওয়ার কথা ছিল, তত মানুষ উপকৃত হয়নি। আর বক্ষ্যমান বইয়ের মুখবন্ধে তিনি বলেন, এই সমস্যার জাদুকরি সমাধান নেই তা সত্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের সুযোগ আছে। সে যেমন আমাদের নীতি প্রণয়নের জায়গায় পরিবর্তনের সুযোগ আছে, তেমনি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিধিবিধান ও মনোভাবেও পরিবর্তন আনার সুযোগ আছে। এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশ্বায়ন অধিকতর কার্যকর হবে। তিনি বলেন, কিছু কিছু পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই আসবে। চীন ও ভারতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, প্রথম দেশটি বিশ্ব অর্থনীতিতে উৎপাদক হিসেবে এবং দ্বিতীয় দেশটি আউটসোর্সিংয়ে সফলতা অর্জন করায় ইতিমধ্যে বৈশ্বিক চিন্তা ও নীতিতে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে।

কিছুদিন আগেই জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন কার্যালয়ের পরিচালক ড. সেলিম জাহানের সাক্ষাৎকার নিলাম। বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে তিনি বললেন, বিশ্বায়নের বদৌলতে পণ্য, পুঁজি ও সেবার অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত হয়নি। আবার বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের রীতিতে চলছে। অর্থাৎ বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হবেন একজন মার্কিন নাগরিক, আর আইএমএফের প্রধান হবেন একজন ইউরোপীয় নাগরিক। এরপর রাশিয়া এখনো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। কথা হচ্ছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসব চলতে পারে না। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। বিশ্বব্যবস্থায় ভারসাম্য আনার জন্যই এটা দরকার।

ব্যাপারটা হলো, দুটি বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা দেখার পর উন্নত দেশগুলোর বোধোদয় হয়, এসব করে লাভ নেই। বরং এবার যুদ্ধবিগ্রহ থামিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চলতে হবে। সে কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে নানা রকম বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। ১৯৪৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদই সব ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেতে থাকে। তারা সহযোগিতা ও বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তি, নিরাপত্তা, আর্থিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই পরিবেশের মতো বৈশ্বিক সেবা সবার দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাদের মডেলটা এ রকম : জাতিরাষ্ট্রগুলোকে এক সূত্রে বেঁধে অভিন্ন মানদণ্ড, রীতি ও চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালনা করা।

জাতির মহিমা খুঁজতে গিয়ে হিটলার কী করেছিলেন, তা আমাদের অজানা নয়। তাঁর কারণে সারা পৃথিবীতে রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছিল, যাকে বলে হলোকাস্ট।

ধ্বংস হতে বসেছিল এতকালের সভ্যতা। এটাকে দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ১৯৪১ সালে আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে এতে ঘোষণা করা হয়, শান্তির ভিত্তি হচ্ছে স্বাধীনতা। তাই দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা সংকুচিত করতে হবে। ছোট দেশ বড় দেশের করদ রাজ্য হিসেবে থাকতে পারে না। আর কোনো ভূমি দখল নয়, নতুন করে জোরপূর্বক শুল্ক আরোপ নয়; অন্যদিকে সমুদ্র স্বাধীন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় ও আটলান্টিক সনদ থেকে আমরা এক নতুন বৈশ্বিক চুক্তি পেলাম। অর্থাৎ তখন থেকে আন্তর্জাতিক নিয়ম ও প্রতিষ্ঠান মেনে চলে সব দেশ বৈশ্বিক খেলায় অংশ নিতে শুরু করে। এটাকে বহুপক্ষীয় বিশ্ববাদ বলা যায়। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে পুনঃসমঝোতা হয়, যার মাধ্যমে ইউরোপের মতো দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-বিবাদে জর্জরিত অঞ্চল সহযোগিতার অসাধারণ নজির স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে জাতীয় সার্বভৌমত্বের রাশ টেনে ধরা হলো, ফলে পৃথিবীর সমৃদ্ধির চাকা অনেক দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করল। কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে এল। আপেক্ষিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো।

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে স্টিগলিৎস আমাদের বলেন, গত দেড় শতকে পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র ছিল জাতিরাষ্ট্র। কিন্তু বিশ্বায়নের কারণে এই জাতিরাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। একদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি, অন্যদিকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের রাজনৈতিক দাবি—এ দুইয়ে মিলে এমনটা হচ্ছে। পৃথিবীর দেশগুলো ক্রমশ অঙ্গীভূত হচ্ছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এখন সামষ্টিক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, একত্রে কাজ করতে গেলে সমন্বয়ের বিকল্প নেই। আমাদের সামনে এখন এত এত সমস্যা আছে, যেগুলো কেবল বৈশ্বিক পরিসরেই সমাধান করা সম্ভব: বাণিজ্য, পুঁজি ও পরিবেশ। বিশেষ করে, পরিবেশের কথা আমরা বলতে পারি, কারণ, বাংলাদেশের মতো দেশ বৈশ্বিক উষ্ণায়নে কিঞ্চিৎ ভূমিকা রাখলেও এ কারণে যে কটি দেশ বেশি ভুগছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। স্টিগলিৎস আমাদের বলছেন, জাতিরাষ্ট্র দুর্বল হলেও আন্তর্জাতিক পরিসরে এমন কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, যার মাধ্যমে বিশ্বায়নসৃষ্ট সমস্যাসমূহ কার্যকরভাবে আমলে নেওয়া সম্ভব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্টিগলিৎস বলছেন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের গতি রাজনৈতিক বিশ্বায়নের গতি ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থাটা বিশৃঙ্খল ও সমন্বয়হীন হয়ে পড়েছে। একগাদা কিছু প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে, কিছু মতৈক্য ও বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু বৈশ্বিক সরকার-জাতীয় কিছু গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন দেশের

অর্থমন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থায় গিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত কীভাবে পরিবেশ বা বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলছে, সে ব্যাপারে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ে পরিবেশমন্ত্রীরা হয়তো কিছু করার আহ্বান জানাতে পারেন, কিন্তু সেটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা তাঁদের হাতে নেই।

জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে মানুষ দেশের মধ্যে অন্য মানুষের প্রতি যুক্ততা বোধ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এটি ঘটেছে, কিন্তু স্টিগলিৎস আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, বিশ্বায়িত পৃথিবীতে জাতিরাষ্ট্রের ভূমিকা সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আনুগত্য কিন্তু জাতিরাষ্ট্রের প্রতিই রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। যুদ্ধের সময় ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার হয়ে যায়: ইরাক যুদ্ধের সময় মার্কিনরা নিজেদের সেনা মারা যাওয়ার পইপই হিসাব রাখত, কিন্তু যখন ইরাকি সেনা ও জনগণের তালিকা আসত, সেটা নিয়ে অত আলোচনা হতো না। অথচ মার্কিন সেনাদের চেয়ে অন্তত ৫০ গুণ বেশি ইরাকি ওই যুদ্ধে মারা গেছে। এই ব্যবস্থায় আমাদের অন্যদের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করতে হবে।

এসব সমস্যা নিরসনে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল। যে প্রতিষ্ঠানগুলো সিদ্ধান্ত নেয় তাদের মধ্যে গণতন্ত্রের ঘাটতি থাকাটা পরিষ্কারভাবেই সমস্যা। ব্যাপারটা হচ্ছে ধরুন তুরস্কে ভূমিকম্প হলো বা ইথিওপিয়ায় দুর্ভিক্ষ ও ইন্দোনেশিয়ায় সুনামি হলো, বিশ্বায়িত গণমাধ্যমের সুবাদে আমরা হয়তো সেই দৃশ্য দেখছি বা তাদের জন্য সাহায্য পাঠানো হচ্ছে; কিন্তু আমাদের শুধু এটুকু করলেই চলবে না, এর চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে হবে।

স্টিগলিৎস আমাদের বলেন, উন্নত দেশগুলো নিজেদের মতো করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি সাজিয়ে তার কারখানা ও কৃষকদের বাঁচিয়ে দেয়, যাতে তাদের উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকতর দক্ষ উৎপাদকদের মুখোমুখি হতে না হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আমাদের যে ক্ষতি করে, তার দায়ও এরা এড়িয়ে যায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নেতৃত্বে বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা অপব্যয়ী, অর্থাৎ ধনী ঋণগ্রহীতাদের পুরস্কৃত করলেও গরিব ঋণগ্রহীতাদের শাস্তি দেয়। বহুজাতিক ব্যাংকগুলো উন্নয়নশীল দেশে গিয়ে অন্য বহুজাতিক ও বড় বড় করপোরেশনের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় শিল্পের বিকাশে তাদের তেমন নজর থাকে না।

স্টিগলিৎস এই বইয়ে পাঠকদের নানা ইস্যুর মধ্য দিয়ে নিয়ে যান, বাণিজ্য থেকে শুরু করে, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পর্যন্ত। বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে একটি করে সমস্যা উপস্থাপন

করা হয়েছে, যার সঙ্গে আছে বিশ্লেষণ। স্টিগলিৎস এখানেই থেমে থাকেন না, তিনি সমাধানেরও প্রস্তাব দেন। পাতার পর পাতায় স্টিগলিৎস আমাদের বলেন, বিশ্বায়ন আমাদের অনেক ভালো করতে পারে। কিন্তু ধনী দেশগুলো নিজেদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। সে কারণে এই ব্যবস্থা অসম ও অদক্ষ। তো এবার আমরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় যাব :

মুক্ত বাণিজ্য

বিশ্বায়ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মুক্ত বাণিজ্যের প্রসঙ্গটি সবার আগে চলে আসে। এটি নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়। উন্নয়নের পেছনে বাণিজ্যের বড় ভূমিকা আছে, সেটা কিন্তু দৃশ্যমান। বিশ্বায়নের বদৌলতেই তা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বা শিল্পবিপ্লবের সময় যখন পশ্চিমের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হয়েছে, তখনো তাদের প্রবৃদ্ধির হার কদাচিৎ ৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে। আর ১৯৯০ সালের পর যখন বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া দ্রুততর হলো, তারপর চীনের প্রবৃদ্ধির হার এর তিন গুণ হয়ে যায়। যদিও এখন সেটা কিছুটা কমে এসেছে। শুধু চীন নয়, ভারত ও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হারও ৭-এর ঘর ছুঁয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কিন্তু অনেক অভিযোগ।

উদার বাণিজ্যপন্থীরা বিশ্বাস করেন, এর মাধ্যমে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সম্ভব। তাঁরা চান, উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশের পণ্য আমদানির জন্য বাজার খুলে দিক, বাজারের উদারীকরণ করুক এবং পণ্য ও সেবার যাতায়াত পথের প্রতিবন্ধকতা তুলে নিক। তাঁরা মনে করেন, এতে বিশ্বায়নের ভেলকি দেখা যাবে। কিন্তু স্টিগলিৎস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, বাণিজ্য উদারীকরণ বিশ্বায়নের সবচেয়ে বিতর্কিত দিক। অনেকেই মনে করেন, এর ফলে মজুরি কমে যাওয়া, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব হারানোর হুমকি থাকে, যেগুলোর প্রভাব এর সম্ভাব্য উপকারের চেয়ে অনেক বেশি।

অংশত মুক্ত বাণিজ্য কখনো সংঘটিত হয়নি, কারণ এই চেষ্টা কখনো হয়নি। অতীতকালে যত বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে তার কোনোটি মুক্ত ও ন্যায্য ছিল না। এগুলো অসম ছিল, যার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের বাজার উন্নত দেশের পণ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিদানের ব্যবস্থা ছিল না। নানা ধরনের সূক্ষ্ম ও কার্যকর বাণিজ্য বাধা রাখা হয়েছে। এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থা খারাপ হয়েছে। বাস্তবে মুক্ত বাণিজ্য না থাকলে এরা অতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতো না, যতটা তারা হয়েছে এই মুক্ত বাণিজ্যের কারণে।

আবার উল্লিখিত বাণিজ্য বাধা দূর করা হলেই যে সবাই এ কারণে উপকৃত হবে, এমন কথা নেই। উন্নত দেশগুলো সহজেই এর সুযোগটা নিতে পারে।

কারণ, তাদের অবকাঠামো ও প্রস্তুতি আছে। দেখা যায়, অনেক দেশের সেই অবকাঠামো নেই, যার মাধ্যমে তারা পণ্য বাজারে নিয়ে যেতে পারে। আবার উন্নত দেশগুলোর পণ্যের গুণমানের যে শর্ত দেয়, তা পূরণ করাও তাদের পক্ষে কঠিন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইউরোপ ২০০১ সালে নিজের বাজার দরিদ্রতম দেশগুলোর জন্য খুলে দিলেও এর ফলে নতুন বাণিজ্য হয়নি। ফলে বাণিজ্য উদারীকরণ হলে যে বাণিজ্য বাড়বে—এমন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আরও অনেক কিছু করা দরকার।

স্টিগলিৎস নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট বা নাফটার প্রসঙ্গ টেনে মুক্ত বাণিজ্যের বৈসাদৃশ্য বুঝিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে এই চুক্তি হয়। ওই সময় এটা পৃথিবীর বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল ছিল। এর মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের বাজার মেক্সিকোর জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। এতে মেক্সিকোর অর্থনীতি প্রথম দিকে কিছুটা ফুলেফেঁপে উঠলেও পরবর্তীকালে তাদের তেমন অগ্রগতি হয়নি। দেখা গেল, একসময় মেক্সিকো আরও বেশি করে মার্কিন অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মার্কিন অর্থনীতি যেমন ঠিকঠাক এগোয়নি, তেমনি মেক্সিকোর অর্থনীতিও এগোয়নি। বরং বলা যায়, এর মাধ্যমে এর কারণে মেক্সিকোয় দারিদ্র্য আরও বৃদ্ধি পায়। এতে হলো কী, মেক্সিকোর গরিব কৃষকদের উচ্চ ভর্তুকিপ্রাপ্ত মার্কিন কৃষিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হলো। যদিও দেশটির শহুরে নাগরিকেরা কম দামের পণ্যের কারণে লাভবান হলো। এই বাণিজ্য চুক্তি যদি ন্যায্য হতো, তাহলে মার্কিনদের পক্ষে কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়া সম্ভব হতো না। একইভাবে, দেশটিতে চিনির মতো কৃষিপণ্য আমদানির ওপরও নিষেধাজ্ঞা থাকত না। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র যদি ভর্তুকি তুলে নাও নিত, তাহলে অন্তত মেক্সিকোকে কাউন্টারভেইল করার সুযোগ দিতে হতো। অর্থাৎ তাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যে শুল্ক আরোপের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নাফটায় সেই সুযোগ নেই।

নাফটা শুল্ক বাধা নিরসন করলেও দেখা গেল, নানা রকম অশুল্ক বাধা দাঁড়িয়ে গেল। নাফটা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বাজারে মেক্সিকোর পণ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য নানা রকম অশুল্ক বাধা আরোপ করতে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যখন মেক্সিকোর টমেটো ঢুকতে শুরু করল, ফ্লোরিডার টমেটোচাষিরা কংগ্রেস ও ক্লিনটন প্রশাসনকে চাপ দিতে শুরু করলেন, যাতে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। যদি দেখানো যায়, মেক্সিকোর টমেটো উৎপাদনমূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি হচ্ছে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ডাম্পিংয়ের অভিযোগ আনা যাবে। তখন আবার অ্যান্টিডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়। কিন্তু মেক্সিকো টমেটোতে ডাম্পিং করছিল না। যে কারণে মনে হচ্ছিল,

মেক্সিকো কম দামে টমেটো বিক্রি করছিল তা হলো, তারা কিছুটা ভারসাম্যহীনভাবে এই দাম নির্ধারণ করছিল। কিন্তু মেক্সিকো বিচারের মুখে পড়তে চায়নি, তাই তারা টমেটোর দাম বাড়াতে রাজি হয়। এতে মেক্সিকোর টমেটোচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু ফ্লোরিডার চাষিরা যা চাচ্ছিলেন সেটা পেয়ে গেলেন।

তবে এই চুক্তি থেকে মেক্সিকো একেবারে লাভবান হয়নি তা নয়। বিশেষ করে, দেশটির দক্ষিণ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বড় বড় মার্কিন কোম্পানির জন্য সস্তা দামে যন্ত্রাংশ উৎপাদনের ছোট ছোট কারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে চীনা কোম্পানিগুলো এই জায়গা দখল করে নেয়। কারণ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে চীন মেক্সিকোর চেয়ে ঢের বেশি বিনিয়োগ করেছিল। ফলে শুধু শুল্কই একমাত্র বিবেচ্য নয়, এই বিষয়টি আমাদেরও বিবেচ্য হওয়া দরকার। শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা কী, সেটা আমাদের এই নাফটার ইতিহাস থেকে বোঝা উচিত।

তাহলে বাণিজ্যের ন্যায্য নীতি বলতে কী বোঝায়? স্বাভাবিকভাবে যে বাণিজ্যে ভর্তুকি ও বাধা থাকবে না, সেটাই হবে ন্যায্য বাণিজ্য। তবে নিশ্চিতভাবেই আমাদের পৃথিবী এ রকম বাণিজ্যের আশপাশেও নেই। উদারীকরণের এই অসমতার কারণে এক গোষ্ঠীর বিনিময়ে আরেক গোষ্ঠী লাভবান হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এখনকার অধিকাংশ বাণিজ্যনীতিতে কৃষি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে ভর্তুকি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু যেসব উন্নয়নশীল দেশের কৃষকেরা ভর্তুকি পান না, এ কারণে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। আর উন্নয়নশীল দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তাই এসব দেশের মানুষের আয় কমে যায়। অর্থাৎ যে মানদণ্ডেই দেখা হোক না কেন, এখনকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অন্যায্য। ব্যাপারটা হয় কি, চীনের মতো দেশগুলো কৃষকের ক্ষতি কমাতে কৃষিতে ভর্তুকি দিতে পারে, কিন্তু সেটা হলে তাদের উন্নয়ন ব্যয় কমে যাবে। আবার দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন পণ্যের বাণিজ্য উদারীকরণের বেলায় নানা সীমাবদ্ধতা থাকে, যেমন কৃষি ও টেক্সটাইল। বিশেষ করে, টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে দেশ ও পণ্যভিত্তিক নানা কোটা দেখা যায়। একইভাবে, উন্নত দেশগুলো কৃষিকে সুরক্ষিত রাখতে ভর্তুকি দেয়, যেটা আমরা আগেও দেখেছি। ১৯৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠিত হয়। কিন্তু এই সংস্থার কার্যক্রম নিয়ে মানুষের মধ্যে এত অসন্তোষ সৃষ্টি হয় যে এর বিভিন্ন সম্মেলনের সময় মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে।

যা হোক, এই অসমতা দূর করতে স্টিগলিৎস সমাধান বাতলে দেন। তিনি প্রস্তাব

করেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পৃথকভাবে দেখতে হবে। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থায় এই ব্যাপারটা উন্নত দেশের মর্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এই উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি উন্নত দেশের কথা না শোনে, তাহলে উন্নত দেশগুলো এদের দেওয়া প্রাধিকারমূলক সুযোগ-সুবিধা ফেরত নিতে পারে। এটা এখন উন্নত দেশগুলোর হাতে রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে গেছে। স্টিগলিৎস বলেন, স্রেফ একটি সংস্কার এর প্রতিকার করতে পারে। সেটা হলো, উন্নত দেশগুলোকে প্রতিদানের আশা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শর্ত ছাড়াই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বাজার খুলে দিতে হবে। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশকেও সে এই সুবিধা দিতে পারবে—এমন বিধানও থাকবে। তবে অন্য উন্নত দেশগুলোকে সে এই সুবিধা দিতে পারবে না। মধ্য আয়ের দেশগুলোকেও এই কাজ করতে হবে। তবে তারাও উন্নত দেশকে এই সুবিধা দিতে পারবে না, এতে তাদের শিল্পের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে না। অর্থাৎ শুধু সমতা নয়, ন্যায়সংগতভাবে প্রাধিকারমূলক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

একই সঙ্গে, স্টিগলিৎস দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি নিরুৎসাহিত করে বলেছেন, এতে উন্নত দেশগুলো লাভবান হয়। ব্যাপারটা খুব সহজেই বোঝা যায়, বিশ্বায়িত ব্যবস্থা না থাকলে বাংলাদেশকে যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য করতে হতো, তাহলে আমাদের পক্ষে দেশটিতে রপ্তানি করা সম্ভব হতো না। কারণ, তাদের শর্ত পূরণ করার মতো জায়গায় আমরা নেই। অন্যদিকে শুল্ক বাধা এখন অনেকটা কমে এলেও বড় দেশগুলো নানা রকম অশুল্ক বাধা আরোপ করে, যেমন পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত জটিলতা। যেমন ভারত বাংলাদেশের বিএসটিআইয়ের মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে কিছু পণ্য আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন দুই দেশের মান নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় হওয়ায় এই বাধা কমে আসছে। আবার নিজের দেশের শিল্প রক্ষার্থে বড় দেশ দাবি করে, রপ্তানিকারক দেশ পণ্যে ডাম্পিং করে তাদের দেশে কম দামে বিক্রি করছে। এর প্রতিকার হিসেবে তারা অ্যান্টিডাম্পিং শুল্ক আরোপ করছে। এসব অভিযোগ নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যাওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু পণ্যের মান ও মূল্য নির্ধারণে বহুপক্ষীয় বা সর্বজনীন ব্যবস্থা না থাকলে এর হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই। স্টিগলিৎস আমাদের সেই পরামর্শই দেন।

মেধাসম্পদ

একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উন্নত দেশগুলো উৎপাদননির্ভর থাকলেও ধীরে ধীরে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চপ্রযুক্তি ও সেবা খাতনির্ভর হয়ে পড়ে। ফলে আবিষ্কার ও পণ্যের মেধাস্বত্ব তাদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্টিগলিৎস আমাদের বলেন, ক্ষেত্রবিশেষে আবিষ্কারকে উৎসাহিত করতে এর দরকার আছে। কিন্তু সেটা যখন একচেটিয়াত্ব তৈরি করে, তখনই ঝামেলা শুরু হয়। অর্থাৎ

সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী হয়।

১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল উরুগুয়ে রাউন্ডে বাণিজ্যমন্ত্রীরা স্বাক্ষর করেন। এর মধ্যে একটি ছিল ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস (ট্রিপস), যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলো অনেক দিন ধরেই চেয়ে আসছিল। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সব সদস্যদেশের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এর মাধ্যমে তারা অন্য দেশগুলোকে তাদের পেটেন্ট ও কপিরাইট মানতে বাধ্য করে। মূলত ওষুধের উচ্চ দাম নিশ্চিত করতেই এটা করা হয়। বাজারে জেনেরিক ওষুধের আগমন বিলম্বিত করেও উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা হয়। এর মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের ওপর করপোরেট স্বার্থ প্রাধান্য পায়।

ফলে ভারসাম্যপূর্ণ মেধাস্বত্ব আইন করতে গেলে একটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, সেটা হলো, কিসের পেটেন্ট করা যায়? এর মেয়াদ কত দিনের হবে? এর আওতাই বা কত বড় হবে। এর উত্তরের সঙ্গে আবার অর্থনীতির প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনের মাত্রার সম্পর্ক আছে। কথা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদই শেষ কথা নয়, এটা লক্ষ্য অর্জনের পথ। কিন্তু আমরা কি এমন ব্যবস্থা করতে পারি না, যার মাধ্যমে একদিকে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যাবে, আবার উদ্ভাবনও চলতে থাকবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর যেন বেশি ভুগতে না হয়, এমনভাবে কি এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যায় না? স্টিগলিৎস বিশ্বাস করেন, এটা সম্ভব। তিনি বলেন, এর জন্য আমাদের আগে দেখতে হবে, আমরা কী অর্জন করতে চাই। ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে জেনেভায় ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউআইপিও) সাধারণ সভায় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার পেশকৃত প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারা সেখানে উন্নয়নমুখী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার কথা বলে।

আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকতর সম্পদ, সহায়তা ও সুযোগ দরকার। কিন্তু স্টিগলিৎস লক্ষ করেছেন, উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশগুলো থেকে শুধু সম্পদের কারণে ভিন্ন নয়, তাদের মধ্যে জ্ঞানগত পার্থক্যও আছে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই পার্থক্য যেমন কমানো যায়, তেমনি আবার বাড়ানোও যায়। সে কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো জ্ঞানের ভান্ডারে আরও বেশি প্রবেশাধিকার চায়। ব্যাপারটি আসলে এ রকম যে এসব দেশের বাজেট তো এমনিতেই কম, ফলে ওষুধের পেছনে অতিরিক্ত এক ডলার ব্যয় করা মানে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য খাতে এক ডলার কমে যাওয়া। ওষুধের দামের প্রভাব ব্যাপক, সে কারণে যৌক্তিক দামে জীবন রক্ষাকারী ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এতটা গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক, চোখ বন্ধ করে একবার আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধের দামের কথা ভাবুন!

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্টিগলিৎসের পরামর্শ হচ্ছে, এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

উন্নয়নশীল দেশের সাপেক্ষে নির্ধারণ করতে হবে। তার সঙ্গে জীবন রক্ষাকারী ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলোর উচিত, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বাবদ করারোপ না করা, যাতে তারা নিজেদের জনগণের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। এতে এসব দেশের মানুষেরা উৎপাদনের খরচে ওষুধ কিনতে পারে। এতে অনেকেই বলতে পারেন, উন্নয়নশীল দেশ কি উন্নত দেশের ঘাড়ে চড়ে বিনা পয়সায় সব পাবে। স্টিগলিৎস বলেন, অবশ্যই, তাদের এই সুযোগ দেওয়া উচিত। কারণ, এই উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে বহু কিছু নিয়েছে। এ ছাড়া ওষুধশিল্প পৃথিবীর সবচেয়ে নিয়ন্ত্রিত শিল্পের একটি। ওষুধের দাম মূলত বিমা কোম্পানি ও সরকার পরিশোধ করে থাকে। এ ছাড়া তিনি খেয়াল করেছেন, ওষুধ কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনের জন্য যতটা ব্যয় করে, গবেষণা খাতে অতটা ব্যয় করে না। ফলে দাম বেশি আরোপ করা হলে তা যে গবেষণায় প্রণোদনা দেয়, এ কথা হলফ করে বলা যায় না। সাধারণ বুদ্ধিতেই আমরা বলতে পারি, ব্যাপারটা নির্ভর করে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর। একই সঙ্গে, স্টিগলিৎস বায়োপাইরেসি বন্ধ করে স্থানীয় জ্ঞান সংরক্ষণে জোর দেন।

এ ছাড়া স্টিগলিৎস এই বইয়ে বৈশ্বিক রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা, বহুজাতিক করপোরেশনের ভূমিকা, সম্পদ বণ্টন প্রভৃতি বিষয়েও বিস্তর আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে কী করণীয় সে পরামর্শও দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিশ্বায়ন কার্যকর করতে হলে এমন এক আন্তর্জাতিক জমানা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। তিনি এটার নামকরণ করেছেন নিউ গ্লোবাল সোশ্যাল কনট্রাক্ট (নব্য বৈশ্বিক সামাজিক চুক্তি)। এর মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

১. ন্যায্য বাণিজ্য জমানা তৈরিতে উন্নত দেশগুলোর অঙ্গীকার, যার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থেই উন্নয়নের বাড়বাড়ন্ত হবে।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যাপারে নতুন মনোভঙ্গি গ্রহণ ও গবেষণায় অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা। উদ্ভাবনের জন্য প্রণোদনা ও বিনিয়োগ, এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জ্ঞানের ভান্ডারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হবে। ফলে জীবন রক্ষাকারী ওষুধের দাম আয়ত্তের মধ্যে চলে আসবে। প্রথাগত সম্পদ রক্ষায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকার।

৩. উন্নত দেশগুলোর কর্মযজ্ঞে উন্নয়নশীল দেশগুলোর যে পরিবেশগত ক্ষতি হচ্ছে, তার ক্ষতিপূরণে মতৈক্য থাকতে হবে। সেটা যেমন জীববৈচিত্র্য রক্ষার মাধ্যমে করতে হবে, তেমনি কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের মধ্য দিয়েও। আমাদের বুঝতে হবে, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো একই পৃথিবীতে টিকে আছে,

তাই আমাদের সবাইকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে। তাই এর জন্য কে দায়ী আর কে নয়, তা নিয়ে কলহ না করে আমাদের আন্তরিকভাবে কিছু একটা করতে হবে।

৪. উন্নত দেশগুলোকে অঙ্গীকার করতে হবে, উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তারা ন্যায্য মূল্য দেবে। আর তারা এমনভাবে এটা ব্যবহার করবে যে তাতে প্রকৃতির ক্ষতি হবে না।

৫. উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জিডিপির শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটার নবায়ন করতে হবে তাদের। এবার এর সঙ্গে এটা পূরণের লক্ষ্যে কাজও করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরাক যুদ্ধে ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে পারে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই দারিদ্র্যবিরোধী লড়াইয়ে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার দিতে পারবে।

৬. ২০০৫ সালের জুলাইয়ে ঋণ মওকুফের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তার আওতায় আরও অনেক দেশকে নিয়ে আসতে হবে। ব্যাপারটা হয়েছে কী, বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক দেশের উন্নত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হয়। এই অঙ্ক এতটা বিপুল যে গত কয়েক বছরে আমরা লক্ষ করেছি, উন্নয়নশীল দেশ থেকে টাকা উন্নত দেশগুলোতে চলে যাচ্ছে।

৭. বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামোর সংস্কার করে এর অস্থিতিশীলতা হ্রাস করতে হবে। স্টিগলিৎস বলেন, ঝুঁকির দায়টা উন্নয়নশীল দেশের কাঁধে না চাপিয়ে উন্নত দেশের কাঁধে চাপাতে হবে, যাদের তা বহনের সক্ষমতা আছে। বিশেষ করে, তিনি বৈশ্বিক রিজার্ভ ব্যবস্থা সংস্কারের কথা বলেছেন, কারণ বিদ্যমান ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশের রিজার্ভের টাকা উন্নত দেশগুলোর হাতে চলে যাচ্ছে। অথচ এই টাকাটা ভিন্নভাবে ব্যবস্থাপনা করা হলে উন্নয়নশীল দেশগুলো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়াতে পারত।

এর বাইরে স্টিগলিৎস বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত সংস্কারের পরামর্শ দেন। মূলত তিনি আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের কথা বলেন। আইএমএফে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ, যার কার্যকর ভেটো প্রদানের ক্ষমতা আছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানেই সদস্যদের ভোট প্রদানের ক্ষমতা অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। তাও সেটা আজকের যুগের অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তিতে নয়, তাদের প্রতিষ্ঠাকালীন আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে এই ভোট প্রদানের ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। এতে পরিবর্তন আনতে হবে। এ ছাড়া তিনি প্রতিনিধিত্বের ধরন ও নীতিতেও পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দেন। দ্বন্দ্ব নিরসনের পদ্ধতিও উন্নত করার প্রস্তাব দেন তিনি। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও উন্মুক্ত করার পক্ষপাতী তিনি।

মোদ্দা কথা হলো, বিশ্বায়ন এখনো একরকম অর্থনৈতিক পরিসরেই সীমিত

আছে। সে কারণে বড় দেশগুলো চাইলে ছোট দেশগুলোর ওপর যা খুশি তা-ই চাপিয়ে দিতে পারে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের একধরনের বৈশ্বিক মাতব্বর প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। জাতিরাষ্ট্রের স্বকীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করতে হবে, যাতে বড় দেশ ছোট দেশের ওপর ছড়ি ঘোরাতে না পারে এবং অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তাকে সর্বস্বান্ত করতে না পারে। যাতে করে সবাই সমান সুযোগ পায়। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করাটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। সবার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এটা কি আদৌ সম্ভব?

বই আলোচনা

বিশ্বায়নকে ত্রুটিমুক্ত করা কি সম্ভব?

খলিলউল্লাহ্

ইন ডিফেন্স অব গ্লোবালাইজেশন—জগদীশ ভাগবতী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪, আইএসবিএন : ০-১৯-৫১৭০২৫-৩।

ভূমিকা

চলমান বিশ্বরাজনীতির খোঁজখবর যাঁরা মোটামুটি রাখেন, তাঁরা সবাই জানেন যে বিশ্বব্যাপী একটি রক্ষণশীল পপুলিস্ট বা জনতুষ্টিবাদী ধারা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণ আর যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা ব্রেক্সিটের কথা বলা যায়। কিন্তু এর বাইরেও বিশ্বব্যাপী গত কয়েক বছরে অনেক দেশে রক্ষণশীল দলগুলোই ক্ষমতায় এসেছে অথবা ক্ষমতায় আসতে না পারলেও আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এসব শক্তি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শক্তিশালী হচ্ছে। এর ফলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনেক বিশ্লেষক প্রশ্ন তুলেছেন। এসব ঘটনার পেছনে মূল কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে পপুলিজম বা জনতুষ্টিবাদকে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলমান রক্ষণশীল জনতুষ্টিবাদের সারমর্ম হলো জনগণের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা বা ক্ষমতায় টিকে থাকা। তা যদি নৈতিকতা বা সমাজের দীর্ঘদিনের পরিচালিত মূল্যবোধ বা আদর্শবিরোধীও হয়, তবু জনগণ চাইলে সে অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। রাজনৈতিক ইতিহাস ও সংস্কৃতিভেদে জনতুষ্টিবাদ একেক দেশে একেক রকম হতে পারে। তবে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য স্থানের সাম্প্রতিক জনতুষ্টিবাদের মধ্যে যে জায়গায় মিল পাওয়া যায় তা হলো দক্ষিণপন্থী জনতুষ্টিবাদী শক্তিগুলো বেশ কিছু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে

জনগণের অসন্তুষ্টিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বা আসার অপেক্ষায় আছে।[১]

মোটাদাগে এসব গোষ্ঠীর জনপ্রিয়তার বড় কারণ হলো সমাজে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অসমতা। ২০০৮ সাল থেকে সম্পদ ক্রমেই বেশি আকারে পুঞ্জীভূত হয়ে আসছিল। উন্নত দেশের সরকারগুলো তাদের সামাজিক কর্মসূচিগুলোতে বাজেট কাটছাঁট করেছে, যার ফলে তা বেসরকারি হাতে আরও বেশি সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে সহায়তা করেছে। এসব সম্পদে কোনো কর আরোপিত হয়নি, তাই তা সামাজিক কর্মসূচি বা জনকল্যাণে কাজে লাগেনি। এর ফলে ক্রমেই অভিবাসী, প্রবাসী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি সেসব দেশে মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২] তারা মনে করছে, এসব অভিবাসী না থাকলে তারা আরও বেশি সুবিধা পেত।

জনতুষ্টিবাদ বামপন্থী, মধ্যপন্থী কিংবা ডানপন্থীও হতে পারে। বর্তমানে ডানপন্থী রক্ষণশীলেরা জনগণের চাহিদা ও আশঙ্কা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় উগ্র জাতীয়তাবাদ, মৌলবাদ, রক্ষণশীলতার মতো মনোভাব বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিশ্বায়নের ফলে ছোট হয়ে যাওয়া বিশ্ব আবার 'বড়' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। কারণ রক্ষণশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলো জাতীয় স্বার্থের কথা বলে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা মোটাদাগে বিশ্বায়নবিরোধী বলা যায়।

বিশ্বায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে বিশ্বব্যাপী মানুষ, চিন্তাভাবনা ও পণ্য ছড়িয়ে পড়াকে বোঝায়। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, সরকার ও অর্থনীতিগুলোর মধ্যে অনেক বেশি মিথস্ক্রিয়া ও একীভূতকরণ ত্বরান্বিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এই প্রক্রিয়ার চালক আর একে সহযোগিতা করে তথ্যপ্রযুক্তি।[৩]

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জগদীশ ভাগবতী একজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ। তাঁর বই *ইন ডিফেন্স অব গ্লোবালাইজেশন* ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে তিনি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ১৩ বছর আগের একটি বই নিয়ে এখন আলোচনার উদ্দেশ্য হলো বর্তমান বিশ্বে বিশ্বায়নবিরোধী যে জোয়ার বইছে, সে প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়নের পক্ষের আগের যুক্তিগুলো তুলে ধরা। এত দিন যেসব দেশকে বিশ্বায়নের সমর্থক ভাবা হতো, তারা কীভাবে বিশ্বায়নের মূল ধারণা থেকে সরে যাচ্ছে, তা বিশ্বায়নের পক্ষের যুক্তিগুলোর সঙ্গে বর্তমান ঘটনাগুলোর তুলনার মাধ্যমে বোঝা সহজ হবে। যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের মতো বিশ্বায়নের ঘোর সমর্থকেরাও জনতুষ্টিবাদের কবলে পড়ে বিশ্বায়নের ধারণাবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এই দিকটি বিবেচনা করেই ভাগবতীর বইয়ের মূল যুক্তিগুলো পুনরায় উপস্থাপন প্রয়োজনীয় মনে হলো।

সাধারণত পুঁজিবাদের বিরোধীরাই বিশ্বায়নবিরোধী বলে পরিচিত। তাদের যুক্তিতর্কগুলো মূলত বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে ঘিরে, বিশেষ করে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে। এসব বিষয়ে বিশ্বায়নের সমালোচকদের 'কড়া' জবাব হিসেবে জগদীশ ভাগবতীর এই বই বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। যদিও বিশ্বায়নের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইত্যাদি রূপ রয়েছে, কিন্তু ভাগবতীর আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে এই অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ধারণা কাজ করে এবং কীভাবে আরও ভালো কাজ করতে পারে। বিশ্বায়নবিরোধীরা ভাবেন যে বিশ্বায়ন অর্থনৈতিকভাবে ফলপ্রদ হলেও দারিদ্র্য, লিঙ্গবৈষম্য, আদিবাসী ও মূলধারার সংস্কৃতির সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয় বিশ্বায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁরা মনে করেন, বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর মাত্রাতিরিক্ত মুনাফার লালসা এই সামাজিকভাবে ধ্বংসাত্মক বিশ্বায়নের প্রধান শক্তি।

ভাগবতীর মতে, বিশ্বায়নের বিরোধীরা তথ্যপ্রমাণের বদলে আতঙ্ককে তাদের যুক্তি হিসেবে চালিয়ে দেয়। কিন্তু বিশ্বায়নের সমর্থকেরাও সঠিক পাল্টা যুক্তি দিতে পারে না। তিনি মনে করেন, বিশ্বায়ন বিষয়ে বিতর্ক ও উদ্বেগগুলোর পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন একটি আশাব্যঞ্জক বিশ্বব্যবস্থার রূপকল্প দেওয়া যায়, যা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে উন্নততর করবে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ভাগবতী *ইন ডিফেন্স অব গ্লোবালাইজেশন* গ্রন্থে তাঁর যুক্তিতর্ক তুলে ধরেছেন। মোট ৩০৮ পৃষ্ঠার বইটি পাঁচটি ভাগ ও উনিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বিশ্বায়ন-বিরোধিতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি এই বিরোধিতা জানা-বোঝা এবং এর উদ্বেগগুলো সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বেসরকারি সংগঠন বা এনজিওগুলো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়ন-বিরোধিতার পালে হওয়াটা জোরে লাগছে এবং এই সংগঠনগুলোই চাইলে বিশ্বায়নের ফলাফলকে আরও ভালো করার লক্ষ্যে সঠিক শাসনব্যবস্থার নকশা তৈরি করতে পারে।

দ্বিতীয় ভাগে ভাগবতীর মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বায়নের মানবিক কোনো চেহারা নেই বলে যে দোষারোপ করা, হয় তা খণ্ডন করা। বিভিন্ন বিষয়, যেমন দারিদ্র্য, লিঙ্গসমতা, বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ইত্যাদির সামাজিক প্রভাব ফলপ্রসূ বলে তিনি মনে করেন।

তৃতীয় ভাগে তিনি স্বল্পমেয়াদি পুঁজির প্রবাহ ও এক দেশ থেকে আরেক দেশে মানুষের চলাচলের মতো অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের দুটি প্রধান রূপ তুলে এনেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, স্বল্পমেয়াদি পুঁজির প্রবাহ মূলত স্টক মার্কেট ও অন্যান্য আর্থিক যন্ত্রে লেনদেনের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি লাভের জন্য করা হয়। এটা

এন্টারপ্রাইজগুলোর দীর্ঘমেয়াদি লাভের আশায় করা প্রত্যক্ষ ইক্যুইটি বিনিয়োগ থেকে ভিন্ন। স্বল্পমেয়াদি পুঁজির প্রবাহ ও মানব অভিবাসনের ফলে অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে তিনি মনে করেন, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মতো বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যে বইয়ে, সেখানে সেসবের সদুত্তর দেওয়া যাবে না। এর জন্য ভিন্ন একটি বইয়ে আলোচনা করতে হবে।

চতুর্থ ভাগে ভাগবতীর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবর্তনের নকশা। তিনি মনে করেন, এই পরিবর্তনের নকশাটা বিশ্বায়নের 'সাধারণভাবে ইতিবাচক' ফলাফলকে আরও বেশি ফলপ্রসূ করবে। বিশ্বায়নের মানবিক চেহারা থাকতে হবে বলে যেটা বলা হয়, তিনি সেটাকে বলছেন ভুল। তিনি মনে করেন, বিশ্বায়নের মানবিক চেহারা আছেই। কিন্তু আমরা সেই চেহারাটাকে আরও বেশি প্রীতিকর করতে পারি চাইলে। বইয়ের শেষ ভাগটি এক পাতার একটি উপসংহার।

বিশ্বায়নের সমর্থনে

ভাগবতী অনিয়ন্ত্রিত স্বল্পমেয়াদি পুঁজির প্রবাহকে সমর্থন করেন না। কিন্তু তিনি মুক্ত বাণিজ্য ও শ্রম, পুঁজি ও প্রযুক্তির অবাধ চলাচলের ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক একীভূতকরণের সমর্থক। তবে তিনি এই একীভূতকরণের ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা অবলম্বনের পক্ষে। যদিও বইয়ে খুব একটা উল্লেখ নেই, কিন্তু তাঁর বাণিজ্য তত্ত্ব থেকেই অর্থনৈতিক একীভূতকরণের সমর্থনটা এসেছে বলে অনুমান করা যায়। তিনি বলতে চান যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাগতিক জীবনমান উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সুযোগ হলো অর্থনীতিকে মুক্ত করা। এসব যুক্তির পেছনে তিনি অসংখ্য প্রমাণ দিয়েছেন। এই বইয়ের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে উত্তর ও দক্ষিণ বলয়ের দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক। সে কারণে ভাগবতী উত্তর বলয় বা উন্নত দেশগুলোর বিশ্বায়নবিরোধীদের যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করেননি।

ভাগবতী বিশ্বায়নবিরোধীদের দুটি শিবিরে ভাগ করেছেন। প্রথমটি হলো হার্ড কোর বিশ্বায়নবিরোধী বা বিশ্বায়ন-বিরোধিতা যাদের খুব গভীরে প্রোথিত। তাদের বিষয়ে তিনি খুব বেশি লেখেননি। বিশ্বায়ন-বিরোধিতার তিনটি ধারা—পুঁজিবাদ-বিরোধিতা, বিশ্বায়ন-বিরোধিতা (সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা অর্থে) ও করপোরেট-বিরোধিতাকে তিনি কয়েক পাতায় তুলে ধরেছেন। এর বাইরে রক্ষণশীল, সাম্যবাদ ও আমেরিকা-বিরোধীদের যুক্তির পাল্টা যুক্তিও একটি অধ্যায়েই শেষ করেছেন। তাঁর মূল মনোযোগ ছিল দ্বিতীয় শিবিরের ওপর।

বিশ্বায়নবিরোধীদের দ্বিতীয় শিবিরে যারা, তারা মনে করে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বেশ কিছু সামাজিক অসুস্থতার কারণ, যেমন দারিদ্র্য ও পরিবেশ বিপর্যয়। ভাগবতী

তাদের সঙ্গে তর্ককে বেশি যুক্তিসংগত মনে করেন। এর ফলে তিনি প্রতিটি সামাজিক বিষয়ের ওপর একটি করে অধ্যায়ে তাঁর যুক্তিতর্কগুলো উপস্থাপন করেছেন। যেমন দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, শ্রমের মান ও পরিবেশের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব। একটি অধ্যায়ে তিনি অনিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রবাহের (প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নয়) বিরুদ্ধে শক্তিশালী সমালোচনা করেছেন। অন্য আরেকটি অধ্যায়ে করপোরেশনের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়, সেগুলো খণ্ডন করতে চেয়েছেন। অভিবাসনের ওপর একটি অধ্যায় তিনি লিখেছেন। তিনি একটি বৈশ্বিক অভিবাসন সংস্থা গঠনেরও প্রস্তাব করেছেন।

প্রথম ভাগ

বিশ্বায়ন-বিরোধিতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ওপর প্রথম ভাগে ভাগবতী বিশ্বায়নবিরোধীদের যুক্তিগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্বায়নের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয়, সামাজিকভাবেও ফলপ্রসূ। তবে তিনি মনে করেন বিশ্বায়ন ভালো, তবে যথেষ্ট ভালো নয়। এর ত্রুটি আছে। সেগুলোকে সঠিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সারাই করা সম্ভব। তিনি বলেছেন, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের নেতিবাচক দিক রয়েছে। যেমন উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ থেকে রাসায়নিকের ফলে পার্শ্ববর্তী শ্বাসমূলীয় বনের ক্ষতি হয় এবং চিংড়ির জন্য যেসব খাবার দেওয়া হয় সেগুলো অবশিষ্ট থাকলে জেলে ও অন্যান্য পেশার মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি দুটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কথা বলেছেন। একটি হলো ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা দেওয়া। দ্বিতীয়টি হলো যে দূষণ করবে তাকে দূষণ ব্যবস্থাপনার খরচ বহন করতে হবে, যাতে করে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর উৎপাদনের ফলে দূষণের প্রভাব না পড়ে। এটাকে বলা হয় 'পলুটার পে নীতি'। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশবিষয়ক গ্রাহাম ইনস্টিটিউট এই নীতির সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে :

> The 'polluter pays' principle is the commonly accepted practice that those who produce pollution should bear the costs of managing it to prevent damage to human health or the environment. For instance, a factory that produces a potentially poisonous substance as a by-product of its activities is usually held responsible for its safe disposal.[৪]

বাজার অতিমাত্রায় উন্মুক্ত করার ফলে মূল্য ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অধিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। বিশ্বায়ন-বিরোধিতার এটা একটা কারণ। ভাগবতী মনে করেন, রাজনৈতিকভাবে এটা মোকাবিলা করা দরকার। যারা আমদানি

প্রতিযোগিতার ফলে এ ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে, তাদের খাপ খাওয়ানোর জন্য অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বায়ন কোন গতিতে অর্জিত হবে, সে ব্যাপারে ভাগবতী বলেন, বিশ্বায়ন প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত। সর্বোচ্চ গতিতে বিশ্বায়ন ঘটা ক্ষতিকর। তিনি মনে করেন, ১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া এশিয়ার আর্থিক সংকটের পেছনে অবিবেচকের মতো অতিমাত্রায় পুঁজির প্রবাহ উন্মুক্ত করাই দায়ী। এটা বিশ্বায়নের অব্যবস্থাপনার ফল। তাই তিনি বলেন, …globalization must be managed so that its fundamentally benign effects are ensured and reinforced. Without this wise management, it is imperiled. (পৃ. ৩৫)। তিনি মনে করেন, এই ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি সুন্দর ও কার্যকর হবে, যদি সরকার, আন্তর্জাতিক সংগঠন, করপোরেশন ও বিশ্বায়নের পক্ষের বুদ্ধিজীবীরা এনজিওগুলোর সঙ্গে একসাথে কাজ করে। এনজিওগুলোই সাধারণত বিশ্বায়নের বিরোধিতা করে থাকে। সে জন্য তিনি এনজিও বা সিভিল সমাজ গোষ্ঠীগুলো কারা, কীভাবে তাদের সংখ্যা এত বাড়ল, যেটা সিকি শতাব্দী আগেও অনুমান করা যায়নি এবং কীভাবে তাদের শক্তি ও আসক্তিকে বিশ্বায়নের উন্নতিতে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে অধ্যায় চারে আলোচনা করেছেন। তবে বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাই, সময়ের সাথে সাথে এনজিওগুলো লাভজনক খাতে প্রবেশ করছে। বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে বিশ্বায়ন-বিরোধিতার বদলে বিশ্বায়নের পক্ষের শক্তি হিসেবেই আবির্ভূত হচ্ছে।

তবে বিশ্বায়নবিরোধীদের যুক্তি খণ্ডনের ক্ষেত্রে তিনি পাঠককে বিচার করতে সুযোগ দেননি বলে মনে হয়েছে। প্রতিপক্ষের বিশ্বাসের প্রত্যুত্তর দেওয়ার বদলে তিনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন। এর ফলে একজন গবেষক বা একাডেমিকের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি অনেক সময় ব্যাখ্যা দেওয়ার বদলে তার অবস্থানের বিবৃতি দিয়ে ফেলেছেন। যেমন এক জায়গায় বিশ্বায়নবিরোধীদের প্রতিবাদের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলছেন, However, I would argue that seizures of people and property are not the way to organize the protests, but that the methods of non-violent resistance advanced by Mahatma Gandhi and practiced so well by Martin Luther King Jr. are the better way. (পৃ. ১৭০)। এখানে মহাত্মা গান্ধী ও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের প্রতিবাদের পদ্ধতি কেন ভালো, সে বিষয়ে তিনি কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তিনি যেহেতু বলছেন না যে এটায় তিনি 'বিশ্বাস করেন' (I believe) বা 'মনে করেন' (I think), বরং বলছেন তিনি 'যুক্তি

দিচ্ছেন' (I would argue), সে ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা পাঠক আশা করতেই পারে। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে, যে দুজনের কথা তিনি বলছেন তারা দুজনেই হত্যাকাণ্ডের শিকার। সুতরাং উদ্দেশ্য যত মহৎ হোক না কেন, পাঠককে তাদের প্রতিবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা না দিয়ে স্বতঃসিদ্ধ দাবি করা যুক্তিযুক্ত নয়।

দ্বিতীয় ভাগ

বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে ভাগবতী বিশ্বায়নের মানবিক চেহারা তুলে ধরেছেন। বিশ্বায়নের ফলে দুনিয়াজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সূচকে কেমন উন্নতি ঘটেছে, তা-ই বইয়ের এই অংশের আলোচ্য বিষয়।

দারিদ্র্য ও বিশ্বায়ন

ভাগবতী দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বায়নের ভূমিকা তুলে ধরতে দুটি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, একটি হলো তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আর অপরটি হলো বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণাদি। তিনি এই আলোচনায় বলেছেন যে দারিদ্র্য বিমোচনকে সব সময়ই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—শেক্সপিয়ারের সময় থেকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সূচনালগ্নেও। স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণেও যে কেউ বলতে পারে, এখন দারিদ্র্য আগের চেয়ে অনেক কম। আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ক্ষেত্রে ভাগবতী সাধারণ অর্থনীতির যুক্তিতে দেখিয়েছেন কীভাবে বাণিজ্য বাড়লে প্রবৃদ্ধি বাড়ে আর প্রবৃদ্ধি বাড়লে দারিদ্র্য কমে। প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন প্রবৃদ্ধির ধরন অনুযায়ী এর প্রভাব ভিন্ন হবে। যেমন বহির্বাণিজ্যে জোর দেওয়ায় পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর শ্রমবান্ধব পণ্য রপ্তানি বেড়েছে। এর ফলে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দ্রুত কমেছে। কিন্তু ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও পুঁজিবান্ধব প্রকল্পে জোর দেওয়ায় প্রবৃদ্ধি কমেছে, তবে শ্রমের চাহিদা বেড়ে গেছে। সে কারণে দারিদ্র্য খুব একটা কমেনি (২০০৪ সালের প্রেক্ষাপটে)।

বিশ্বায়নের ফলে অসমতা বাড়ছে। ভাগবতী মনে করেন, অসমতা বৃদ্ধি চিন্তার বিষয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমাজে অসমতা বাড়ছে, সেটা বিবেচনায় নিতে হবে। তিনি মনে করেন, অনেক সময় অসমতা বাড়লেও তা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। একটি সমাজে যদি এক হাজার জন লাখপতি থাকে আর অন্য কোনো সমাজে একজন কোটিপতি থাকে, তাহলে প্রথমটিতে অসমতা কম মনে হতে পারে। কিন্তু এক হাজার লাখপতি থাকলেও তারা তাদের আয় বিভিন্ন বিলাসী কর্মকাণ্ডে ব্যয় করবে। অন্যদিকে লাখপতিরা যেসব পণ্যে অর্থ ব্যয় করে, বিল গেটসের মতো ধনবান চাইলেও সেখানে অর্থ ব্যয় করে শেষ

করতে পারবে না। তাই বাধ্য হয়েই সে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে তার অর্থ ব্যয় করে। তিনি সালা-ই-মার্টিনের করা গবেষণার উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বব্যাপী অসমতা গত দুই দশকে কমেছে (২০০৪ সালের প্রেক্ষাপটে)।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী অসমতা বাড়ছে। এর মধ্যে অক্সফামের গবেষণা প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ২০১৬ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ২০১৭ সালের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে ক্রমবর্ধমান অসমতাকে চিহ্নিত করেছে।

শিশুশ্রম ও বিশ্বায়ন

ছয় নম্বর অধ্যায়ে ভাগবতী শিশুশ্রম বিশ্বায়নের ফলে কমেছে না বেড়েছে তার বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্বায়নের ফলে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সমালোচনা হয়। ভাগবতী মনে করেন, এই ব্যাপারটি বহুদিনের পুরোনো এবং ঐতিহাসিকভাবে চলে আসছে। এর সঙ্গে বিশ্বায়নের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি মনে করেন, এর মূল কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিশুশ্রমের মূল উৎস দারিদ্র্যের মধ্যে নিহিত। বিশ্বায়ন শিশুশ্রমের কারণ না হলেও এর ফলে শিশুশ্রম ব্যবহারের প্রণোদনা তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে তা স্থায়ী হয়, এমনকি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভাগবতী মনে করেন, বিশ্বায়নের সঙ্গে শিশুশ্রমের এই ধরনের বিকৃত সম্পর্কের কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর কথা হলো বিশ্বায়নের ফলে সামগ্রিক উন্নতি হয় এবং দারিদ্র্য হ্রাস পায়। ফলে শিশুশ্রম কমে ও শিক্ষার হার বাড়ে। শিক্ষার হার বাড়লে আবার প্রবৃদ্ধিও বাড়ে। এর ফলে একটি শুভচক্রের তৈরি হয়। তাঁর ভাষায় :

> The truth is that globalization- wherever it translates into greater general prosperity and reduced poverty- only accelerates the reduction of childlabor and enhances primary school enrollment and hence literacy. And as I argued from my analysis of the East Asian miracle, literacy in turn enables rapid growth. So we have here a virtuous circle. (পৃ. ৬৮)।

কিন্তু তবুও ভাগবতী সতর্ক করে দিয়েছেন যে কিছু জায়গায় সঠিক নীতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন শ্রম ঘাটতি থাকা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, বিশেষ করে সৌদি আরবে, শ্রমের চাহিদা বাড়ার ফলে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুকে গৃহকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব দেশে আধুনিক মানবাধিকার বা তার সুরক্ষা নেই। এ ছাড়া, শিশুদের যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো বিশ্বায়নের ফলেই হচ্ছে এক অর্থে। কিন্তু ভাগবতী মনে করেন, এসব ঠেকাতে সঠিক নীতি প্রণয়ন দরকার, বিশ্বায়ন বন্ধ করা নয়।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের ফলে নারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে না উপকৃত হয়েছে, সে বিষয়ে সাত নম্বর অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন ভাগবতী। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, নারীরা বিশ্বায়নের ফলে উপকৃত হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি দুটি কেস স্টাডি তুলে ধরেছেন। জাপানি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিদেশে বিস্তার এবং বাণিজ্যের ফলে লিঙ্গ ব্যবধান। দুটি ক্ষেত্রে তিনি নারীদের উন্নতি দেখিয়েছেন।

আর্লি রাসেল হোসচিল্ড এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, বিশ্বায়নের ফলে বৈশ্বিক সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নারীরা উপার্জনের তাগিদে উন্নত দেশে আসছে। নিজের দেশে তাদের সন্তানদের লালন-পালন করতে পারছে না। কিন্তু উন্নত দেশে অন্যের সন্তানকে লালন-পালন করছে। এর ফলে এসব নারীর মধ্যে মাতৃত্ব প্রশ্নে দুই ধরনের চিন্তা আসছে। 'ভালো মা' হতে হলে পরিবারের জন্য উপার্জন করতে হয়, কিন্তু সন্তানের পাশেও থাকতে হয়। কিন্তু সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। হোসচিল্ড মনে করেন, এর ফলে এসব নারীকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। ভাগবতী এসব যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করার পাশাপাশি, গৃহস্থালির কাজের জন্য নারীদের কোনো মূল্য যে দেওয়া হয় না, সে ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নীতি, ইপিজেড ইত্যাদির ফলে নারীদের ক্ষমতায়ন হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

গণতন্ত্র ও বিশ্বায়ন

ভাগবতী মনে করেন, বিশ্বায়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করে। প্রত্যক্ষ সংযোগের ক্ষেত্রে ভাগবতী বলেন, কৃষকেরা এখন প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যম ছাড়াই প্রযুক্তির ফলে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারছে। এর ফলে কৃষকেরা অনেক বেশি স্বাধীন হচ্ছে। নিজেকে স্বাধীন অনুভব করার ফলে বাজারের বাইরে রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কম্পিউটার অনেক বেশি সহজলভ্য এবং এর ফলে এসব কৃষকের বাজার শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আন্তর্জাতিক বাজারেও তারা প্রবেশাধিকার পাচ্ছে।

বিশ্বায়নের সঙ্গে গণতন্ত্রের পরোক্ষ সংযোগের ক্ষেত্রে ভাগবতী মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী সেইমুর মার্টিন লিপসেটের ১৯৫৯ সালের *সাম রিক্যুজাইটস অব ডেমোক্রেসি* গ্রন্থের যুক্তি তুলে ধরেন। লিপসেট বলেছিলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সামাজিক উন্নয়ন, যেমন শিক্ষা, সামাজিক সমতা ও

শ্রেণিকাঠামোয় পরিবর্তন ঘটে এবং তা গণতন্ত্রায়ণে ভূমিকা রাখে। তবে রালফ ডারেনডর্ফ ও স্যামুয়েল হান্টিংটনের মতো প্রথিতযশা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সব সময় এ ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাঁরা মনে করেন, সামাজিক পরিবর্তন অনেক সময় অস্থিতিশীল হতে পারে। গণতন্ত্রের বদলে নৈরাজ্যও সৃষ্টি করতে পারে। তবে ভাগবতীর বক্তব্য হলো :

> ...economic prosperity produces a middle class. This emerging middle class creates, however haltingly, an effective demand for democratization of politics: the new bourgeoisie, with wallets a little fatter, seeks a political voice, not just one in the marketplace. (পৃ. ৯৪)।

সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের ফলে সংস্কৃতি ধ্বংস হচ্ছে না সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেই আলোচনা পাওয়া যায় নয় নম্বর অধ্যায়ে। ইংরেজি ভাষা ও মার্কিন সংস্কৃতি অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর কর্তৃত্ব করছে। এ ধরনের সমালোচনার জবাবে ভাগবতী বলেন, ইউনেসকোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাংস্কৃতিক পণ্য রপ্তানি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। তা ছাড়া সময়ের সঙ্গে সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। নতুন উদ্ভাবন, রাজনৈতিক পরিবর্তন যেমন গণতন্ত্রায়ণ ও বিশ্বায়নের ফলে সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবেই। এর ফলে সংবেদনশীল মানুষেরা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে।

ভাগবতীর মতে, সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে যে অভিযোগ করা হয়, এটা আসলে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে। তিনি বলেন, অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক বা আদিবাসী অধিকারকর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। অর্থনীতিবিদেরা যেখানে আদিবাসীদের মূলধারার অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করলে খুশি হয় এবং না করলে কষ্ট পায়, সেখানে নৃতাত্ত্বিকেরা এর বিরোধিতা করে এবং বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া থেকে আদিবাসীদের পৃথক রাখতে চায়।

তবে আসল কথা হলো, বিশ্বায়নের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকার বড় কারণ হলো বিশ্বায়নের ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে পারছে, যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র সে জন্য তার সংস্কৃতির ওপর হুমকি আছে বলে মনে করে না।

মজুরি, শ্রমের মান ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের প্রভাবে মজুরি ও শ্রমের মানের অবস্থা কী দাঁড়ায় সে বিষয়ে দশ নম্বর অধ্যায়ে আলোচনা রয়েছে। ভাগবতী যুক্তি দিয়েছেন যে উনিশ শতকজুড়ে শ্রমিক

শ্রেণির প্রকৃত মজুরি ও জীবনমান উন্নত হয়েছে। কার্ল মার্ক্স পুঁজির পুঞ্জীভবন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগবতী মনে করেন, মার্ক্সের যুক্তি ভুল ছিল, কারণ পুঁজির পুঞ্জীভবনের ফলে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যা শ্রমিকদের জন্য মঙ্গলজনক। ধনী দেশগুলোয় বিশ্বায়নবিরোধীদের আশঙ্কা যে দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য করলে তাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমে যাবে এবং তাদের মধ্যে কাঙাল তৈরি হবে। এ ছাড়া তাদের শ্রমের মানও পড়ে যাবে, কারণ দরিদ্র দেশগুলোর শ্রমমান নিম্ন। নিম্ন মানের শ্রমের মূল্য কম হওয়ায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দরিদ্র দেশে তাদের উৎপাদন স্থানান্তর করেছে। তাই প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে উন্নত দেশগুলোকে শ্রমের মানের ক্ষেত্রে আপস করতে হবে। এর ফলে শ্রমের মান ধরে রাখা কঠিন হবে। ভাগবতী মনে করেন, এসব আশঙ্কার কোনো প্রমাণ নেই। আশি ও নব্বইয়ের দশকে করা বেশির ভাগ গবেষণায় দেখা গেছে, বাণিজ্যের ফলে খুব ছোট অংশের প্রকৃত মজুরি কমেছে। ভাগবতী তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন বাণিজ্যের ফলে শ্রমিকেরা উপকৃত হয়েছে। প্রাযুক্তিক পরিবর্তনের কারণে অদক্ষ শ্রমের চাহিদার পতন সহনীয় হয়েছে। এ ছাড়া দরিদ্র দেশে শ্রমের মান নিম্ন বলে যে অভিযোগ আছে, তা-ও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। গরিব দেশগুলোয় এ ব্যাপারে রাজনৈতিক চাপ ক্রমেই বাড়ছে।

পরিবেশ ও বিশ্বায়ন

বহুদিন ধরেই পরিবেশবাদীরা অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে পরিবেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে আসছেন। এই বিষয়ে এগারো নম্বর অধ্যায়ে ভাগবতীর বিশ্লেষণ রয়েছে। বাণিজ্য অর্থনীতিবিদ ও পরিবেশবাদীদের মধ্যে দার্শনিক ও জীবনযাত্রার পার্থক্যের ফলে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতিবিদেরা প্রকৃতিকে দেখেন মানুষের অধস্তন হিসেবে। কিন্তু পরিবেশবাদীরা এ ধরনের মনোভাব পোষণ করেন না। তাঁরা প্রকৃতির স্বাধিকারের কথা বলেন। পরিবেশগত নীতি প্রণয়ন না করে মুক্ত বাণিজ্য চালু করলে তা ক্ষতিকর হবে। তবে ভাগবতী তা মনে করেন না। তিনি বলতে চেয়েছেন, শুধু বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন করেও বাণিজ্য ও পরিবেশ দুটোরই উন্নতি করা যায়। প্রমাণ হিসেবে তিনি বহুপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনার উরুগুয়ে রাউন্ডে কৃষির বাণিজ্য উদারীকরণের উদাহরণ দিয়েছেন। এর ফলে ইউরোপীয় ও দরিদ্র উভয় প্রকার দেশেই আয় ও জনকল্যাণ বাড়ার পাশাপাশি পরিবেশের মান বেড়েছে। কারণ কৃষি বাণিজ্য নীতির ফলে উচ্চদরের কীটনাশকনির্ভর কৃষির পরিবর্তে নিম্নদরের সারনির্ভর কৃষি শুরু হয়েছে (পৃ. ১৩৮)। তবে ভাগবতী মনে করেন, মুক্ত বাণিজ্যের সঙ্গে সঠিক পরিবেশগত নীতির সামঞ্জস্য সাধন করাই সবচেয়ে উত্তম নীতি।

কিন্তু যে বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গেলেন, তা হলো বর্ধিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যেমন পণ্যের উৎপাদন ও ভোগই মুক্ত বাণিজ্যের সাফল্যের সূত্র। এর ফলে কলকারখানা, গাড়ি, আবর্জনা, গ্রিনহাউস গ্যাস, রাসায়নিক ইত্যাদি সবকিছুই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এসবই পরিবেশদূষণের মূল কারণ। বিশ্বায়নের সাফল্য আর পরিবেশ বিপর্যয় একসূত্রে গাঁথা। প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বদলে টেকসই উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়াটাই উত্তম নীতি।

বহুজাতিক কোম্পানি ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের ফলে করপোরেশনগুলো অতিমাত্রায় মুনাফা করতে গিয়ে দরিদ্র দেশগুলোয় শ্রমিকদের শোষণ করে বলে বিশ্বায়নের সমালোচনা করা হয়। এই বিষয়ে ভাগবতী বারো নম্বর অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, শ্রমিকেরা অন্যান্য খাতে আগে যে মজুরি পেত করপোরেশনগুলো তার চেয়ে বেশি তাদের দিচ্ছে। এ বিষয়ে ভাগবতী উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন :

> As it happens, several empirical studies do find that multinationals pay what economists now call a "wage premium": they pay an average wage that exceeds the going rate, mostly up to 10 percent and exceeding it in some cases, with affiliates of U.S. multinationals sometimes paying a premium that ranges from 40 to 100 percent (citation). The University of Michigan economist Linda Lim has reviewed much of the available evidence from a number of studies in Bangladeshi export processing zones, in Mexico, in Shanghai, in Indonesia, and in Vietnam, and reports that they overwhelmingly confirm the existence of such a premium (citation). (পৃ. ১৭২)।

ভাগবতী মনে করেন, খারাপ অভ্যন্তরীণ নীতির কারণে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে দোষারোপ করার পরিবর্তে নিজ নিজ দেশগুলোর সঠিক নীতি প্রণয়ন দরকার। এ অধ্যায়ে বহুজাতিক কোম্পানি-সম্পর্কিত আরও অনেক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ দিয়েছেন ভাগবতী।

তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিপুল অর্থ নিজেদের হাতে থাকার ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অনেক সময় আইনকানুনের তোয়াক্কা করে না। যে দেশে তারা ব্যবসা পরিচালনা করে, সে দেশের আইন না মানার অনেক উদাহরণ আছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমন একটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেভরনের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের পিএসসি বা প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের শর্ত অনুযায়ী শেভরন তার

চুক্তিভুক্ত গ্যাসক্ষেত্র অন্য কোনো কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে প্রথমে পেট্রোবাংলার অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু সম্প্রতি শেভরন বাংলাদেশ থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাদের অধীনে থাকা বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার ও জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্রগুলো হিমালয় এনার্জি নামক একটি চীনা কোম্পানির কাছে ২০০ কোটি ডলারের বিনিময়ে হস্তান্তর করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং সে অনুযায়ী চুক্তিও সম্পাদন করেছে। শেভরন বাংলাদেশকে এ বিষয়ে কিছু জানায়নি। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম রয়টার্স সংবাদ প্রকাশ করার পর বাংলাদেশ সরকার ও পেট্রোবাংলা শেভরনের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে গ্যাসক্ষেত্রগুলো নিয়ে নেওয়ার আগ্রহ দেখায়। কিন্তু শেভরন এই আগ্রহকে পাত্তা না দিয়ে আগের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। শেভরনের এ ধরনের কর্মকাণ্ড আইনবহির্ভূত ও উদ্ধতপূর্ণ।[৫]

এ বিষয়ে ভাগবতী তেরো বছর আগের এই বইয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে দরিদ্র দেশগুলো চাইলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে বাছাই করতে পারে। এসব কোম্পানির মধ্যে যেহেতু প্রতিযোগিতা আছে, সে ক্ষেত্রে দেশগুলো তাদের স্বার্থে সেই প্রতিযোগিতাকে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তাঁর উদ্বেগ হলো যেসব দেশে সুশাসন নেই, সেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। সুশাসনের অভাব থাকলে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ঘুষের মাধ্যমে এসব কোম্পানি কুক্ষিগত করে ফেলে। এর ফলে দরিদ্র দেশগুলো দর-কষাকষিতে পেরে ওঠে না। যার মানে দাঁড়াচ্ছে সুশাসনের অভাব মুখ্য বিষয়। এটি বিশ্বায়নের ত্রুটি নয়।

কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানিগুলো, বিশেষ করে এই ধরনের তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলোর এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের উৎস তাদের বর্ধিত অর্থনৈতিক শক্তি। এর সাথে সাথে তাদের সামাজিক ও সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। কীভাবে তারা এ পর্যায়ে গেল, সে বিষয়ে অ্যান্থনি স্যাম্পসনের ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত *দ্য সেভেন সিস্টার্স: দ্য গ্রেট অয়েল কোম্পানিজ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড দে শেইপড* গ্রন্থে বিশ্লেষণ রয়েছে। সেখানে টেক্সাকো, গালফ, এক্সন, শেভরন, শেল, বিপি ও মবিলের মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কারা তৈরি করল, এখন কারা চালায় এবং কাদের সঙ্গে তারা দ্বন্দ্বে জড়াচ্ছে, সে বিষয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে।

এই বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল 'কে নিয়ন্ত্রণ করে?' তেল-গ্যাসের ইতিহাসে দেখা যায়, একটি কার্টেল বা একচেটিয়া গোষ্ঠীই এর নিয়ন্ত্রণ করেছে সর্বদা। এর ফলে তাদের শক্তিমত্তার সঙ্গে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলো পেরে ওঠে না।

তৃতীয় ভাগ

বইয়ের এই অংশে বিশ্বায়নের অন্যান্য দিকের মধ্যে ১৯৯৭ সালে সংঘটিত এশিয়ার আর্থিক সংকট ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন-প্রবাহ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। দুটি ক্ষেত্রে ভাগবতী সমস্যার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সেগুলোর কারণ ও বিশ্বায়নের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে বের করে সমাধানের কথা বলেছেন।

এশিয়ার আর্থিক সংকটের ক্ষেত্রে ভাগবতী মনে করেন আতঙ্ক ছড়িয়ে পুঁজির আউটফ্লো করায় এই সংকট ত্বরান্বিত হয়েছে। তিনি মনে করেন এসব ঘটেছে বিদেশি চাপে হঠকারী ও অবিবেচকের মতো আর্থিক উদারীকরণের ফলে। বিশ্বায়নের এই ধরনের নেতিবাচক দিক বিবেচনা না করে স্বল্পমেয়াদি পুঁজির উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক প্রবাহ হতে দেওয়ার কারণে এশিয়ার মিরাকল ডেবাকলে পরিণত হয়েছিল। ভাগবতী মনে করেন, ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এক দেশ যখন ভুল সিদ্ধান্ত নিল, তখন অন্যরাও তাকে অনুসরণ করেছে। এর ফলেই এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন :

> The reason why capital inflows are tricky is simply because when confidence is shaken, the fact that the situation is inherently one of imperfect information implies that the actions of a few can initiate herd action by others. (পৃ. ২০২)।

ভাগবতী মনে করেন, এই ভুল সিদ্ধান্তের দায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর ছিল না। বাইরের চাপে তারা এ ধরনের নীতি গ্রহণ করেছিল। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের মতো সংস্থাগুলোর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ওয়াল স্ট্রিটের বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি থেকে এসেছেন। আবার উল্টোটাও হয়েছে। এটাকে তিনি ওয়াল স্ট্রিট-ট্রেজারি-কমপ্লেক্স হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মনে করেন, এই পাওয়ার এলিটরা সবাই একইভাবে চিন্তা করেন। এঁদের সম্মিলিত চাপেই অবিবেচকের মতো আর্থিক বাজার উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর মূল বক্তব্য হলো এ ধরনের ভুল সিদ্ধান্ত না নিলে সংকট তৈরি হতো না। সুতরাং এর জন্য বিশ্বায়নকে দোষারোপ করা যায় না। ত্রুটিগুলো সারাই করাই উচিত মূল লক্ষ্য। আইএমএফ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক বলেও তিনি মনে করেন।

অভিবাসনের আন্তর্জাতিক প্রবাহের ক্ষেত্রেও তিনি সঠিক নীতি প্রণয়নের ওপর জোর দেন। এই বিষয়ে অর্থনীতি ও নৈতিকতাকে আলাদা করার সুযোগ নেই এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন-প্রবাহের ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি তৈরি করে এর সমাধান করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। অনুমান করা হয় যে গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দেওয়া ও বাণিজ্য বাড়ালে সীমান্ত অতিক্রম করার প্রবণতা কমবে।

ভাগবতী মনে করেন, এটা তখনই সত্য হবে, যখন গরিব দেশগুলোর আয় ধনী দেশগুলোর সমান হবে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে এই ধরনের অনুমান একদমই ঠিক নয়। তা ছাড়া, অভিবাসন হয়ে থাকে শ্রমের চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে।

মেধা পাচার সম্পর্কে তিনি বলেন, কোন দেশ থেকে মেধা পাচার হচ্ছে, সেটা প্রথম বিবেচ্য। চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ানের মতো দেশের বিশাল দক্ষ জনবল আছে। তাই এসব দেশের জনবল বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারলে তা তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু আফ্রিকার কোনো দেশ, যেখানে দক্ষ জনবল কম, সেখান থেকে অভিবাসন সেসব দেশের জন্য ক্ষতিকর। তাই ঢালাওভাবে মেধা পাচার নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক নয়। বেশি জনবলের দেশগুলোর উচিত ডায়াসপোরা মডেল অনুসরণ করা, যাতে প্রবাসীরা তাদের উৎস দেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে এ ক্ষেত্রে প্রবাসীদের ওপরও কর আরোপ করতে হবে, যেন তারা অধিকার ও কর্তব্যের আওতায় আসতে পারে। অবৈধ অভিবাসনের ব্যাপারে ভাগবতী বলেন, এগুলোকে বন্ধ না করে কীভাবে খাপ খাওয়ানো যায়, সেই নীতি গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশ তার অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারে।

চতুর্থ ভাগ

এ ভাগে ভাগবতী বিশ্বায়নকে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের ওপর আলোকপাত করেছেন। সঠিক শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি তিনটি বিষয়ে জোর দিয়েছেন। প্রথমত, বিশ্বায়নের মানবিক চেহারা আছে বলে যে যুক্তি তিনি তুলে ধরেছেন, সে প্রেক্ষাপটে সেসব সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম মান ও বাণিজ্য অবরোধ ও পদ্ধতির আপেক্ষিক গুণাগুণ বিষয়ে চলমান বিতর্কের ক্ষেত্রে নীতি গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন সব সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোর উন্নতি করে না, তাই 'সঠিক নীতি' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, তা সংজ্ঞায়িত করতে হবে। তৃতীয়ত, বিশ্বায়নে উত্তরণ-প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নীতি গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু উত্তরণ ঘটলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত হবে, তাই কত দ্রুততায় বিশ্বায়নে উত্তরীত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আলোকপাত করতে হবে।

শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি 'শেয়ারড সাকসেস' বা অংশীদারিমূলক সাফল্যের কথা বলেছেন। যেমন 'পলুটার পে' নীতি গ্রহণ করা হলেই চলবে না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য এনজিওগুলোর সঙ্গে অংশীদারি গড়ে তুলতে হবে। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ইন্টারডিপেনডেন্স বা আন্তনির্ভরশীলতার নামে পাবলিক গুডসের ক্ষেত্রে কোনো শক্তিশালী দেশ সামাজিকভাবে ক্ষতিকর নীতি গ্রহণ করতে

পারে, যেমন মেধা সম্পত্তি অধিকারের ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রে বাকিদের সাবধানে পথ চলতে হবে।

বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকগুলোর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ষোলো নম্বর অধ্যায়ে আলোচনা রয়েছে। তিনি মনে করেন, নেতিবাচক দিকের ভয়ে পরিবর্তন ঠেকিয়ে না দিয়ে সেগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য সঠিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে। নেতিবাচক প্রভাবের পূর্বানুমান করার জটিলতা ও অসুবিধার বিষয়েও আলোচনা করেছেন ভাগবতী।

এ ছাড়া এই ভাগে তিনি সামাজিক অ্যাজেন্ডাগুলোর ক্ষেত্রে অর্জনগুলোকে ত্বরান্বিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি বলেছেন। বিশ্বায়নে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাণিজ্য উদারীকরণ কোন গতিতে এগোবে, সে নিয়েও আলোচনা রয়েছে। স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎস বিশ্বায়নের সমালোচনা করে বলেছেন যে উন্নয়নশীল দেশে এমনিই বেকারত্বের হার অনেক বেশি। বাণিজ্য উদারীকরণ করা হলে তা আরও বেড়ে যাবে। এর জবাবে ভাগবতী বলেছেন, আমদানি খাত থেকে চাকরি গেলে বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে যে রপ্তানি খাত সৃষ্টি হবে, সেখানে নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে। ফলে জাতীয় আয়ে কোনো তারতম্য সৃষ্টি হবে না (পৃ. ২৫৫)। কিন্তু বিশ্বায়নের মানবিক চেহারা আছে—এটা প্রমাণ করতেই ভাগবতী এই বই লিখতে বসেছিলেন। এ রকম সরল অর্থনৈতিক সমীকরণে মানবিক চেহারা আছে বলে মনে হয় না। আমদানি খাতের শ্রমিকই যে রপ্তানি খাতে কাজ পাবে, সে রকম নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং যার চাকরি যাবে তার সরাসরি ক্ষতির দিকটি এখানে গুরুত্ব পায়নি।

পঞ্চম ভাগ ও উপসংহার

শেষ ভাগটি এক পাতার একটি উপসংহার। এখানে ভাগবতী নতুন করে শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, বিশ্বায়নের সমালোচকেরা সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে উদ্বেলিত করতে চায়। কিন্তু শুধু আবেগ দ্বারা উদ্বেলিত না হয়ে যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বিশ্বায়নের মানবিক চেহারা নেই বলে যে অভিযোগ করা হয়, সেটি সত্যি নয়। আর তা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার উপাদানগুলো এই বইয়ে তিনি তুলে এনেছেন বলে মনে করেন।

শেষ কথা

ভাগবতী বিশ্বায়নের সমস্যাগুলোকে অস্বীকার করছেন না। তাই তিনি চতুর্থ ভাগে বিশ্বায়নের ঝুঁকিগুলোর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু উন্নয়নশীল

দেশগুলোর জন্য মুক্ত বাণিজ্য কৌশলই যে উত্তম, সেই বিশ্বাসে অনড় থেকেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এমন কোনো অর্থনীতির দেশ নেই, যেটা সবার জন্য সুবিধা তৈরি করে উন্নত হয়েছে। যখন একটা দেশ ধনী হয় এবং অর্গানাইজেশন অব ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা ওইসিডি মর্যাদা লাভ করে এবং তারপর প্রবৃদ্ধি কমে যায়, তখন মুক্ত বাণিজ্য অনেককে আরও খারাপ অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটা বিশ্বায়নের বিরোধিতার একটা যুক্তি, যেখানে ভাগবতী তেমন কোনো মনোযোগ দেননি। বেশির ভাগ অর্থনীতিবিদের মতোই ভাগবতী বাজারব্যবস্থা যে পদ্ধতিতে কাজ করে, তা নিয়ে এতই সন্তুষ্ট যে অর্থনীতিবিদদের বাইরে অন্যদের ব্যাপক অসন্তুষ্টিকে স্বীকার করেন না। এই অসন্তুষ্টির সাথে পুঁজিবাদের প্রতি বৈরিতার কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিষয়টা বোঝা যায় যখন ভাগবতী অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন রাখেন যে এর বাইরে কোনো বিকল্প বেশি ভালো হতো কি না। সামাজিক পরিবর্তন যেগুলো বিশ্বায়নের ফলে হচ্ছে বলে মানুষ বিশ্বাস করে, সেগুলোর জট খোলার ক্ষেত্রে তার আরেকটু ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ওপর আলাদা করে অধ্যায় থাকা উচিত ছিল, কারণ বিশ্বায়নের বিরোধিতা যারা করে তাদের এসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে।

ভাগবতী বিশ্বায়নে বিশ্বাস করেন, কারণ তিনি মনে করেন, মুক্ত অর্থনীতির ফলে যে অর্থনৈতিক একীভূতকরণ, বাণিজ্য ও বিশেষায়িতকরণ ঘটবে, তার ফলে গরিব দেশগুলো উপকৃত হবে। কিন্তু তিনি বর্তমানের বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ার বদলে আরও বেশি মানবিক চেহারাসম্পন্ন বিশ্বায়ন চান এবং সে ক্ষেত্রে এনজিওগুলোকে বিশ্বায়নের বিরোধিতা করার পরিবর্তে এর বিবর্তনে সহায়তা করার কথা বলতে চান।

ইন ডিফেন্স অব গ্লোবালাইজেশন বিশ্বায়নের অনেক বিষয়ে চমৎকার একটি ধারণা পাওয়ার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি বই। ভাগবতীও বিশ্বায়নের বাস্তব উদাহরণ ও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন কেন অবরুদ্ধ অর্থনীতির চেয়ে উন্মুক্ত অর্থনীতি ভালো, যদিও উপস্থাপনা অনেকাংশেই আশানুরূপ নয়। বিশ্বায়ন বিষয়ে যেকোনো আগ্রহী পাঠক এ বইয়ে এ বিষয়ক অনেক তথ্যসূত্র পাবেন। তবে কিছু কিছু বিষয়ে আরও বেশি স্পষ্টতা এবং অনেক যুক্তির আরেকটু গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন ছিল।

এই বই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল জগদীশ ভাগবতীর মতো বিশ্বায়নের বড় সমর্থক ও তাত্ত্বিকের যুক্তিগুলোকে উপস্থাপন করা। কারণ বর্তমানে বিশ্বায়ন হুমকির মুখে পড়েছে বলে বিশ্লেষকেরা বলছেন। সে হুমকিগুলো কী এবং কীভাবে

তৈরি হচ্ছে, তা ভাগবতীর যুক্তির সঙ্গে বর্তমান ঘটনাগুলো মিলিয়ে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে।

১. Thomas Greven, 'The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States: A Comparative Perspective', Friedrich-Ebert-Stiftung, May 2016, p. 4. can be accessed at: http://www.fesdc.org/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf

২. Paul Denlinger, '2016: Why is right-wing populism on the rise across the world?', *Quora*, June, 29, 2016, can be accessed at: https://www.quora.com/2016-Why-is-right-wing-populism-on-the-rise-across-the-world

৩. Globalizatoin 101, 'What is GLobalization', can be accessed at: http://www.globalization101.org/what-is-globalization/

৪. Graham Research Institute on Climate Change and the Environment, The London School of Economics and Political Science, can be accessed at: http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/faqs/what-is-the-polluter-pays-principle/

৫. ড. বদরুল ইমাম, 'শেভরন কোম্পানির বিতর্কিত প্রস্থান প্রস্তুতি', *প্রথম আলো*, ৪ মে, ২০১৬



প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই আলোচনার তালিকা

১ম সংখা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১)

- কেন 'প্রতিচিন্তা'—**মতিউর রহমান ও বিনায়ক সেন**
- বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন ও গণতন্ত্র **— নুরুল ইসলাম**
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে দুটি প্রস্তাব **—নজরুল ইসলাম**
- ব্যাংক-ব্যবস্থা ও নৈতিকতাবোধ—**আকবর আলি খান**
- দেশ বিভাগের অভিজ্ঞতা ও জাতীয় ইতিহাস রচনার সমস্যা **—আহমেদ কামাল**
- রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ এবং বাংলাদেশের অভিযাত্রা—**আবুল মোমেন**
- কীভাবে আরম্ভ থেকে (ফের) শুরু করতে হয়—**স্লাভো জিজেক**
- বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা : আখ্যান ও বাস্তবতা (বই আলোচনা)—**সোহরাব হাসান**
- বাংলাদেশের যুদ্ধ-বিবেক (বই আলোচনা)—**মিজানুর রহমান খান**

২য় সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১)

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দুই ব্যক্তির ছায়া—**মিজানুর রহমান খান**
- একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের নতুন চ্যালেঞ্জ—**এম এম আকাশ**
- বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ **—এম হুমায়ুন কবির**
- ছিটমহলের মানুষ : রাষ্ট্রহীনতার ইতিবৃত্ত—**মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী**
- সামাজিক ইতিহাসের আকর : 'বেগম' পত্রিকা—**মালেকা বেগম**

- বালুচদের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং বিজেঞ্জোর আত্মানুসন্ধান (বই আলোচনা) **—সোহরাব হাসান**
- বাংলাদেশের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট (বই আলোচনা)—**ইফতেখার ইকবাল**

৩য় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০১২)

- আমাদের কালে বৈষম্য—**আজিজুর রহমান খান**
- বাংলাদেশে গণতন্ত্র : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ—**আলী রীয়াজ**
- নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নের চাবিকাঠি **—নজরুল ইসলাম**
- দেশভাগের আগে—**আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার**
- চল্লিশ বছর ধরে : স্মৃতি ও ন্যায়বিচার—**ইয়ান মার্টিন**
- পাকিস্তান ও জিন্নাহ : গোড়ায় গলদ (বই আলোচনা)—**হাসান ফেরদৌস**
- আবেগ ও বিশ্বরাজনীতি (বই আলোচনা)—**বদরুল আলম খান**

৪র্থ সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩)

- মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বাংলার অবদান (১৭৮৪-১৮৩০)—**সিরাজুল ইসলাম**
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন কেন ঘটে না?—**মির্জা হাসান**
- খনার বিজ্ঞান-দর্শন—**পাভেল পার্থ**
- প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শূদ্র সম্প্রদায়—**রাহমান চৌধুরী**
- 'সওগাত' ও আমার জীবনকথা—**মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সাক্ষাৎকার**
- কর্মী থেকে নেতা : উত্তরণের অসমাপ্ত কাহিনি (বই আলোচনা) **—আবুল মোমেন**

৫ম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩)

- গণতন্ত্র, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট—**হোসেন জিল্লুর রহমান**
- রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়ন : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত **—আল মাসুদ হাসানউজ্জামান**
- গণজাগরণ মঞ্চ : আত্মপরিচয়ের পুনঃ অনুসন্ধান—**সাঈদ ইফতেখার আহমেদ**
- বাঙালি পল্টন ও তৎকালীন নারীসমাজ—**মুহাম্মদ লুৎফুল হক**
- ফুটপাতের চটি বই ও 'মাঝারি' গরিবের আত্মপরিচয়—**সুমন রহমান**
- আমার সাংবাদিকতা জীবন, দেশভাগ ও তৎকালীন সমাজ **—আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাক্ষাৎকার**

- মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন (বই আলোচনা)—**মুনির-উজ-জামান**
- পরিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাংলা বদ্বীপের রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস (বই আলোচনা)—**আজিজুল রাসেল**

৬ষ্ঠ সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪)

- বাঙালি জাতীয়তাবাদ : চার দশক পর—**বদরুল আলম খান**
- ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবাণিজ্য ও প্রাচ্যচর্চা (১৭৮৫-১৮৩০) **—সিরাজুল ইসলাম**
- বাংলাদেশে হরতাল ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো **—বার্ট সুইকেন্স ও আইনুল ইসলাম**
- তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনা **—সাজেদুল আউয়াল**
- উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা : প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা **—মিজানুর রহমান খান**
- কুলদীপ নায়ারের আত্মজীবনী বা ইতিহাসের পুনরুল্লেখ (বই আলোচনা) **—সোহরাব হাসান**
- বাঙালি এক ইতিহাসবিদের আত্মকথনে সমসাময়িক সমাজ-রাজনীতি (বই আলোচনা)—**মোশারফ হোসেন**

৭ম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৪)

- বাংলাদেশ : একটি ইসলামি প্যারাডাইমের সন্ধানে—**বদরুল আলম খান**
- নবধারার নাগরিক আন্দোলন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ—**মহিউদ্দিন আহমদ**
- গণমুখী জাতীয় আর্থরাজনৈতিক কৌশলপত্রের সন্ধানে একটি দলনিরপেক্ষ অনুসন্ধান—**হায়দার আলী খান**
- বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি বিশ্লেষণ **—খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও ফারজানা সেহরীন**
- আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের দুই দশক : একটি মূল্যায়ন **—রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস**
- মুজিব হত্যায় মার্কিন সংশ্লিষ্টতা : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান (বই আলোচনা)—**এ এস এম আলী আশরাফ**
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভূরাজনীতি ও বিস্মৃত গণহত্যা (বই আলোচনা) **—খলিলউল্লাহ্**

৮ম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪)

- সপ্তদশ শতকের বাংলায় ধর্মীয় জীবন : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা **—আকবর আলি খান**
- বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ও 'অন্যের' ভাবমূর্তির ধারণা—**ইমতিয়াজ আহমেদ**
- গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট—**সাঈদ ইফতেখার আহমেদ**
- বাংলাদেশের লোকায়ত জলবায়ুবিজ্ঞান : একটি প্রতিবেশ-নারীবাদী আলাপ **—পাভেল পার্থ**
- মওদুদ আহমদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের একটি মূল্যায়ন (বই আলোচনা)—**মিজানুর রহমান খান**
- 'যদি ইসলাম পৃথিবীতে না থাকত?' (বই আলোচনা)—**আসজাদুল কিবরিয়া**

৯ম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪)

- প্রপাগান্ডা ও গণমাধ্যম : যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ **—সামিয়া রহমান ও সৈয়দ মাহফুজুল হক**
- পলাশীর যুদ্ধ ও সম্পদ পাচারের সূত্রপাত—**এম মোফাখখারুল ইসলাম**
- মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্র ও গ্যাসপ্রবাহ **—ভিলেম ভ্যান শেন্ডেল**
- মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা 'আমার জীবন-কথা ও সময়' **—সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সরদার ফজলুল করিম ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম**
- রাজনীতিতে দায়িত্বশীলতা ও গণতন্ত্রের শর্ত (বই আলোচনা)—**হাসান শফি**
- বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট (বই আলোচনা)—**আজিজুল রাসেল**

১০ম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫)

- বাংলাদেশে নতুন ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল—**আলী রীয়াজ**
- নজরদারির পুঁজিবাদ : একচেটিয়া-ফিন্যান্স পুঁজি, সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স ও ডিজিটাল যুগ—**জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডব্লিউ ম্যাকচেনজি**
- স্বামীর প্রবাসকালে গ্রামীণ বাংলার নারী : ক্ষমতা, শক্তি ও অধীনতার ধারণার পুনর্ব্যাখ্যা—**সৈয়দা রোযানা রশীদ**
- লিসবনে শহীদ মিনার : পর্তুগালপ্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে স্মৃতি ও সম্প্রদায়ের রাজনীতি এবং দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ—**হোস ম্যাপ্রিল**
- মার্কিন দলিলপত্রের সাক্ষ্য : কেন বুদ্ধিজীবী হত্যা? কীভাবে জামায়াত জড়িত?—**মিজানুর রহমান খান**

- 'অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিন' (বই আলোচনা)—**আসজাদুল কিবরিয়া**
- কিসিঞ্জারের বয়ানে পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার রূপকল্প (বই আলোচনা) **—রেজওয়ান মাসুদ**

১১তম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৫)

- বাংলাদেশ : যেখানে গণতন্ত্রের রং ধূসর—**বদরুল আলম খান**
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য—**লাইলুফার ইয়াসমিন**
- গ্রামীণ নারীর পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ অবনয়নের প্রতিক্রিয়া **—সাবেকুন নাজমুন**
- ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন—**আবদুর রাজ্জাক**
- ঢাকার বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত এক নারীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ **—আনোয়ারা বাহার চৌধুরী**
- জামদানির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক নির্দেশনা—**ইফতেখার ইকবাল**
- বাগান থেকে মহাকাশ—**মীজান রহমান**

১২তম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫)

- একবিংশ শতকে পুঁজি : মার্ক্স থেকে পিকেটি—**এম এম আকাশ**
- ছিটমহল বিনিময় : পেছনের কাহিনি ও সামনের চ্যালেঞ্জ **—মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী**
- ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতভাগ : জিন্নাহ ও গান্ধীর ভূমিকা—**রাহমান চৌধুরী**
- নেপালের 'মাধেস আন্দোলন' : পূর্বাপর—**আলতাফ পারভেজ**
- অপ্রত্যাশিত কিউবা—**এমিলি মরিস**
- ইসলামি রাষ্ট্রের পতন ও উত্থান (বই আলোচনা)—**আইরিন খান**

১৩তম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫)

- ছয় দফা ও দুই অর্থনীতি—**নুরুল ইসলাম**
- পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা সম্পদ : প্রামাণ্য মূল্যায়ন **—আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন**
- একাত্তরের সত্তা : যেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ টাওয়ার হ্যামলেটকে তাড়িয়ে বেড়ায়—**সারাহ গ্লিন**
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রেকর্ড করা হয় ১৯৭০ সালের আগেই **—আবদুল আহাদ**
- ১৮৭৪-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলা-আসামের সীমান্তে অদলবদল এবং সিলেটের গণভোটের ইতিহাস—**আশফাক হোসেন**

- বাংলাদেশে কিশোরীদের যৌন হয়রানির প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা **—পাপড়ীন নাহার, মার্টিন ভ্যান রিওয়্যাক, রিয়া রিইস**
- স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও গণতন্ত্র—**মিজানুর রহমান খান**
- ভয়ের সংস্কৃতির শিকড়-সন্ধান (বই আলোচনা)—**রেজাউল হক**

১৪তম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬)

- দরিদ্রবান্ধব স্থানীয় সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ নেতাদের রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ—**মির্জা হাসান ও সোহেলা নাজনীন**
- দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ—**এম এম আকাশ**
- দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসাশিক্ষা : প্রাক-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক আমল **—আলী রীয়াজ**
- বিশ্ব স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ—**শাহাদুজ্জামান**
- মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ : মিথ না রিয়েলিটি?—**আরিফ রহমান**
- জেনোসাইড বাংলাদেশ : আপেক্ষিক বনাম তথাগত দৃষ্টিভঙ্গি—**মো. ফজলে রাব্বি**
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের ইতিবৃত্ত—**গোলাম মুস্তাফা**

১৫তম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৬)

- দুর্নীতি, দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনের চালকেরা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ—**নুরুল ইসলাম**
- নিম্নবর্গের সমুদ্র-জিজ্ঞাসা : বাংলাদেশের সমুদ্র প্রতিবেশ, বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এক নিম্নবর্গীয় বয়ান—**পাভেল পার্থ**
- গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ—**মোহাম্মদ আতিক রহমান**
- ঢাকায় বাংলাদেশি নবীন এবং শিক্ষিতদের মধ্যে অভিবাসন আকাঙ্ক্ষা **—অ্যালেন ব্যাল**
- কালান্তরের ঘূর্ণিপাকে—**আবুল মোমেন**
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎসমূলে প্রতিবাদ—**আসজাদুল কিবরিয়া**
- মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইড : অমীমাংসিত বিষয় ও মানবতার দায় **—মো. ফজলে রাব্বি**

১৬তম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬)

- একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার **—হায়দার আলী খান**

- নব্য উদারনীতিবাদের ত্রুটিগুলো কীভাবে সারাই করা সম্ভব—**জেসন হিকেল**
- বাংলাদেশে গণতন্ত্র : এলিট বনাম জনগণ—**বদরুল আলম খান**
- সেক্যুলারিজমের রূপ ও রূপান্তর—**আলী রীয়াজ**
- অজয় রায়ের সাক্ষাৎকার : যদি কোনো মতবাদে বিশ্বাস থেকে থাকে মার্ক্সবাদের ওপর বিশ্বাস অবশ্যই আছে
  —সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মতিউর রহমান**
- বিশ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ এশিয়ায় চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ : আন্তদেশীয় থেকে স্বদেশীয় জনপরিসর—**জাকির হোসেন রাজু**
- আইএসের উত্থান ও বিশ্বরাজনীতি—**আইরিন খান**

১৭তম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬)

- জঙ্গিবাদের আবর্তে বিশ্বরাজনীতি—**বদরুল আলম খান**
- শেখ মুজিবুর রহমান : একটি ঝড় ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়—**জন পি থর্প**
- বাংলার ডায়েরি—**বরিস কালিয়াগিন ও ভ্লাদিমির স্কসিরিওভ**
- লীলা নাগ ও তাঁর জীবনসাধনা—**মালেকা বেগম**
- এক তরুণ শিক্ষকের অ্যাকটিভিস্ট হয়ে ওঠার গল্প—**মহিউদ্দিন আহমদ**
- পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ—**মো. ফজলে রাব্বি**

১৮তম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭)

- বাংলাদেশে সিভিল সমাজ : সুশীল না দুঃশীল?—**আকবর আলি খান**
- আমার অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠা—**নুরুল ইসলাম**
- বাংলাদেশে জ্ঞান উৎপাদন : সিভিল সমাজের কতিপয় সমস্যা
  —ম্যাথিল্ড ম্যাইটরট
- ইতিহাসের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—**রাশেদ রাহম**
- বাদাবনের বিজ্ঞান—**পাভেল পার্থ**
- পুঁজিবাদ ও জলবায়ু পরিবর্তন—**খলিলউল্লাহ্**

লে খ ক প রি চি তি

আলী রীয়াজ

লেখক ও গবেষক। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির পলিটিকস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক। ক্লেফিন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিংকন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিকস ইন সাউথ এশিয়া* (রুটলেজ, ২০১০); *ফেইথফুল এডুকেশন: মাদ্রাসা ইন সাউথ এশিয়া* (রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮); *ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি ইন বাংলাদেশ: আ কমপ্লেক্স ওয়েব* (রুটলেজ, ২০০৮); *ইসলাম অ্যান্ড আইডেন্টিটি পলিটিকস অ্যামাং ব্রিটিশ বাংলাদেশিজ: আ লিপ অব ফেইথ* (ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩), *হাউ ডিড উই অ্যারাইভ হিয়ার* (প্রথমা, ২০১৫); *বাংলাদেশ: আ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি সিনস ইন্ডিপেন্ডেন্স* (আই. বি. টরিস, ২০১৬)।

অমিয় কুমার বাগচি

ইমেরিটাস অধ্যাপক, কলকাতা উন্নয়ন অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠান এবং অ্যাডজাঙ্কট অধ্যাপক, মোনাশ এশিয়া ইনস্টিটিউট, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ক্যামব্রিজ, পার্থ, ন্যাপল্‌স, কর্নেলসহ বিশ্বের অনেক স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অতিথি অধ্যাপক হিসেবে পড়ান। বেশ কিছু প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি ছাড়াও অনেক সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেছেন। বাগচি প্রায় ৩০০ গবেষণা প্রবন্ধ ছাড়াও অসংখ্য বই এবং মনোগ্রাফের লেখক ও সম্পাদক। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে: *কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়াদিল্লি, ২০১০); *পেরিলাস প্যাসেজ: ম্যানকাইন্ড অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল অ্যাসেনডেন্সি অব ক্যাপিটাল* (রওনান অ্যান্ড লিটলফিল্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৫; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়াদিল্লি ২০০৬); *দ্য ডেভেলপমেন্ট স্টেট ইন হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি* (রিজেন্সি পাবলিকেশন্স, নয়াদিল্লি, ২০০৪); *দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব আন্ডারডেভেলপমেন্ট* (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৮২) ইত্যাদি।

গোলাম রব্বানী

শিক্ষক ও গবেষক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। শিক্ষকতা ও গবেষণার ক্ষেত্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস,

বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত বিষয়াবলি ও দক্ষিণ এশিয়া। ছিটমহল বিষয়ে এম ফিল গবেষণার পর বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত ও ছিটমহল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : স্টেটলেসনেস ইন সাউথ এশিয়া : লিভিং ইন বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া এনক্লেভ্স (রিসার্চ মনোগ্রাফ), থিওরিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ্স, ২০০৭। ছিটমহলের বর্তমান সংকট নিয়ে তাঁর একটি বই প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ সমাজ, শ্রেণি, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (সম্পাদনা), *সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান* ২০১৫ সালে এবং *গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশ* ২০১৭ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বায়নের ওপর তাঁর আরও একটি বই প্রথমা প্রকাশন থেকে বের হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

প্রতীক বর্ধন

সাংবাদিক ও অনুবাদক। বর্তমানে *প্রথম আলোর* সম্পাদকীয় বিভাগে সহসম্পাদক পদে নিয়োজিত। অনুবাদের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মতামত কলামও লিখে থাকেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আগ্রহের বিষয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইতিহাস।

খলিলউল্লাহ্

লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজে (বিসিএএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে *প্রতিচিন্তার* সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আগ্রহের বিষয় রাজনৈতিক অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভূরাজনীতি, সামাজিক উন্নয়নসহ সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণা করেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারসহ নগদ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১